অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যের সেরা গল্প

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যের সেরা গল্প

দীপ প্রকাশন
১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

গল্পক্রম

সাহিত্যের সেরা গল্প

চীনেমাটির পুতুল

শেষরাতে তিনি আজও কান খাড়া করে রাখলেন। কে গায়! কোনো দূরবর্তী মাঠে উদাস গলার স্বর—কাছাকাছি তো কোন মাঠ নেই, শস্যক্ষেত্র নেই! কে গায়! আগে মনে করতেন স্বপ্ন, ভেঙে গেলে মনে হত স্বপ্ন নয়, সত্যি। নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে কেউ তাঁকে ডাকছে। কে সে? ইদানীং ভয়ে ভয়ে আগেই ঘুম ভেঙে যায়। আজও ঘুম ভাঙলে টর্চ জ্বেলে ঘড়ি দেখলেন, ঠিক চারটে। শেষ রাত। জানালা খোলা থাকে। রাস্তার আলো জ্বালা থাকে বলে, রাত কত গভীর বোঝা যায় না। শুধু নিঝুম একটা ভাব থেকে, তার তারতম্য থেকে আন্দাজ করতে পারেন রাত নিশুতি, না আরও গভীরে কিংবা শেষের দিকে। জানালা খুলে তিনি দেখতে পান সেই বিশাল আকাশ, আর কিছু নক্ষত্র। যা তার জন্মেও এক ছিল, শেষ রাতেও এক আছে।

কে গায়!

গায়, না তিনি নিজের মধ্যেই কোন উদাস গানের সুর সঞ্চার করেন। শুনতে পান যেন সে আর কেউ নয়, তিনি নিজেই।

জানালা খুললে কিছু গাছপালা নজরে আসে। সামনে পাকা রাস্তা। ছিমছাম সব কিছু। সামনে বড় স্কুলবাড়ি। স্কুলবাড়ির মাঠটায় কেউ দাঁড়িয়ে গাইছে না তো! না সেখানে কেউ নেই। গানের কোন শব্দ স্পষ্ট নয়। অদ্ভুত এক ব্যঞ্জনা সেই সুরের। যেন বলে যায় কেউ, এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকারে যাত্রা!

আসলে বয়স হলে মানুষের বুঝি এমনই হয়। তিনি ভয় পাচ্ছেন। এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকারে যাত্রা কেন?

শেষ রাতের দিকে এইসব বাড়ির জানালায় বেশ একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যায়। পাখা চালাতে হয় না। তিনি নিজে অন্তত ঘুম ভাঙলে পাখা বন্ধ করে দেন। পাখার আওয়াজে তাঁর মনে হয় তিনি বিভ্রমে ভুগছেন। পাখাটা বন্ধ করে দিলে চরাচরের গোপন সত্য ধরতে পারবেন তিনি—কিন্তু কে গায়, কোথায় গায়, গানের অস্পষ্ট শব্দমালায় হতচকিত হয়ে নিদারুণ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যান। তখন নিজেই মনে করে নেন, আসলে কেউ তাঁকে সতর্ক করে দিচ্ছে—নিজের একাকিত্বে এত বিচলিত কেন! সারাজীবন খড়কুটো সংগ্রহ করেছ, এখন তোমার ছুটি। তোমার অপেক্ষায় কেউ আর বসে নেই।

বুকটা তাঁর এত খালি কখনও হয়ে যায় নি। স্ত্রীর মৃত্যুর সময়েও না। তিনি পুত্রকন্যাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বল ভরসা খুঁজেছিলেন, শক্ত ছিলেন। ক'দিন থেকে তাও কে যেন হরণ করে নিয়েছে।

বালিশের পাশ থেকে চশমাটা তুলে নিলেন। চোখে ভাল দেখতে পান না। চশমাটা কত বল ভরসা না পরলে বোঝা যায় না। তিনি যে অক্ষম নন, চশমাটা পরলে টের পান। আগে এদিকটায় ফাঁকা মাঠ ছিল। বাড়িটা করার সময় সবাই তাঁকে কিছুটা মাথাখারাপ লোক ভেবেছিল। যামিনীকে জমিটা দেখিয়ে তিনি বোকা বনে গেছিলেন। বাস-স্ট্যাণ্ডে উঠে হাউহাউ করে কান্না—এ-কেমন জায়গায় জমি কিনলে। অঘ্রান মাসে হাঁটু জল।

বেশ নিচু জায়গায় জমি। কিছুদূর দিয়ে জ্যাংরার দিকে একটা খোয়ার রাস্তা চলে গেছে। তিনি বলেছিলেন, এত কম টাকায় কলকাতার কাছাকাছি আর কোথায় জমি পাবে যামিনী!

যামিনী কোন কথা বলেনি আর।

জমিটা কেনার পর মনে হয়েছিল, জীবনে এমন শখ না জন্মালেও পারত তাঁর। যা আয়, নিজের সংসার, মা বাবা সবাই মিলে বড় টানাটানি যায়। তবু কি যেন থাকে মনে। দারিদ্র্য বড় ক্ষোভের বস্তু। আজীবন ছুটিয়ে মারে। আজীবন ভাবনা, বাসাবাড়ি, চাকুরি, মৃত্যু এবং অক্ষমতার যে কোন একটা তাঁকে অপদস্থ

করলে তিনি ফুটপাথের মানুষ। নিজের জীবন দিয়ে যে দুর্ভাগ্য ভোগের অধিকারী তিনি ছিলেন, পুত্র-কন্যাদের জীবনে তা ঘটবে ভাবলে তাঁর হাঁটু কাঁপত। কেমন নিরুপায় মানুষের মতো তখন পুত্রকন্যা এবং স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

সেই নিরাপত্তা বোধের অভাবই তাঁর বোধহয় সহায় ছিল শেষ পর্যন্ত। একটা জমি, বাড়িঘর, এবং ছাদের নিচে আশ্রয় পাবার জন্য কী না অমানুষিক পরিশ্রম গেছে তাঁর। কী না ব্যাকুলতা!

এ-সময়ে মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল তাঁর! ফাঁকা বাড়িতে একা মানুষের এই হাসি বড় নির্জীব!

কেন হাসলেন?

মনে পড়ল শ্রীমানের জন্মদিনের কথা। ঝড় জল ভেঙে হাসপাতাল। মফস্বল শহরে বাস তাঁর তখন। এমনি আশ্বিনে তাঁর বড় পুত্রের জন্ম। এমনি শেষ রাতে তিনি আজকের মতো উদ্বেগে পায়চারি করছিলেন। কান্না—কোথাও তিনি নবজাতকের কান্না শুনতে পান। দুহাত দুমড়ে মুচড়ে বলছে, আমি এসেছি। আমি খাব। আমার জায়গা চাই। আসলে যে যার জায়গার খোঁজ পেয়ে গেলে সংসারে কেউ কারো না।

জায়গা তিনি সবার জন্য করতে পেরেছেন। শুধু এ-বয়সে দেখছেন, নিজের জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেছে।

জানালার পাশে এক গ্লাস জল থাকে। জলের গ্লাসটা তুলতে গিয়ে হাত কাঁপছিল। জীবনটা পোকা-মাকড়ের মতো মনে হচ্ছিল।

দোতলার জানালায় দাঁড়ালেই দেখা যায়, কত সব ঘরবাড়ি। এই সব ঘরবাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকে হাজার রকমের সুখ-দুঃখ। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না, এক অতি নিরন্তর নিঃসঙ্গতা অন্তরালে কাজ করে যায়। সব একদিন কেমন অর্থহীন মনে হয়।

আকাশে কিছু মেঘের ওড়াউড়ি চলছে। এই জানালাটা তাঁর ভারি প্রিয়। যামিনী বেঁচে থাকতে সব লক্ষ্য রাখত। ইজিচেয়ার পাতা থাকত। এখানে বসে, সকালের সূর্য ওঠা থেকে পাখি ওড়া সব দেখতেন। খাল পার হয়ে যে বড় উপনগরী তৈরি হচ্ছে, সেখানে তখন ঘরবাড়ি ছিল না। শুধু নিরন্তর মাঠ আর কাশবন। অনেক দূরে দেখা যেত একটা সাদা মত বাড়ি। কেমন রহস্যময় লাগত বাড়িটাকে। ঝাউগাছের গ্রীন ভার্স তৈরি হচ্ছে তখন। আর খালের এপারে সব জলা জমি ধানের খেত। দেখতে দেখতে সব কোথায় ক'বছরে হারিয়ে গেল।

এগুলো তিনি কেন ভাবছেন! কিছুই তো ভাবার কথা না। সব ঘরগুলো ফাঁকা। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেল। বড় চলে গেল বাইরে। ছোট ছিল। বউমা ছিল। আর ছিল বাপ্পা। কতদিন থেকে সেই ছোট শিশুটি তার একাকিত্বের সঙ্গী ছিল। তারাও ফ্ল্যাট কিনে চলে গেল! এই চলে যাওয়াটা যে কী করুণ কেউ বুঝল না!

আমি দাদু যাব না।

না, যাও। তোমার স্কুল কাছে হবে।

আমি তো এখান থেকেই যেতাম।

যেতে। এখন যেতে কষ্ট।

কে বলে!

কে যে বলে বুঝি না!

বাপ্পা বায়না ধরেছিল। ছোট বলল, আপনি বুঝিয়ে বলুন। ও তো বোঝে না, এতদূর থেকে কত অসুবিধা!

সেই।

কে যেন মনের কোণ থেকে উঁকি দিয়ে বলল, কী বুঝছ!

কিছু না।

বুঝতে চাও না। সব করলে কার জন্য!

সেই।

ছোটর সেই এক কথা, আপনার বউমার কষ্ট হয় এতদূর থেকে রোজ ট্রেনে যেতে।

তিনি শুধু বলেছিলেন, আমার জন্য ভেব না। আমার চলে যাবে।

ওরা চলে যাবার পর ক'দিন খুব উতলা হয়েছিলেন। কিছু আর করার নেই। কারো জন্য আর ভাবতে হবে না। ঠিকঠাক সবাই বাড়ি ফিরে এল কি না বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর অপেক্ষা করার কেউ নেই। মুক্তি। মুক্তি। এ সময়ে তাঁর চোখে জল দেখা দিল।

সেই পাখির বাসার মতো, নিরন্তর ঝড় বাদলায় খড়কুটো সংগ্রহ করা—বাসা তৈরি। ডিম ফুটলে ছানা-পোনার আহার। তারপর উড়ে যাওয়া। পাখির কোন নিঃসঙ্গ বেদনা থাকে না। মানুষের কেন যে থাকে!

তখনই মনে হল কে ডাকে, দাদু, আমি!

কে!

আমি! চিনতে পারছ না, তোমার ছোট আমি।

ছোট আমি বলে কী বলতে চায়!

কেউ যেন দৌড়ে বড় উঠোন পার হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরদা লাঠি নিয়ে বের হচ্ছেন। তাঁরা সেই ছোট আমি সঙ্গে। সকালবেলায় ঠাকুরদা গোপাট ধরে হাঁটেন। তারা ক'ভাই। কখনও ঠাকুরদা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকেন। তারা ছুটে বেড়ায়। চোখে দেখতে পান না—অথচ অভ্যাস এতকালের, কোথায় কি গাছ, কোন বৃক্ষলতা বড় হয়ে উঠেছে টের পান। কী জমজমাট! উত্তরের ঘরে ঠাকুরদা ঠাকুমা, দক্ষিণের ঘরে বৈঠকখানা, পুবের ঘরে বড় জেঠি, পশ্চিমের ঘরে সোনা জেঠি, কামরাঙা তলার ঘরে ছোট কাকী থাকেন—ছোটরা বড়রা মিলে সারাদিন ঠাকুরদার চারপাশে উত্তেজনা ছড়িয়ে রাখে। দাদুর শেষ জীবনটা ছিল ভারি বর্ণাঢ্য। মৃত্যুর সময় ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল অবিনাশ কবিরাজ, উত্তর-দক্ষিণে যত আত্মীয়স্বজন সবার বাড়ি বাড়ি লোক গেল, খবর দিল কর্তার সময়কাল উপস্থিত। শেষ দেখা দেখে আসুন। ঠাকুরদা নিজেও বুঝেছিলেন। সাদা বিছানায় সাদা চাদরে শুয়ে। সবাই আসছে—দাদু বলছেন, কে?

আমি হেমন্ত।

কে তুমি?

আমি নন্দ।

তরমুজের জমি, চাষ আবাদ সব ঠিকঠাক আছে তো!

আছে কর্তা।

বিলের জমি হাতছাড়া শোনলাম।

মামলায় সাক্ষী পেলাম না কর্তা।

দাদুর মুখে সরল হাসি। যে বোঝে সে বোঝে।

এক অন্ধকার থেকে অন্য কোনো অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার আগে ডানা ঝাপটানো। ঘোড়ার পায়ের শব্দ কোথাও। কবিরাজ এসে দেখেছিল, বাড়িতে অতিথি অভ্যাগতে ভর্তি। বড় জেঠিমা, সোনা জেঠিমা হেঁশেলে। সিংবাড়ির অন্নদা কুয়ো থেকে কেবল জল তুলছে। দাদুর ইহলোক ত্যাগের আগেকার ছবিটা কেমন ঝুলে থাকল কিছুক্ষণ চোখের উপর। হরিনাম সংকীর্তন, নাপিত-বাড়ির হরকুমার খোলে চাঁটি মারছে। করতাল বাজাচ্ছিল গৌর সরকার। দাদু সাদা চাদর গায়ে সব শুনছিলেন, আর মাঝে মাঝে বলছিলেন, সবার খাওয়া হল! যেন কত সোজা একটা রাস্তায় রওনা হয়েছেন। বরবেশে কোথাও যাত্রা! সবার খাওয়া হলেই পালকিতে চড়ে বসা। দুই পুরুষ আগেকার এমন মৃত্যুর ছবি এই শেষ রাতে জানালায় দাঁড়িয়ে তিনি মনে করতে পারছিলেন। সঙ্গে অভ্যাসবশে কাজ করে যাওয়া। সব ঘড়িগুলোতেই আগে দম দিতেন। এখন একটাতে এসে ঠেকেছে। হাতে নিয়ে দুবার চাবি ঘোরালেন, তারপরই মনে হল, হাতটা তাঁর অসাড় লাগছে। ঘড়ি মিলিয়ে এ-বাড়িতে আজ আর কারো স্নান আহার করার দরকার নেই। নীল রঙের বাসে তুলে দেবার জন্য কারো হাত ধরে আজ আর হাঁটতে হবে না। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। চাবি দিতে ভুলে গেলেন। ঘড়িটা হাফ দম খেয়ে বিছানায় পড়ে থাকল।

সারারাত জল পড়ার শব্দ আজ তিনি শুনতে পেয়েছেন। যেন বাপ্পা রোজকার মতো দাদুকে রাগিয়ে দেবার জন্য চৌবাচ্চার কল খুলে রেখেছে। তিনি ছুটে গেছেন। না কেউ কল খুলে রাখেনি। কেউ অন্যমনস্কভাবে, কলটা বন্ধ করতে ভুলে যায় নি। তার নজর এত তীক্ষ্ণ হয়ে গেছিল শেষ দিকটাতে কিংবা শ্রবণশক্তি, যে কোথাও বিন্দুমাত্র দাগ ধরলে দেয়ালে, ঘুণপোকা বাসা করলে ঠিক টের পেতেন। বউমা বউমা, দেখ এসে দেখ, কার আঙুলের ছাপ।

কার আবার হবে! আপনার নাতির।

এ-বাড়িতে সবাই জেনে গেছিল, বাপ্পার সাতখুন মাপ। সবাই নিজের দোষ বাপ্পার উপর চাপিয়ে রেহাই পাবার চেষ্টা করত।

লক্ষ্মণের কাজ।

লক্ষ্মণ বাড়ির কাজের লোক। সকালে আসে। রান্নাবান্না করে দিয়ে চলে যায়। বউমা লক্ষ্মণের উপর চোটপাট হবে ভয়ে কত সহজে মিছে কথা বলত, না না, লক্ষ্মণ জানে দেয়ালে হাত দিলে ছাপ ধরে যায়। সে করবে কেন! আসলে বউমা ভয় পায় চোটপাটের ঠেলায় লক্ষ্মণ না আবার পালায়। এরা মিছে কথা আজকাল কত সহজে বলতে পারে। আসলে বাড়িটার চেয়ে লক্ষ্মণ তাদের কাছে বেশি মূল্যবান।

মিছে অজুহাত দেখিয়ে ছোট সহজে এজন্য চলেও যেতে পারল। এই ছোট একবার দেরি করে ফেরায় কি হাউহাউ কান্না। তখন ছোট কলেজে পড়ে। বড় নির্ভরশীল ছিল তারা পরস্পরের। ধরে ধরে বড় হওয়া অথবা বলা যায় কালাতিপাত করা। দায় কারো না। নিজেরই। এই দায় বহন করতে পারার মধ্যে একটা গৌরববোধ কাজ করত। আমি এবং আমার, আমি এবং আমার পুত্র, আমি এবং আমার পুত্র কন্যা, বি-এ বি-টি, কেউ ডাক্তার কেউ ইঞ্জিনীয়ার—আমি এবং আমার অস্তিত্ব এম-এ বি-টি পাস। তার সঙ্গে বাড়িঘর। উপর নিচ মিলিয়ে ছটা শোবার ঘর। টাইল বসানো, ফ্লোরোসেণ্ট বাতি, দেয়ালে প্লাস্টিক কালার। সোফাসেট বাতিদান—কারুকার্য করা জীবনপ্রবাহ। জানালায় ভেলভেটের পর্দা। দক্ষিণের বাতাসে দোলে। সিঁড়ি সাড়ে তিন ফুট। চার ফুট করার ইচ্ছে ছিল। কাজকর্মের বাড়িতে সরু সিঁড়ি অসুবিধার সৃষ্টি করে। তিনতলায় ঘর করার দরকার নেই। উপরে সামিয়ানা টাঙিয়ে এক লপ্তে দু'শো জন খাওয়ানো যাবে। সবটাই আমার, আমার অস্তিত্বের শিকার। ওরা এখন বাপ্পাকে নিয়ে এম-এ বি-টি হতে চায়। এম-এ বি-টি পাস, সোজা কথা না। প্রধান শিক্ষক নীলরতন বসু। কাঁধে পাটভাঙা চাদর, করিডরে হাঁটার সময় দৃপ্ত ভঙ্গি। জেলা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। কত কিছু অস্তিত্বের শিকার—এখন শুধু সামনে ফাঁকা মাঠ। একটা ঘড়িতে তার চাবি দেবার কথা। তাও দিতে গিয়ে হাত অসাড়।

মনে হল ঘড়িটা থেমে গেছে। তিনি শেষ রাতের আলোতে বুঝতে পারছেন না। তবে ঘড়ির বুকে শব্দ হয় —শব্দটা থেমে গেছে। আলো জ্বেলে বুঝলেন, ঘড়িটার স্বভাব ইদানীং বেয়াড়া রকমের। চাবি দিয়ে কিছুক্ষণ কানের কাছে না ঝাঁকালে বাবুর কাঁটা নড়ে না। হাফ দম দিয়ে ফেলে রাখলে ঘড়ি শুনবে কেন! ঘড়িটা আরও বেয়াড়া হয়ে উঠছে।

তিনি বললেন, বেটা তুইও শোধ তুলছিস।

ঘড়িটার কাঁটা দুবার নড়ল। আলো জ্বালা বলে মাকড়সার ঠ্যাংয়ের মতো মনে হচ্ছে। কতকাল দম দিয়ে ঠিক রেখেছেন। অয়েলিং করেছেন কতবার। আবার তেল গ্রীজ খেতে চায়। ঘড়িটা নিজেও ক'বার খুলে কারিগরি করেছেন। ঘড়িটা নিয়ে আবার কেন জানি তাঁর বসতে ইচ্ছে হল। কারণটা তিনি ঠিকই জানেন, কিছু নিয়ে পড়ে থাকা অভ্যাস মানুষের। এককালে, প্রকৃতি, তার উদাস মাঠ, বিদ্যালয়, এককালে বাবা-মার গ্রাসাচ্ছাদন, ভাই-বোনেদের বড় করা—সোজা কথায় কর্তালী করার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করা এবং পরে যামিনী, পুত্রকন্যা সব নিয়ে আবার ঠেলে উজানে নৌকা নিয়ে যাওয়া—সারাজীবন একজন মাঝি আর নৌকার সম্পর্ক যেমন থাকে আর কি!

ঘড়িটা নিয়ে বসার আগে তাঁর কেমন চা খাবার বাসনা হল। বাসনাগুলো আছে বলেই রক্ষা। যদি না থাকত, তিনি আছেন, অথচ তাঁর আর কোন বাসনা নেই, তবে তো মৃত ঘোড়া। এখনও কতটা টগবগে ভাবার জন্য বেশ দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামলেন। অন্ধকারে পায়ের মধ্যে কি একটা ঠেকল। সিঁড়িটার এদিকটায় তিনি হাঁটেন না বড়। ছোট এ-ঘরটায় থাকত—পড়ত। ডাক্তারি পড়াটা এত বিদঘুটে তিনি যদি জানতেন। আস্ত মানুষের কঙ্কাল একটা না হয় থাকলই ঘরে! তাই বলে মানুষের আলগা সব যন্ত্রপাতি এনে ঘরটা যে ভরে ফেলা কেন! মানুষের ভিশেরা এবং লিভার দেখতে এমন কদাকার! আর উৎকট ফরমেলিনের গন্ধে ঘরে ঢোকাই দায়। বছর দুই এ-সব ঘরটায় জাঁকিয়ে ছিল। ফাইনাল ইয়ারে ওঠার আগে সব বিদেয় করে দেওয়া হল। কিন্তু মনের খুঁতখুঁতানি যায় না। দক্ষিণা কালীর পূজা এবং চণ্ডীপাঠ। দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন। সন্ধ্যায় মনে হয়েছিল তাঁর বাড়িটার আবার তিনি শুচিতা ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন। এবং রাতে চাদরের নিচে কী একটা শক্ত কিছু লাগতেই উঠে বসেছিলেন। কী লাগে! হাত দিয়ে মনে হয়েছিল একটা শক্ত কিছু। চাদর তুলে মনে হয়েছিল স্পঞ্জের মতো কি যেন—নরমও নয়, খুব শক্তও নয়। ছোটকে ডেকে বলেছিলেন, এটা এখানে কি দেখতো!

ছোট দেখে বলল, নাকের হাড়!

সব যে তোর কাছ থেকে কে কিনে নিয়ে গেল! এটা এখানে এল কি করে!

সেই তো।

তিনি জানেন ছোটর স্বভাবটা বড় এলোমেলো। কঙ্কালটা সে নিয়ে এসেছিল একটা বড় বেতের ঝুড়িতে। দু-দফায় আনতে হয়েছে। এক জায়গায় বসে এক নাগাড়ে পড়তে পারে না বলে, এখানে ওখানে সব ঘরে, কেবল ঠাকুরঘর আর রান্নাঘর বাদে কি-ভাবে যে কঙ্কালটার অজস্র হাড় এখানে সেখানে পড়ে থাকত! মানুষের মধ্যে কত হাড় থাকে তার হিসাব ছোট রাখে। কলেজের নতুন ছেলেটি যখন ঝুড়িটা সহ হাড়গোড়গুলি কিনতে এল, বার বার তিনি বলেছিলেন, মিলিয়ে নিও। ছোটর কিছু ঠিক থাকে না। কোথাও কিছু পড়ে থাকল কি না....।

ছোট, ছেলেটিকে বলেছিল, সবই আছে। এদিক ওদিক দু-একটা পড়ে থাকলে তোমায় খবর দেব।

সেই থেকে তিনি প্রায়ই প্রশ্ন করতেন, আর নেই তো!

ছোট বলেছিল, নেই।

তারপর বছর না ঘুরতেই বিছানার নিচে কি করে যে একটা নাকের হাড় ভেসে ওঠে!

সেই থেকে কখনও অন্ধকারে কিছু শক্ত মতো পায়ে ঠেকলে ভাবেন, ছোটর সেই কঙ্কালের হাড়। সে কবেকার কথা—অথচ সেই আতঙ্কটা তাঁর এখনও আছে। নিচের ঘরের জানালা বন্ধ থাকে বলে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এখনও এ-বাড়িতে কঙ্কালটা তবে আছে! আসলে প্রেতাত্মা এবং কঙ্কাল, সংসারে নানাবিধ সংস্কার মানুষের—সবই কিন্তু কিম্ভূতকিমাকার। আলোটা জ্বালতেও ভয় পাচ্ছেন। কাউকে যে ডাকবেন তারও উপায় নেই। এখন একটা বুড়ো মানুষ খালি বাড়িতে প্রেতাত্মার ভয়ে ছোটাছুটি করছে ভাবতে গেলেও লজ্জা। বরং উপরে উঠে যাওয়া যাক। বাড়িটা ফাঁকা বলে তেনার উপদ্রব বাড়তেই পারে। কোনরকমে তবু আলোটা জ্বাললেন। বড় ঘাম হচ্ছে। দেখলেন পায়ের কাছে পড়ে আছে বাপ্পার একটা চীনেমাটির কড়ে আঙুলের মতো পুতুল।

পুতুলটি হাতে নিতেই মনে হল তিনি একা নন। তাঁর দোসর বাপ্পার পুতুল। সুতরাং পুতুলটি তিনি রান্নাঘরে নিয়ে একপাশে দাঁড় করিয়ে রাখলেন—চা করলেন গ্যাসে। তারপর এক হাতে পুতুল অন্য হাতে চা। তিনি পুতুলটিকে সামনে বসিয়ে ঘড়ি মেরামত করতে বসলেন। কথাবার্তা পুতুলটার সঙ্গেই হচ্ছে।

—বাপ্পা তোমাকে আদৌ ভালবাসে বলে মনে হয় না।

পুতুলটা বলল, হ্যাঁ ভালবাসে।

ভালবাসলে ফেলে যাবে কেন।

ওর কত কাজ। স্কুলের পড়া আছে না। বাপ্পার মা তো আমার উপর রেগে সব সময় টং হয়ে থাকতো।

তিনি ঘড়িটা একটা ছোট ছুরি দিয়ে খুলে ফেললেন এ-সময়। কাপ তুলে চা খেলেন। তারপর যেন কিছু বলা—বলতে হয় বলে বলা—তুমি বাপ্পার সঙ্গে সব সময় খেললে রাগ তো করবেই।

বাপ্পার মাও তো খেলে। ওই তো নিয়ে গেল—কেবল সারাদিন পেছনে লেগে থাকবে। পড় পড় বলবে। এটা খেলা না!

কখনও না। সকালবেলা আর সন্ধ্যায় পড়বে। আমি বলে দিয়েছি, বিকেলে ওকে খেলতে দিও।

দেবেই না। একগাদা টাসক দিয়ে বসিয়ে রাখবে। এখানে এসব পারতো না বলেই তো চলে গেল।

মিছে কথা। স্প্রিংটা সহ ঘড়িটা তিনি কানের কাছে ধরে তখন বললেন।

সত্যি কথা। তোমার উপদ্রবে বাপ্পার মা চলে গেল। তুমি না কিছু বোঝা না!

আমার উপদ্রবে!

তা-ছাড়া কী। তুমি এত আসকারা দিলে ও মানুষ হবে কি করে?

পুতুলটির এত কথা শোনার পর তিনি কেমন আরও গুম মেরে গেলেন।

সকালে বাপ্পা এসে দুষ্টুমি করত। তা করবে। না করলে বাড়িটা বাড়ি মনে হবে কী করে! চশমাটা নিয়ে দৌড়াত। দু-হাত ভর করে চশমা চোখে দিয়ে বিছানায় উবু হয়ে শুত। কখনো তাঁর বাঁধান দাঁত লুকিয়ে মজা করত। সকালবেলাতে প্রায় দাদু নাতি এই নিয়ে উপর নিচ ছোটাছুটি চলত। বউমার মেজাজ তখন ভারি অপ্রসন্ন হয়ে থাকত। বউমা যত অপ্রসন্ন হত তিনি তত মজা পেতেন। বাপ্পাও। আমার বাড়ি, আমার নাতি, তুমি কোথাকার কে হে—ওর ভাল-মন্দ তুমি আমার চেয়ে বেশি বোঝ!

নাও এবার। শুধু নিজে গেল না, ঘাটি বাটি সুদ্ধু নিয়ে চলে গেল। একা থাকার কী মজা বোঝ এবার!

তিনি কেমন মিইয়ে গেলেন। তারপরেই কী মনে হতে বললেন, এই একটা কাজ করবে?

কী কাজ?

আমার নাতি তুমি। সকালবেলাটায় ঠিক আগের মতো উপর নিচ ছুটোছুটি চলবে। কে বন্ধ করে দেখি!

সেই ভাল।

তারপর নিজেই বোকার মতো হেসে ফেললেন। কী যে পাগলামি করছেন বাপ্পার পুতুলটার সঙ্গে। তারপরেই মনে হল, পুতুল, না সেই কঙ্কালটার বুড়ো আঙুলের হাড়। আলোর কাছে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে থাকলেন। কখনও মনে হচ্ছে বুড়ো আঙুলের হাড়, অথবা কখনও চীনেমাটির পুতুল। বেঁচে থাকার পক্ষে কোনটা এখন বেশি দরকার। একটা মরা মানুষের বুড়ো আঙুলের হাড় না, বাপ্পার চীনেমাটির পুতুল! কোনটা? কোনটা! চীনেমাটির পুতুল! এটা সত্যি চীনেমাটির পুতুল! বুড়ো আঙুলের হাড় না। না—না না। এই তো কথা বলছে, আচ্ছা তুমি নিচে সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে চাও। বাপ্পার মত আমাকে উপর নিচ হয়রানি করতে চাও। সেই ভাল। তুমি আর যাই হয়ে যাও একটা কঙ্কালের হাড় হয়ে যেও না। হ্যাঁ হ্যাঁ যা বলবে শুনবো--এই তো যাচ্ছি। আরও জোরে! ছুটছি তো।

লাফিয়ে লাফিয়ে নামো। আমি কেমন সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে নামছি দেখ। কতকাল, কতবার সিঁড়ি ধরে নামব উঠব, তুমি পারবে না কেন।

হ্যাঁ আমি পারব। বাপ্পার সঙ্গে পেরেছি, তোমার সঙ্গেও পারব। তিনি হাতে পুতুলটা নিয়ে নিচে উপরে দ্রুত নামতে উঠতে থাকলেন। যেন কথা না শুনলে চীনেমাটির পুতুলটা বায়না ধরেছে, কঙ্কালের বুড়ো আঙুলের হাড় হয়ে যাবে।

লক্ষ্মণ এসে দেখল সদর বন্ধ। অন্যদিন খোলা থাকে। সকালে বুড়োকর্তার জলখাবার, দুপুরের খাবার করে দিয়ে যেতে হয়। সন্ধ্যায় এসে আর এক প্রস্থ কাজ। রাত্রে ডাক্তারবাবুর ফ্ল্যাট পাহারা। সদর খোলা নেই

কেন! বুড়ো মানুষটা বারান্দাতেও নেই। সে বেল টিপল। লোডশেডিং হতে পারে। সে কড়া নাড়ল। একবার দু'বার। পরে জোরে, খুব জোরে। দরজাটা আজ কেউ খুলে দিল না।

দরজা ভাঙলে দেখা গেল সিঁড়ি ধরে নেমে আসার পথে তিনি দুহাত বিছিয়ে পড়ে আছেন। স্ট্রোক, অথবা দুর্ঘটনা। সবাই দেখল হাতের মধ্যে কিছু একটা আছে। কী ওটা! হাতে দিতেই ছোট টের পেল, মানুষের বুড়ো আঙুলের হাড়। মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটিকে সোজা রাখে হাড়টা। সে, হাড়টা গোপনে বাবার হাত থেকে তুলে নিল। কঙ্কালের হাড়টা সব বাড়িতে শেষ পর্যন্ত কেন যে থেকে যায়!

আবাদ

খরা বড় খরা চলছে হে! মানুষটা বিড়বিড় করে বকছিল।

খরায় মাঠঘাঠ সব শেষ। সুমার মাঠে কোথাও একদানা শস্য ফলে নি। জমির পর জমি তামাটে রঙ ধরে আছে। শুধু খড় আর খড়। একটা ফড়িং পর্যন্ত উড়ছে না। পোকামাকড় সব অদৃশ্য। মাঠ উরাট থাকলে যা হয়—আগাছায় ভর্তি হয়ে আছে—দুটো একটা সাদা ফুল, কোথাও ইতস্তত সাদা বক উড়ে বেড়াচ্ছে।

বুড়ো মানুষটা গাছের গোড়া খুঁটে কী দেখল। মুখ ব্যাজার। শুধু যে ধুলোবালি ওড়ে!--হা কপাল তোমার রস নাই হে। গর্ভে তোমার রস নাই।

আকাশ আদিগন্ত সেই মতো বিস্তৃত। গাছপালা সেই মতো দাঁড়িয়ে। পাকা সড়কে সেই মতো বাস যায়। শুধু মানুষজন সুস্থির নেই। বুড়ো মানুষটা নিজের জমির মধ্যে দাঁড়িয়ে। তার গরুবাছুর গেল। আবাদ গেল। বালির-ঘাটের পাইকার বেচু মণ্ডল কিনে নিল সব। এখন তার জমির খড়ে নজর। শুয়োরটা বলে কি না, গাছ তো সব ন্যাড়া হয়ে গেল ঠাউরদা।

মুখে তার কঠিন হাসি খেলে গেল।—কিছু বুঝি না মনে করে। অরে, কুঞ্জ ঠাকুর সব বোঝে। তোর মতিগতি সব বোঝে। কেবল মরে পড়ে আছে তাই।

না শুকায় নি। ন্যাড়া হয় নি। দেখ না জল হল বলে। জল হলেই ঝাড় খেলবে। আবাদ হবে; ঠিক হবে। তুই চোখ দিস না। তোর চোখ ভাল না। নজর বড় খারাপ। সব ভাগাড় হয়ে যায়।

এ-সব যেন সেই কবেকার কথা!

তরাসে বুক কাঁপে কুঞ্জ ঠাকুরের।—ও পালান লাফাস না। ফড়িং যে কটা আছে থাক। পিছু নিস না ভাই। আবার জল হলে ওরা ওড়াউড়ি করবে।

যেন এইসব কীটপতঙ্গ বেঁচে থাকলে, ডাকাডাকি করলে সামনের বছরটা এমন অজন্মা যাবে না। এরা জমির লক্ষ্মী। প্রকৃতির জীব, তারে হেলাফেলা করতে নেই। বেচুর কামড়ের জ্বালায় মরছে, তার উপর নতুন উপদ্রব দেখা দিলে সব যাবে। চামারের মতো ফাঁক পেলেই বেচু লাল সড়ক থেকে নেমে আসে। হাতে শানানো গোপন অস্ত্র। ফাঁক পেলেই তার ছালচামড়া খুলে নেবে।

অ ঠাউরদা আছেন নি! আমি বেচু—

আমি থাকব না কেনরে! আমি বেচু! তা কি চাস! ঘুরঘুর কেন!

একখান কথা আমার।

কী কথা!

পাঁচ কেজি গম। ভেবে দেখেন, পাঁচ কেজি। মাঠ খড় হয়ে আছে। আর মায়া বাড়িয়ে কি হবে ঠাউরদা। পাঁচ কেজি গম কম কথা না। পরে গরুতেও খাবে না। সব ন্যাড়া হয়ে যাবে।

আমার আবাদ আমি বুঝি না! এই করে কুঞ্জ ঠাকুর ঠেকিয়ে রেখেছিল বেচুকে। কিন্তু কালান্তক যমের মতো দাঁড়িয়ে বেচু। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই বেচু। হা হা করে হাসে। তিড়িং তিড়িং করে নাচে। কী মজা! অকাল আসছে, কী মজা! জমিতে এখন খড় তারপর ন্যাড়া। গরুতেও মুখ দেবে না। পাঁচ কেজি গমও যাবে। খড়ও যাবে।

কুঞ্জ ঠাকুর ভয় পেলেই ডাকে—ও পালান, দূরে যাস না। রোষে পড়ে যাবি।

—আমি যাইনি দাদু।

—তুই কোথায়?

—এই ত। পালান জমির মাঝখানে ভোঁস করে ভেসে ওঠে।

তা ঠাউরদা আপনে বুড়া মানুষ কী বলব—ঠকাতে পারি না। বামুন মানুষরে ঠকাতে নাই ঠাউরদা। রাজি হয়ে যান। তবে গরুবাছুর জলের দরে দিছেন যখন আর পাঁচ কেজি। বলেই হাঁকার, ও পালানের মা আমি উঠছি। তোমার শ্বউর রাজি না। পালান দ্যাখ তোর মা কোথায়—ডাক।

পালানের মা তো এক পায়ে খাড়া। না ডাকতেই গলা হাওয়ায় ভেসে আসে, অ বেচুদাদা ডাকছ!

হ্যাঁ দেখ না, ঠাউরদা মাথা পাতছে না।

না পাতবে, মরবে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে মরণ হয় বুড়ো বোঝে না।

বাড়ির আমগাছটার নিচে দাঁড়িয়ে বেচু এমন কত কথা বলে গেছে। কুঞ্জ ঠাকুর রাজি হয় নি। গোড়ায় তখনও রস ছিল। আশা কুহকিনী। জল একটা পেলেই আবার ঝাড় ছাড়বে। সারা দিনমান চোখ আকাশে। কোথাও গুড়গুড় শব্দ হলে বের হয়ে দেখা, মেঘ উঠছে। হবে হবে। তারপর ছিটে-ফোঁটা হয়ে কোথায় যে মেঘেরা সব উড়ে যায়। চোখ জ্বলে। জল হয় না। গোড়া ভেজে না। আর পালানের মার শাসানি—দশ কেজি গম কম কিসে। কে দেয়! ঘরে গরুবাছুরও নেই যে খাওয়াবে। আকাল আসছে--বোঝ না বুড়ো।

হারামজাদি তোর বাপের জমি, তোর স্বোয়ামীর জমি—জমি আমার। আমি বুঝব। আবাদ ঠিক হবে। জল হবে। এই হবে হবে করে বেচুকে সে ঘোরাচ্ছিল। ঘোরাবার ইচ্ছে ছিল না। সাফ বলে দিতে পারত, হবে না। কিন্তু দিনকাল খারাপ। আকাল আসছে। মানুষ খেতে পাবে না, না খেয়ে মরে যাবে—না হলে বেচুর ইতরামির জবাব সে দিতে পারত। ঘোরাঘুরির ফাঁকে বেচুর আসল টান যে কিসে যেদিন ধরতে পারল—কথা না দিয়ে পারল না। ছল-ছুতো করে আসা—দশ কেজি গমে রাজি হয়ে গেলে ছলছুতো খুঁজে পাবে না। কী জানি, নালে যদি সব যায়। যদি সত্যি বেচু তার বাড়িটাকে ভাগাড় বানিয়ে ফেলে! চামার মানুষ পারে না, হেন কাজ নেই। ধর্ম নাই। কেবল লাল সড়ক থেকে নেমে আসা, ডাকা—অ ঠাউরদা কিছু ঠিক করলেন! দশ কেজি গম কম কথা না। পালান কইরে, তর মারে ডাক। এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দিতে ক' তর মারে। সেই কখন বের হয়েছি।

কালান্তক যমের মতো বেচু নেচেই যাচ্ছে। চারপাশে বেচু। হাত তুলে পা তুলে লাফাচ্ছে। পরনে লুঙ্গি, হাফ শার্ট গায়ে, হাতে লাঠি। পায়ে বুট জুতো। গায়ে শ্বেতী রোগ আছে বলে কালো সাদা ভূতের মতো, যেন দাঁত বের করে নাচছে আর পাচনের খেলা দেখাচ্ছে। পাঁচ আঙুলে পাঁচখান আংটি—সোনা রুপো তামা লোহা মিলে সব ক'খান রোদের ঝিলিকে ঝলসে উঠছে। বেচু লুঙ্গি তুলে—

অ বেচু লুঙ্গিটা শালো নামিয়ে বোস। পালানের মা জল দিতে আসছে।

—পালানরে পালান।

—ডাকছ কেন!

—ওখানে কী করছিস।

এই দ্যাখ, বলে কুঞ্জ ঠাকুরের নাতি পালান একটা মরা ব্যাং তুলে দেখাল।

—ছিঃ ছিঃ পালান। ফেলে দে।

আবার পালান একটা মরা গঙ্গাফড়িং তুলে দেখাল।

কুঞ্জ ঠাকুর ভেবে পায় না, পালান কেন সব মরা কীটপতঙ্গ খুঁজে বেড়াচ্ছে। পালানও কি বোঝে আকাল আসছে!

কোন পাপে কারে খায় কে জানে! গালে কতকালের যেন বাসি দাড়ি, বগলে ছেঁড়া ছাতা আর একখান লাঠি সম্বল করে সে আর দু-খণ্ড ভুঁইয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। শেষ দেখা । আবাদের শেষ দেখা। সত্যি উরাট হয়ে গেছে জমি। শীত আসছে। বড় ঠাণ্ডা। কনকনে ঠাণ্ডায় হাত পা কেমন স্থবির হয়ে যাবে তার। চামারটা আবার কী অজুহাতে আসবে কে জানে!

গন্ধ শুঁকে টের পায় বেচু।

তা বেচু জল ভালই হল। বীজধান চাই। এসব ভাল সময়কার কথা। বাছুরটা বাগি দিলে ফিরে আসত। কিন্তু হাত ফাঁকা। আবাদে কত লাগে বল!

তা ঠাউরদা আবাদ ঠিকঠাক হলে এক গণ্ডা বাছুর কিনে নিতে পাবেন। এই বেচুই আপনেরে দিয়ে যাবে। তবে একখান কথা ঠাউরদা—লালন পালন বলে কথা। কষ্ট হয় বুঝি! বাছুরটা আর পালানটাই আপনের সম্বল। কী করবেন, আবাদ বলে কথা। মা লক্ষ্মীরে আর উপোস রাখা চলে না।

তুমি বড় বুঝদার মানুষ হে! তা কপালখানা যার এ-রকমের তার ভাগাড় তুমি টের পাবে না ত কে পাবে! আর বিশটা টাকা ধরে দাও বেচু!

ও পালান, তর মারে ডাক দিহি। ঠাউরদা বিশ টাকা বেশি চায়। কোথা থেকে দি। আমার ত বেচাকেনা করার কথা। আর কবি য্যান এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দেয়।

থাক থাক বেচু। ঠাণ্ডা জলের আর দরকার নাই। তোমার কথাখানাই থাকল। পালান যা ত ভাই বেচুর জন্য ঠাণ্ডা জল আন এক গেলাস।

দাঁত বের করে কী হাসছে দেখ বেচু!

—ও দাদু কার সঙ্গে কথা বলছিস?

—না ত, কথা বলছি না ত!

—কে দাঁত বের করে হাসছে।

—কই, কেউ না তো।

কুঞ্জঠাকুর হাঁটছে। গাছগুলি নুয়ে নুয়ে দেখছে। আর তাকাবে না কোনোদিকে। তাকালেই বেচু! পালানটা পর্যন্ত ধরে ফেলেছে, বেচুর সঙ্গে সে অহরহ কথা কয়। মাড়ির একটা দাঁত বেচুর আলগা। কে করেছিল সে জানে না। কথা বললে গাল তার নড়ানড়ি করে। দাঁতটা ঝুলে পড়েছে। আর একটা দাঁত ঝুলে পড়লেই—হা হা আমি বেচু, আকাল আসছে, কী মজা!

বেচু তোমার দাঁত কে আলগা করে দিল।

পালানের মা ঠাণ্ডা জল।

দাঁত তোমার থাক। টাকাটা।

লপ্তে লপ্তে দিয়ে যাবে।

একসঙ্গে হবে না!

দিলেই ত পেটে। সব খেয়ে ফেলবেন। পালানের মা তোমার শ্বউর সব টাকা এক লগে চায়।

না না—সব না। বেঁচু দাদা ওটার কী হল।

হবে। তবে আগাম চায়।

আগাম! আগাম কিসের বেচু?

কুঞ্জঠাকুরের চোখ উপরে উঠে গেছিল বেচু আর পালানের মার কথা শুনে।

তা বেচু লপ্তে লপ্তেই দিও। বামুন মানুষকে ঠকিও না। পালানের বাপটা বেঁচে থাকলে...। বাকিটুকু বলতে সাহস পায়নি। আসলে বলতে চেয়েছিল কুঞ্জঠাকুর—দাঁত তোমার ভেঙে দিত।

আপনে ঠাউরদা ভাইবেন না। বেচুর কথার দাম আছে! কোন শুয়োরের বাচ্চা আছে বলবে বেচু কথা ঠিক রাখে না। কোন শর্মা আছে লাল সড়কে, বলবে বেচু বেইমান। ঠগবাজ। বাপ জন খাটত। বিবেক ছিল না মানুষটার। বুদ্ধি কম। পুত্র তার পাইকার মানুষ। দারোগাবাবু দেখলে পর্যন্ত হাসে।

দারোগাবাবুর হাসার পর আর কথা নাই। কুঞ্জঠাকুর গোয়ালে ঢুকে বাছুরটা বের করে আনছে। গরুটা আগেই নিয়ে গেছে বেচু। বাছুরটা ঘাড় শক্ত করে রেখেছে। গোয়াল থেকে টেনে বের করা যাচ্ছে না। বেচু লুঙ্গি কোমরে খিচে ছুটে গেল এবং হ্যাঁচকা টান মারতেই হড়হড় করে বাছুরটা বের হয়ে এল। পালান তখন খেপে গিয়ে বেচুকে ঢিল ছুঁড়ে দিয়েছিল। ঘাড় তেড়া করে বলেছিল, শালা!

কী কু-কথা মুখে! কত মানি মানুষ বেচুদা। পালানের মা ছুটে এসেছিল। পালান মাকে দেখেই ছুট। তারে আর পায় কে! ঝোপ জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেছিল সে।

—দাদু!

—হুঁ!

হুঁশ ফেরে মানুষটার। সে তার উরাট জমিতে বসে পড়ে। হাঁটুতে বল পায় না। আকাল আসছে শুনেই শরীরটা কেমন তার দুবলা হয়ে গেল। চোখের সামনে বল ভরসা এই ভুঁইটুকু। বছরকার খোরাকি টানাটানি করে হয়ে যায়। খরা দেখা দিতেই সে কেমন একটা তরাসের মধ্যে পড়ে গেল। ভাবনা তার, নাতিটার কী হবে।

সে বসে থাকে। আর উঠতে ইচ্ছে হয় না। গাছগুলি থেকে মরা মরা গন্ধ উঠছে। সে নাক টানলে গন্ধটা পায়। গাছের গুঁড়ি শুঁকে বুঝল, সব শেষ। হাত দিয়ে গাছের গোড়ায় শেষবারের মতো কী খোঁজে। না নেই। ধুলোবালি ওড়ে শুধু তারপর কেমন আবাল মানুষের মতো হাউহাউ করে তার কান্না পায়।—হ্যাঁ আমার সোনার ধানরে!

পালান লাফিয়ে বেড়াচ্ছে জমিতে। পরনে ইজের। খালি গা। রোদ ঝলকাচ্ছে। উত্তুরে হাওয়া পালানকে কাবু করতে পারে না। জমিতে এলেই সে বোঝে, এটা তার দাদুর জমি। বাবা তাকে কাঁধে করে নিয়ে আসত। নিড়ান দেবার সময় সে আগাছা তুলে নিয়ে জমা করত আলে। মাথায় করে নিয়ে আসত এক থালা ভাত। বাপ দাদু নাতি খেত উবু হয়ে। সেই বাবাটার যে কী হল! আর সে বাবাকে দেখে না। কবেকার কথা যেন। বাবা জমি নিয়ে কত কথা বলত। জমি মানুষের বল ভরসা, বলত। বাপ না থাকায় দাদুর যে কী হল, কোথাও গেলেই কেবল ডাকে—হা পালান দূরে যাস না। রোষে পড়ে যাবি। সেই দাদুটা জমিতে বসে হাউহাউ করে কাঁদছে! সে ছুটে গেল দাদুর কাছে। দেখল, দাদু উবু হয়ে জমিতে পড়ে আছে। গাছের গুঁড়ি মুঠো করে ধরা।

সে ডাকল, দাদু, ও দাদু। ওঠ। ওঠ না দাদু!

পালানের ডাকে কুঞ্জঠাকুর স্থির থাকতে পারে না। উঠে বসে। তাকায়।

—পালান। আমাকে ডাকছিস! ভয় পেয়ে গেছিলি নারে!

পালান বড় বড় চোখে দাদুকে শুধু দেখে।

—পাশে বস। পালান দাদুকে জড়িয়ে ধরে পাশে বসল। বলল, তুই কাঁদছিস! আমি বুঝি!

কী বুঝিস?

বাবা নেই বলে তুই কাঁদছিস!

ধুস, তুই আছিস না! একটা বছর বেঁচে থাকতে পারবি না! একটা বছর! তারপর আবার বিড়বিড় করে বকতে থাকে—বেচু তুই আমার বাড়িটায় ঘুঘু চরাতে চাস। ভাগাড় বানাতে চাস। বুঝি। পালানের মাকে বার করে নেবার তালে আছ। সব খালি করে দেবে! আমার পালান আছে না! গাছেরও গাছ থাকে। বীজেরও বীজ! গাছ বড় হয়, বাড়ে। ফুল ফোটে—ফল ধরে।

—কী বলছিস দাদু—বুঝি না।

—তোর মা কখন ফিরবে বলে গেছে রে?

—তোকে বলেনি কিছু?

—না। আমাকে বলবে কেন! আমি ত একটা মরা গাছ।

—ফিরতে রাত হবে।

—রাত করে ফেরাটা ভাল?

পালান বলল, দাদু ওঠ। বাড়ি যাব। খিদা পেয়েছে।

তারপরই মনে হয় বুড়ো মানুষটার; তার মাথা খারাব হয়ে যাবে নাত! পালান এ-সবের কী বোঝে! রাত করে ফিরলে কী হয় সে জানবে কী করে। রেলগাড়ি চড়ে যায় আসে। লেট থাকে গাড়ি—রাত হতেই পারে। বেচু পালানের মাকেও বেচাকেনাতে লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তরাসে পড়ে গেলে যা হয়, সে ভাবে, আসলে কলকাঠি নাড়ে বেচু। আবাদের নাম করে গরুবাছুর গেল, জমির খড় গেল। পালানের মাটা না আবার হাতছাড়া হয়ে যায়! মুখরা মেয়ের সঙ্গে সে পেরে ওঠে না। বললেই, এক কথা—খাবে কী! ইজ্জত ধুয়ে খাবে! সবাই লেগে পড়েছে। কিন্তু বউ তোর শরীর বড় না তোর পালান বড়—আমি যে কিছু বুঝি না!

—ও দাদু বলছি না খিদে পেয়েছে। খাব। চল বাড়ি যাই।

—বাড়ি যাবি। খাবি! তোর মা আর কী বলেছে রে!

—কী বলবে?

—এই না মানে বেচুটা, বেচুটা কোথায় এখন কে জানে—পালানরে....।

পালান কিছুই বোঝে না। দাদুটা তাকে কেন যে কেবল ভয়ের মধ্যে ফেলে দেয়। আর ভয় পেলেই তার এক কথা—আমার মা আছে জান!

—ঐ এক কথা তোর ব্যাটা! গাছের সঙ্গে কথা পাখির সঙ্গে কথা—আমার মা আছে জান! জানব কিরে ব্যাটা। মা আমারও ছিল।

—তোমার মা আছে?

—আছে না! মানুষের মা না থাকলে চলে?

—কই কোথায়? দেখাও।

বুড়ো মানুষটা থাবড়া মারল ভুঁইয়ে।—আমার জননী। তারপরই কেমন পাগলের মতো পালানকে দু-হাত বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল, ব্যাটা আসলে তুই ভয় পেলেই কথাটা বলিস। আমার মা আছে। কেন আমি আছি না। গাছেরও গাছ থাকে--আমি আছি না।

কী যে বকবক করতে পারে দাদু।—এই ওঠ যাব। খিদা লেগেছে। সে হাত ধরে দাদুকে টানতে থাকে।

সে হা হা করে হাসল।—জননীর কোল। বড় শক্তরে তোলা। টান দেখি। মুরদ কত দেখি। পারলি না। বলেই কুঞ্জঠাকুর মরা ধান গাছের ভেতর পা দু-খানি ছড়িয়ে দিল।

পালানের চোখ গেল তখন জমির দিকে। একটা বাছুর নেমে আসছে। জমিতে মুখ দেবে। গাছগুলো মুড়িয়ে খেতে কতক্ষণ। সে জানে বাছুরটা তাদের শত্রুপক্ষ। আবাদ লেগে যেতেই দাদু তাকে জমিটায় পাহারা বসিয়ে দিয়েছিল। সব সময় সতর্ক নজর, গরু ছাগলে সব না খায়। দাদুর কী তরাসও পালান যা, দেখগে জমিতে গরু বাছুর পড়ল কি না। গাছ বড় হচ্ছে, সবার লোভ। মানুষের লোভ। গরু-বাছুরের লোভ। পাখ-পাখালির লোভ। দাদুর হাঁক পেলেই সে ছুটত। হাতে মরা ডাল, সামনে যা কিছু পেত, হাতে নিয়ে ছুটত।

দূর থেকেই ঢিল ছুঁড়তে থাকল পালান। এগিয়ে যাচ্ছে, আর ঢিল ছুঁড়ছে। ভ্রূক্ষেপ নেই। ইজের খুলে গেল ছুটতে গিয়ে। ইজেরটা বগলে নিয়ে আবার ছুটল। বাছুরটার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন কিছু বোঝে না মতো পালানকে একবার মুখ তুলে দেখল। পালান বুঝল, ব্যাটা বড় ধুরন্ধর। ল্যাজ মুচড়ে না দিলে নড়বে না। পালাবে না। সে প্রথমে হাতে থাবড়া মারল বাছুরটার পিঠে। নড়ছে না। কী বেহায়া রে বাবা, বলছি না, যা। আমাদের জমি। আমাদের ধানগাছ। যা। যাবি না। বলেই সে লেজে মোচড় লাগাল। মোচড় খেয়ে বাছুরটা লেজ তুলে পালাল ঠিক, কিন্তু পালান লাথি খেয়ে পড়ে গেল। লাগে নি। সে উঠে দাঁড়াল। ইজেরটা দিয়ে মুখ মুছে তাকাল জমিটার দিকে। দাদুকে দেখতে পেল না। সে যে কত কাজের দাদুটা দেখল না। সে যে কত সাহসী দাদুটা বুঝল না।—আমি ভয় পাই! দাদুটা না কী! আমি ভয় পাব কেন, আমার মা আছে না। ভয় তোর! তোর মা নেই। গাছের মা নেই। পাখি প্রজাপতির মা নেই। তা সে বলে! একা থাকলে বলে। মা নেই বাড়ি, দাদু গেছে হাটে তখন তার তো গাছ পাখি প্রজাপতি একমাত্র সঙ্গী। এরা তার সঙ্গে কথা বলে। সেও

বলে। গাছ একা দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে কেউ খাওয়ায় না। পাখি উড়ে বেড়ায়, কেউ তারে খেতে দেয় না। ফড়িং প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়—কেউ তারে সঙ্গ দেয় না। তার কষ্ট হয়। সে বলে তোমাদের কেউ নেই না।

গাছের পাতায় সরসর শব্দ হয়। পালান কান পেতে শোনে। গাছে উঠে ডালে বসে থাকলে হাওয়ায় কারা যেন বলাবলি করে।--পালানটা আমাদের ডাল ভেঙে দেয়। পাতা ছিঁড়ে নেয়। ওকে আসকারা দিও না। বড় খারাপ পালান। ওর কান মুচড়ে দাও।—হুঁ কান মুচড়ে দেবে না! জান না, আমার মা আছে। তোমাদের মা আছে! মাকে বলে দেব। কিংবা তার এটাও হয়, কতদিন দেখে একটা গাছ সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। বড় একা!—তোমার মা নেই! এমন প্রশ্ন করে সে। নিজেই আবার কি ভেবে বলে, আমার মা আছে। মা বেথুয়াডহরি গেছে। বেলাবেলিতে ফিরে আসবে। আমার জন্য পানিফল আনে—জান!

বুড়ো মানুষটা দেখতে পায়, তার নাতির চারপাশে সব মরা ধানগাছ হাওয়ায় দুলছে। যেন তারা বেঁচে আছে মতো নাতিটাকে ছলনা করতে চায়। ওরে পালান, এরা আর গাছ না। খড়। পালান বড় বড় চোখে গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে। খড়ের ভিতর উবু হয়ে আছে বলে পালান তাকে দেখতে পাচ্ছে না। পালান বোঝে না, তার পাহারার কাজ শেষ হয়ে গেছে। জমি উরাট হয়ে আছে। হাঁরে পালান সব জ্বলে পুড়ে গেল। সে থুথু ছিটায়। মুখে পোকামাকড় ঢুকে গেলে যেমনটা হয়ে থাকে। সে হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট থেকে লালা মোছে। থুথুর সঙ্গে ওক উঠে আসে। —ছেনালির ছলনার অন্ত নাই গ! কাকে বলে বোঝা যায় না। বেচু না প্রকৃতিকে বোঝা যায় না। উরাট জমি না পুত্র-বধূকে বোঝা যায় না।—তোর খেতায় আগুন। আমার আবাল নাতিটা কিছু বোঝে না। থু থু। তারপরই ফের থাবড়া মারে ভুঁইয়ে—এই আমার জননী তুই। পেটে থাবড়া মারে।—গর্ভের রস লুকিয়ে রাখতে পারলি না! তুই না জননী! তারপর সে গাছের ফাঁকে মাথা তুলে দেয়। চারপাশটা দেখে। উরাট জমিতে দূরে দূরে ঘোরাফেরা করে মানুষজন। হা-হুতাশ সম্বল সবার। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। কনকনে উত্তরে হাওয়া শুধু ক'দিন থেকে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। আকাশ ঘোলা-ঘোলা। ঘূর্ণিঝড় ওঠে। খড়কুটো ভেসে যায়। বৃষ্টি আসে না।

তা বেচু তুমি নিতে পার। গরু বাছুর নিয়েছে, এও নিয়ে যাও। তোমার হক। দশ কেজি গম, তাই দিও। পালানের মা যখন রাজি আমিও রাজি। সেই রাত থাকতে বের হয়ে গেছে গাড়ি ধরতে। বেলাবেলিতে ফিরে আসার কথা। কোনদিন আসে, কোনদিন আসে না। বড় তরাস লাগে। একা না হয়ে যাই বেচু! দূরে বসে সুতো নাড়ানাড়ি চলছে তোমার!

বেচু, তোর ত মাগ ছেলে আছে বাছা। রেগে গেলে তুই তুকারি করার স্বভাব। নাকি মাথাটাই গণ্ডগোল। বয়স হয়ে গেলে স্মৃতিভ্রংশ হয়। এ বয়েসে সে এতটা বুড়ো হয়ে গেল কেন! সংশয়, অভাব, অন্নচিন্তা, না গাছেরও গাছ থাকে, বীজেরও বীজ—আসলে পালানের কথা ভেবে মাথা খারাব হয়ে যাচ্ছে। সে এটা বোঝে। চোখ ড্যাপড্যাপ করে নাতিটার। বড় বড় চোখে নিশিদিন পৃথিবীটাকে দেখছে। সে আকাল বোঝে না। উরাট বোঝে না। খাওয়া ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করার আছে সে জানে না। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো মানুষটার কেন জানি মনে হয় গরু বাছুরের জীবনের মতো এক জীবন পালানের। পালানকেও না বেচু এক হাটে কিনে অন্য হাটে বিক্রি করতে যায়! বেচু না পারে হেন কাজ নেই। তা বেচু তুমি কেন চোখ দাও বাছা। অভাবের কথা বল, কোন সংসারে না আছে। কোন সংসার না জ্বলছে! পালানের মার সঙ্গে কথা বলার সময় এত অ্যাকটিন কেন বাছা! চাঁদের মেয়ের পালাগান আমার উঠোনে—ঘর ছাড়া করার তালে আছ! জন-মজুরের বেটা তুই, তোর এত বাড়!

বুড়ো মানুষটা বিড়বিড় করে বকে আর গাছ উপড়ায়। যত ক্রোধ এখন এই জমির খড়ে। —বেটারা সব মরে গেলি! কত কষ্ট করে তোদের রুয়েছি। তোরা জমিতে লেগে যাবি কত আশা! তার চোখে জল দেখা দেয়। সে তবু দু হাতে গাছগুলো ওপড়ায়। থামে না। কেবল পাগলের মতো যত পারছে তুলে ফেলছে। বেচুকে দেবার আগে যতটা পারে উপড়ে ফেলে দেবে। না হয় পুড়িয়ে দেবে। দশ কেজি গম! আমার

আবাদের দাম নেই। আমার খাটনির দাম নেই। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় গেল, জল নেই ঝড় নেই। শাবনে জল এল ঝড় এল। মাটি ভিজল। চপর চপর বৃষ্টির ফোঁটায় সেও ভিজল। ত্যানাকানি পরে দিনমান জমির কাদান রোয়া সব। হায় আশা কুহকিনী! পালানের মা তুই ঘরের বার হলি, ফিরবি ত!

সহসা কেমন সব কথা থমকে গেল তার। মাথার উপর দিয়ে একটা শকুন উড়ে গেল! পালানটা কোথায়! না আছে। জমির মধ্যে উবু হয়ে বসে আছে। কোন কীট-পতঙ্গ ধরার তালে আছে। এ-সময়টাতে শকুন আসারই কথা। প্রকৃতির খ্যাপামি টের পেয়ে গেছে। তা অখাদ্য কু-খাদ্য খেয়ে মড়ক লাগতেই পারে। সকালে গম ভাজাভুজি তবু পেটে যাচ্ছে। রাতে এক মুষ্টি অন্ন। এই করে বাঁচা। সামনের মাসগুলিতে কী হবে কে জানে বাপ! খকখক করে কাশল দু বার। দম নিল। টানছে, ওপড়াচ্ছে। দশ কেজি গমে সবটা আবাদ তোর গরু বাছুরে খাবে! খাওয়াচ্ছি। সুতা নাড়ানাড়ি তোমার সব বের করব। আমার পালান আছে না।—ও পালান, পালানরে!

—দাদু আমি এখানে। ডাকছ কেন!

—দূরে যাস না। রোষে পড়ে যাবি।

পালান জানে দাদু তার অহরহ কথা বলে। দাদুর কোন কথাই সে ঠিক বুঝতে পারে না। কেবল বলল, রোষ কী দাদু!

—দেখছিস না, শকুন উড়ছে!

—কোথায়!

বুড়ো মানুষটা মাথা তুলে দেখল শকুনটা নেই। কোথায় উড়ে চলে গেছে।

—কোথায় শকুন দাদু!

—উতো তোর আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

পালান বলল, যা মিছে কথা! সে আবার ফড়িংটার পেছনে মনোযোগ দিল। ধরতে পারছে না। উবু হয়ে বসে আছে। যেন টের না পায় কোন মনুষ্যের অপোগণ্ড বসে আছে একটা মরা গাছ হয়ে। গাছ ভেবে বসলেই খপ করে ধরে ফেলবে। তারপর ল্যাজে সুতোটা বেঁধে উড়িয়ে দেবে হাওয়ায়।

খাবলা মেরে ওপড়াচ্ছে আর সেই মতো বকবক করছে।--পুড়িয়ে দেব। তবু শালা বেচুর গরু বাছুরের পেটে যেতে দেব না। কপালে লেখা থাকে। না'লে লায়েক বেটারে কালে খাবে কেন! কপালে লেখা থাকে সব। গরু বাছুর গেছে, আবাদ গেছে। খড় সার। সেও খাবে বেচুর গরু বাছুরে। আর থাকল, পালান আর তার মা। মাকে নিয়ে সুতো নাড়ানাড়ি চলছে। কখন যায়! থাকল সে আর পালান। গাছ আর বীজ।

সে তেমনি পাগলের মতো গাছগুলি উপড়াচ্ছে। কেমন হুঁশ নেই মতো। মাঝে মাঝে, হাঁক শুধু, পালান, পালানরে।

শেষবারের হাঁকে পালানের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সে ফের ডাকল, পালান, পালানরে!

সাড়া দিচ্ছে না।

গাছের ফাঁকে মাথা তুলে দিতেই দেখল, আলে দুটো পাখি কী খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। পালান পাখি দুটোর খাওয়া দেখতে দেখতে ভারি নিবিষ্ট হয়ে গেছে। তার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। পালান তার ছোট্ট গণেশ ঠাকুর। ইজের কোলে নিয়ে বসে আছে। কোমরে একটা ফুটো তামার পয়সা। হাত পা রোগা, পেটটা সার পালানের। ঘাসের মধ্যে তার দু-খানি পা।

পালানের কী তার বাবার কথা মনে পড়েছে! বাবা মা। এক জোড়া পাখি। বাবা মা ছাড়া আর কী হবে! কী দেখছে এত মগ্ন হয়ে! কেমন নেশাতে পেয়েছে তাকে। গালে হাত। কিংবা কোন তুকতাক করে কেউ বসিয়ে দিয়ে গেছে পালানকে। বাহ্যজ্ঞান শূন্য।

সে ডাকল, এই পালান, কি দেখছিস?

কোন সাড়া নেই।

বুক ধড়াস করে ওঠে। কোন অশুভ প্রভাবে পড়ে যায়নি ত!

—পালান শুনতে পাস না।

পালান ওপরে চোখ তুলে তাকাল। সে তার দাদুকে দেখতে পেল না। দাদুটা কোথায়!

—ও দাদু, দাদু আমাকে ডাকছিস!

—আমি ডাকছি।

পালান ছুটে গেল। দেখল, দাদু খড়ের জঙ্গলের মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

—কী করছিস দাদু!

—হাত লাগা না ব্যাটা।

সে বুঝতে পারছে না কিছু। দাদু গাছগুলো উপড়ে ফেলছে কেন! বলছে কেন, হাত লাগা না ব্যাটা। খড়ের ডাঁই হয়ে আছে পাশটা। দাদু কথা বলার চেয়ে গাছগুলো উপড়ে ফেলা বেশি দরকারি কাজ মনে করছে।

—ও মা, সব তুই তুলে ফেলছিস। মা বকবে।

—হাত লাগা, হাত লাগা। মা মা করবি না।

—মাকে বলে দেব দেখিস।

হঠাৎ বুড়ো মানুষটা দাঁড়িয়ে গেল। চোখ লাল। কেমন ক্ষেপে গেছে। বলল, চউপ শালা। একদম মার কথা মুখে আনবি না। মুখে আনলেই গলা টিপে ধরব।

—আমি সালা! না তুই সালা! পালান বগলে ইজের নিয়ে তেড়ে গেল।

তারপর দাদুর হাঁটুর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা গোঁজ করে বলল, জান আমার মা আছে।

—তোর মা তবে সত্যি আছে! বুড়ো মানুষটা পাশে উবু হয়ে বসল।

—হ্যাঁ আছে ত!

—তোর মা যদি আর না ফেরে?

—ফিরবে না কেন! মা আমার ফিরবে না কেন দাদু?

বুড়ো মানুষটা দেখল, পালানের চোখ ছলছল করছে। জলে ভার হয়ে আসছে। সে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, না এমনি বললাম। আসবে না কেন। ঠিক আসবে। আকাল আসছে, উড়ে যাবে ভয়ে বলছি, না না আসবে। গাছেরও গাছ থাকে, বীজেরও বীজ। গাছ বড় হয়। ফুল ফোটে। ফল ধরে।

পালান দাদুর কথা কিছুই বোঝে না। দাদু যে কী সব অহরহ বলে! সে বোঝে না বলেই তাকিয়ে থাকে। এক হাতের বগলে ইজের, অন্য হাত কোমরে। যেন দাদুটা তার দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। সে এক হাতে দাদুর গলা জড়িয়ে বলল, ডর লাগে দাদু!

—ডর লাগে ক্যান রে?

—তুই আমার কী দেখিস।

—কী দেখব! দেখি তোর চোখ মুখ।

আসলে বুড়ো মানুষটার মনে হয় পালানের বাপও তার দিকে ভয় পেলে এমনিভাবে তাকিয়ে থাকত। মরে হেজে ছিল একজন, তাও শেষে চলে গেল। তার কপালে কিছু সয় না।

বুড়ো মানুষটা বলল, আয় কাঁধে নি। বলে হাত বাড়াল!

—দাদু ওরে রক্ত রে!

—কোথায়!

—তোর হাতে!

গাছ উপড়াতে গিয়ে টানাটানিতে রক্তপাত। তার কোন হুঁশ ছিল না তবে! সে চোখের সামনে হাত দুটো নিয়ে দেখল—জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। কেটে গেছে। কিছুই টের পায়নি! হাত ঠাণ্ডায় অবশ।

বুড়ো মানুষটা বলল, ও কিছু না।

হাত জ্বলছিল না। ঘাসে রক্ত মুছতে পারে—তবে লাগবে। ঘাসের খোঁচা লেগে ক্ষত আরও বড় হবে। হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা। সে পালানের দু-গালে হাত দুটো উষ্ণতার জন্য চেপে রাখল কিছুক্ষণ। অসাড় হাত দুটোতে বল সঞ্চার হচ্ছে। সে বলল, আয় এবার তোকে কাঁধে তুলে নিতে পারি কিনা দেখি।

পালান প্রথমে তার ইজেরটা দাদুকে দিল ধরতে। তারপর সে হাঁটুর উপর উঠে দাদুর কাঁধে ঠ্যাং গলিয়ে দিল। ওঠার মুখে বুড়ো মানুষটা বলল, ভাল করে ধরিস, বলে সে তার লাঠি ভর করে উঠে দাঁড়াল। বলল, আকাল আসছে জানিস?

আকাল কী পালান বোঝে না। মার মুখে শুনেছে, আকাল আসছে। দাদু বলছে, আকাল আসছে। আকাল কী রকম দেখতে—রাক্ষস না ডাইনি। ভূত পেত্নী যদি হয়! সে বলল, দাদু আকালে মানুষ খায়।

বুড়ো মানুষটি হেঁটে যাচ্ছে। কাঁধে তার পালান। নিচে তার দু-খণ্ড ভুঁই। সে বলল, হ্যাঁ খায়।

—গরু বাছুর খায়?

—হ্যাঁ খায়।

—বেচু শালাকে খায়?

—না, খায় না।

এ-কেমন কথা? আকালে মানুষ খায়, গরু বাছুর খায়, বেচু শালাকে খায় না। ভারি তাজ্জব হয়ে গেল পালান। বলল, বেচু মানুষ না দাদু?

—বেচু মানুষ না। অপদেবতা।

—অপদেবতা কি দাদু?

—অপদেবতা হল গে, অপদেবতা হ....... ল..... গে....—কিসের সঙ্গে তুলনা করবে বুড়ো মানুষটা ঠিক বুঝতে পারল না।

পালান দু-হাত এক করে বন্দুক ছুঁড়ছে মতো বলল, আমারে একটা বন্দুক দিবা।

—তা দেব নে। কিন্তু ভিতরে অস্বস্তি, নাতিকে ঠিক আকাল কী বুঝাতে পারছে না। আকাল হল অপদেবতা, এই পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু অপদেবতাটা কী! শেষে অনেক ভেবে বলল, মনে নেই মলিনের মারে অপদেবতা ভর করল! ছিটালে বসে থাকত। ওঁয়া ওঁয়া করত। ঘরে ঢুকতে চাইত না! তারপরই বলল, ভয় ধরছে না ত শুনে! ভয় থেকে তরাস। তরাসে পড়ে দু-মাসেই সে কেমন জবুথবু হয়ে গেল। তার দাবনা দুবলা হয়ে গেল। হাঁটতে গেলে হাঁটু ভেঙে আসে। মানুষজন দেখলেই এক কথা তার—কি জমি উরাট, না শ্যালো আছে? ডিপ টিউকল আছে কিনা—না আবাদ তার মতো শুখা মাঠে মারা গেল! কেবল শ্যালোর মালিকরাই চুটিয়ে আবাদ করেছে। বেচুই খবর দিয়ে গেছে সব। সে এবারে রাখি করবে। রাখি, হলগে রক্ষণ, যারে কয় সংরক্ষণ। কার্ড মিলে গেছে তার—দারোগাবাবু যারে দেখলে হাসে, তার আর কার্ড মিলতে কতক্ষণ!

আর তখনই পালান সহসা চিৎকার করে উঠল, দাদু ওরে ব্বাস—কী একটা উড়ে আসছে রে দাদু। দ্যাখ দ্যাখ।

কাঁধের উপর আছে পালান। সে জমিতে দাঁড়িয়ে। নাতিকে নিয়ে বের হয়েছিল—ঘরে থাকলেই খাব খাব করে। এই ঘুরে ফিরে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখা। জমিতে নেমে মাথা খারাপ হয়ে গেছিল। নাতিকে কাঁধে নিতেই কোথা থেকে শক্তি সঞ্চার হচ্ছে—আর তখনই কী না কী উড়ে আসছে! বিশাল অতিকায় কিছু ঘাড়ে পালান লাফাচ্ছে—ও দাদু ওটা কি উড়ে আসছে রে। ওরে বাব্বা—

ঘাড়ে পালান। হাতে লাঠি। সে ঠুকে ঠুকে হাঁটছিল। কিছু একটা তবে উড়ে আসছে। বাতাসে সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছিল। কোথায় কোনদিকে—পালান ঘাড়ে বলে উপরের দিকে তাকাতে পারছে না।—কৈ দেখছি না ত!

—ঐ দ্যাখ!

সে পালানকে ঘাড় থেকে নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। উত্তরের আকাশ থেকে আর একটা শকুন নেমে আসছে।

সে বিড়বিড় করে বকল, এই হলগে আকালের চেহারা। তেনারা নেমে আসছেন। এতক্ষণ সে কী যে হাবিজাবি কথা বলে পালানকে আকাল বুঝিয়েছে। গাছের মাথায় বসে থাকবে। ঘাড় কাত করে দেখবে কিংবা বাতাসে পাখা মেলে দেবে উচ্ছিষ্টের লোভে। প্রকৃতির যা কিছু উচ্ছিষ্ট ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাবে। তারপর আবার বাতাসে পাখা মেলে দেবে।

—ঐ দেখ আর একটা দাদু। কত্ত বড়!

—শকুন। শকুন দেখিস নি! ভয় পেয়ে গেলি। ধুস, ওঠ কাঁধে।

পালান কাঁধে উঠতে চাইল না। বুড়ো মানুষটার দু হাঁটু জড়িয়ে ভয়ে ভয়ে দেখতে থাকল। উত্তরের আকাশ থেকে উড়ে আসছে তারা। এদিকে ভেসে আসছে। পালান দেখছে। বুড়ো মানুষটাও দেখছে। অতিকায় ডানা মেলে ঠিক মাথার উপর ভেসে বেড়াতে থাকল। পালান ভয়ে বুড়ো মানুষটার দু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে দিল।

শকুনের ওড়াওড়ি দেখে তারও কেমন ভয় ধরে গেল।—তালে কি মরা গন্ধ উঠছে তার শরীর থেকে! সেও কি আর একটা খড়ের জমি! বেচুর গরু বাছুরে খাবে বলে মাথার উপর ভাসছে! সে দ্রুত পা ফেলতে থাকল। নালে মাথার উপর ওগুলো ওড়াউড়ি করছে কেন! সে পালানের হাত ধরে ছুটতে থাকল।—পালান আয়। শিগগির আয়। সব বেচুর কম্ম। ঠিক ছেড়ে দিয়েছে। আবাদ বলে কথা। আয় আয়। আমি না হয় খড়ের জমি—তুই। তোর ঝাড় হবে। তুই বাড়বি। বড় হবি। গাছেরও গাছ থাকে। বীজেরও বীজ । গাছ বড় হয়, ফুল ফোটে। আয়। তাড়াতাড়ি আয়। ফল ধরে—বীজ হয়। আয়। তাড়াতাড়ি করে কররে ব্যাটা। বীজ উড়ে না গেলে গাছ তারে ছাড়ে কী করে! সে পালানকে আড়াল করে পাগলের মতো আকালের কাছ থেকে ছুটে পালাতে থাকল।

যথাযথ মৃত্যু

কালটা শীতকাল ছিল এবং সম্ভবত বখের আলী শিরীষ গাছের ঘন অন্ধকারে পুরোনো জীর্ণ রিকশর হাতলে ভর করে স্টেশনের সিঁড়িতে যাত্রী দেখার ইচ্ছায় চোখ কচলাল। স্টেশন অতিক্রম করে রাত দুটোর ট্রেন চলে যাচ্ছে। বখের আলী দেখল, বাবুরা এখন যথাযথভাবে সিঁড়ি ধরে নামছেন। শীতের দুঃসহ ঠাণ্ডা এইসব বাবুদের চোখমুখ বিবর্ণ করছে। আলী এইসব দেখেও গাড়ি ছেড়ে অন্য অনেক প্যাডল্যারের মত সিঁড়ির মুখে ভিড় করল না। সে অত্যন্ত সুচতুর কায়দায় রুগ্ন শরীরকে টান টান করে রাখল এবং রুগ্ন চোখ দুটোকে ভয়ানক সতেজ করতে গিয়ে সামনে গাঢ় অন্ধকার দেখল। সে দেখল, অন্য অনেক প্যাডলার রিকশ ভর্তি লোক নিয়ে ওর মুখের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। সে তবু সিঁড়ির মুখে আলোর নীচে গিয়ে দাঁড়াল না। অথবা রিকশ টেনে যাত্রীদের সামনে গিয়ে হাজির হল না। বস্তুত বখের আলীর দীর্ঘ জীবন, হাঁপির টান এবং মৃত সাদা চোখ-দুটো যাত্রীদের সন্দিগ্ধ করে তুলবে—সে এমন জানত। সে তাড়াতাড়ি শীর্ণ হাত দুটোকে যথাসম্ভব ছেঁড়া আস্তিনে ঢেকে অন্ধকার থেকেই বড় রুক্ষ অথচ বিনীত ঈর্ষায় ডাকল, আসেন হুজুর আসেন। এ বান্দা হাজির।

বখের আলী যথেষ্ট চেষ্টা সত্বেও কাশির আবেগটুকু সামলাতে পারল না। সে একজন ভদ্র যুবার মুখের উপরই কেশে দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখল, তরতর করে সব যাত্রীরা নেমে যাচ্ছে। ওরা অন্যত্র সরে দাঁড়াল। রিকশ ডাকল। তারপর একে একে স্টেশন খালি করে চলে যেতে থাকল। আলী ভাবল, এখানে দাঁড়িয়ে লাভ নেই। ওকে দেখলে যাত্রীরা বরং পীড়িত বোধ করবে। এইসব ভেবে সে অন্ধকারে নীচে নেমে দাঁড়িয়ে থাকল। সকল যাত্রীদের দামদস্তুর করতে দেখে অথবা চলে যেতে দেখেও অন্য কোন কথা বলতে পারল না। সে ফের বলল না, এ বান্দা হাজির। নসিবে থাকলে জুটবে—এমত ভাব নিয়ে সে অন্ধকারে মৃত চোখ দুটোকে উজ্জ্বল করে অপেক্ষা করতে থাকল।

রাত দুটোর ট্রেন চলে যাচ্ছে। পিছনের লাল আলোটা ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশে গেল। অনেকক্ষণ লাল আলোটা এক-চক্ষু ভূত সেজে আলীর চোখের উপর নৃত্য করছিল। ভূতের নৃত্য দেখে সে শীতের তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালাটুকু ভুলে থাকতে চাইল। তবু সে প্রচণ্ড শীতে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। ছেঁড়া গামছা দিয়ে কান দুটো ঢেকে নিয়েও শীতের তীক্ষ্ণতা ভুলতে পারল না। ওর শীর্ণ হাতে তখন শিশির ঝরল। সে শীতে জমে যাচ্ছে। সোয়ারী পেলে, রিকশ টানলে শরীরের এ-ভাব থাকবে না। শরীর গরম হলে রক্ত গরম হবে এবং সে এ শীতেও তখন ঘামবে। অথচ সোয়ারীর দেখা নেই—দূরে গির্জার ঘণ্টা বাজছে। কবরখানার ঝোপে জোনাকি জ্বলছে। শিরীষ গাছে কাঠবেড়াল দুটো পর্যন্ত শীতে কটকট করল। ঠিক এই সময়েই একজন সোয়ারীকে নিঃসঙ্গ স্টেশনে রিকশ খুঁজতে দেখে সে প্রাণপণে ডেকে উঠল, আসেন হুজুর, আসেন। এ বান্দা হাজির। একথা বলার পরও আলী অন্ধকার থেকে নড়ল না। ওর শরীর এবং চোখের রঙ দেখে যদি লোকটা স্টেশনেই থেকে যাওয়ার মতলব করে, যদি বিস্মিত হয় এবং ভয় পায়! সে যথাসম্ভব ভয়ানক হাঁপের টানকে দমন করল। শেষে বলিষ্ঠ যুবার মত ডাকল, আসেন হুজুর লিয়ে যাই। অন্য কিছু বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভয়ানক কাশির যন্ত্রণা বুক ঠেলে উঠে আসছে। সে অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য বার দুই বেল বাজাল। রিকশ টেনে উপরে তোলার উদ্দেশ্যে বার দুই হাত পা শক্ত করল।

এই প্রচণ্ড শীতে আলীর, হাত-পা ঠকঠক করছে। সে কোন রকমে রিকশ টেনে উপরে তুলে বলল, চলেন হুজুর লিয়ে যাই।

মহাজন ব্যক্তিটি বৃদ্ধ। চোখ দুটো ছোট ছোট এবং কোটরাগত। যেন দীর্ঘদিনের চুরির অভ্যাস বৃদ্ধের সমস্ত অবয়বে। দামী শাল জড়ানো শরীরে। পা খোঁড়া, হাতে লাঠি! মহাজন মানুষটিকে আলী চেনে যেন। এ শীতেও মহাজন মানুষটি বার দুই লাঠি হাতের উপর ঘোরালেন। এবং আয়েস সহকারে গাড়িতে বসে বললেন, কত দেব বল?

যদিও আলী দেখেছে, বৃদ্ধবাবুটি সেই প্রথম থেকে দর কষাকষি করে বিপর্যস্ত, যদিও বাবুটির নয়া পয়সার হিসাব প্রখর, তবু বখের আলী কথাবার্তায় যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় দিল। বলল, হুজুর, আপনার সঙ্গে দর করা ভাল দেখায় না। কিন্তু মহাজন ব্যক্তিটি পীড়াপীড়ি করলেন বলে সে বলল, এক টাকা দেবেন। আলী যথার্থ ভাড়ার কথা বলে রিকশর সিটে চেপে বসল।

—কতদিন থেকে লোকের গলা কাটছ?

বখের আলী থামল না।—তবে বার আনা দিন।

কথা আমি একটাই বলি। আট আনা দেব।

শীত এবং রাতের এই কষ্টটুকুর কথা স্মরণ করে আলীর কথা বলার ইচ্ছা হল না। যেন বলার ইচ্ছা হুজুর, যথার্থ দাম থেকে চার আনা কম চেয়েছি, আপনি চার আনা আরও কমিয়ে দিলেন, হুজুর, নসিব মন্দ। তাও সে বলল না। শুধু কাশতে থাকল।

তিনি মুখ র‍্যাপার দিয়ে ঢেকে বললেন, তোমার ভয়ানক কাশি বাপু।

আলী এবারেও কোন জবাব দিল না। আলী চলেছে। সে তার ভাঙা রিকশ নিয়ে, রুগ্ন সোয়ারী নিয়ে চলে যাচ্ছে। দোকানীর ঝাঁপ বন্ধ হল। স্টেশনের শেষ যাত্রীটি চলে যাচ্ছে। রিকশর ক্যাচক্যাচ শব্দ, আলীর কাশি এবং ভাঙা হুডের ছেঁড়া কাপড়ের পতপত শব্দে দোকানী ঝাঁপ ফেলে দিল। বৃদ্ধ মহাজন ব্যক্তিটি গলাবন্ধ কোটের উপর কান, গলা, মাথা ঢেকে বসলেন র‍্যাপার দিয়ে। রাত, অন্ধকার এবং এই নির্জনতা ভাল লাগছে না বলেই যেন একটু কথাবার্তা চালু করলেন। কি নাম তোমার?

শীত বলেই সম্ভবত পথ এত নির্জন। এত নিঃসঙ্গ। ব্যাঙ ডাকছে না। অথবা রাতের বিচিত্র প্রাণীরা। আলীর কাশির শব্দ, রিকশর ক্যাচক্যাচ আওয়াজ এবং বৃদ্ধের কোটরাগত চোখ, আলীর শরীরের রঙ, মুখের রঙ ভয়ানক সব দৃশ্যের অবতারণা করছে। বৃদ্ধ হুডটা তুলে দিলেন এবং এ সময়েই দেখলেন রিকশটা প্রচণ্ড রকমের ঝাঁকুনি খেল। আলী রিকশ থেকে নামছে। আলী কথা বলছে না। সে রিকশর পিছনে গিয়ে নুয়ে পড়ল। সে চেনটা তুলে দিয়ে বলল, হুজুর, আমার নাম বখের আলী।

---চালাতে না চালাতেই হুড পড়ে গেল! চেন পড়ে গেল!

বখের আলী বলল, কিছু ভয় পাবেন না হুজুর। ঠিক পৌঁছে দেব।

বৃদ্ধ বাবুটি গাড়ির স্বল্প আলোতে বখের আলীর চোখ দেখেন। চোখ দুটো ভয়ানক দুঃসহ, বেড়ালের চোখের মত উজ্জ্বল অথচ সহসা চোখ দুটো দেখলে মনে হবে মৃত এবং সাদা এবং নিজের চোখ দুটোর চেয়েও ভয়ানক বীভৎস। তিনি আঁতকে উঠছেন, তিনি বলেছেন, আলী, তুমি ত গাড়োয়ানের মত রিকশ চালাচ্ছ। একটু জলদি না করলে যে চলবে না।

দুধারে কিছু শিরীষ গাছ এবং দেবদারু গাছ। দূরে কলোনীর ইতস্তত আলো। এখনও শহর দূরে। সদর জেলের আলো মাঠ অতিক্রম করে, যুবতী মেয়েদের হোস্টেল অতিক্রম করে অস্পষ্ট। কাপড়ের মিলের শব্দ, কুকুরের শব্দ—দূরে গাড়ির সিটির শব্দ। আলীর শরীর কাঁপছে। আলী রাতের যাত্রী পার করছে। দিনে শরীরে যন্ত্রণা নিয়ে, ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে বস্তির একপাশে, ছোট্ট চালাঘরটায়—নর্দমার পাশে আলী ছেঁড়া কাঁথার নীচে কাতরায়। ক্ষুতপিপাসায় ডুবে আলী দিনের যাত্রী পেল না। ওর কোটরাগত চোখ, ভয়ানক বুকের ব্যামো দেখে, ভাঙা পুরোনো রিকশ দেখে সোয়ারীরা হাঁটতে থাকল শুধু।

বৃদ্ধবাবুটি বললেন, গাড়ি চালাচ্ছ, না মোট বইছ?

আলী তার শেষ সামর্থ্যটুকু দিয়ে গাড়ি টানতে থাকল। তার মনে হয়—সে রুগ্ন ঘোড়ার মত ছুটছে। সে কথা বলল না। অথবা যন্ত্রণায় চিঁহি-চিঁহি করার বাসনাতে সে হাঁ করল না। কয়েকটা দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করার বাসনাতে মুখটা বড় করতে গিয়ে দেখল, বাবুটির গোয়ার্তুমি কমছে না। সে অন্যদিনের মত রিকশার গতি কমিয়ে দিল এবং সোয়ারীকে অন্যমনস্ক করার জন্য সে তার কিস্যা আরম্ভ করল। দুনিয়া বহুত পালটে গেল হুজুর।

—এখন ত তোমাদেরই রাজত্ব গো। দুনিয়া পালটে গিয়ে তোমাদেরই সুখ। তোমরা যখন-তখন লোকের গলা কাটছ। বৃদ্ধ বাবুটির মনে অন্য দুর্মুখ রিকশওয়ালার মুখের ছবি। বিশেষত দুর্মুখ কথাবার্তা স্পষ্ট উঁকি দিতেই দুঃসহ অপমান বোধে জ্বলতে থাকলেন তিনি।

—জনগণের রাজত্ব। তোমাদের কি এখন কিছু বলবার জো আছে!

আলী ঘটনাটা দেখেছিল বলেই এখন আর কিস্যার কথাগুলো আবৃত্তি করল না। সে বলল, হুজুর, টগবগ করে রক্ত ফুটছে ত ফুটছেই। কাকে কি বলতে হয় ও শালা কি করে জানবে। তা ছোটলোকের কথা মনে রাখবেন না, হুজুর।

এখন প্রায় গাড়ি চলছে না বললেই হয়। আলী এইসব বলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের আয়োজন করল যেন।

—তুমিও যেমন! ছোটলোকের কথা মনে রাখার আমার দায় পড়েছে।

—হুজুরকে টাকার গরম দেখাস!

—ওসব কথা থাক বাছা।

—আপনার মত নসীব ক'জনের হয়।

—ওসব কথাও থাক বাছা। টাকার গরম দেখালে টাকা থাকে না। মা লক্ষ্মী রাগ করেন। যেন বলার ইচ্ছা বাবুটির আমি ত বড় হয়েছি ছোট থেকেই। কাঁধে কাপড় নিয়ে ঘরে ঘরে বিক্রি করেছি, হকারি করেছি, তা বলে ত লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিনি।

আলী রিকশ থেকে ফের নামল। চেনটা আবার পড়ে গেছে। বৃদ্ধ বাবুটি বিরক্ত হবার মুখে হিসাব করলেন —বাড়ি ভাড়া সুদের টাকা এবং সেলস ট্যাক্সের বড়বাবুকে তিনশ....। আয়কর ফাঁকির জন্য বিদ্যালয়ে বিশ হাজার....পরম দানশীল ব্যক্তি অথবা হাল আমলের শহীদ হওয়ার জন্য জেলা সমাহর্তাকে সভাপতি করে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা এবং এবারের জন্যও কিছু কিছু হোলসেল ডিলারসিপ। তিনি এ সময় মুখের রেখাতে আত্মপ্রসাদের ভঙ্গী টানলেন। তারপর বগলের নীচে টিপে টিপে কি যেন দেখলেন। কি যেন লক্ষ টাকার জিনিস বগলের নীচে লুকিয়ে রেখেছেন। অন্ধকার পথটুকু এইজন্য বাবুটির কাছে এখন ভাল লাগছে। বখের আলীর রিকশ চলছিল কি থেমেছিল বোঝা যাচ্ছিল না। দুদিকের মাঠ থেকে শীতের ঠাণ্ডা শুধু বরফের কুচির মত ওদের দুজনকে স্পর্শ করছে।

—বুঝলে বখের আলী, সময় আর নসিবকে ফাঁকি দিলে তারাও তোমাকে ফাঁকি দেবে। তিনি উপদেশের ভঙ্গীতে কথাগুলো বললেন, বুঝলে বখের আলী, সময় আর নসিব, কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। তোমার রিকশটা এমন উঠছে পড়ছে হে কেন বাছা! ঠিকমত চালাতে না পারলে নিলে কেন?

—হুজুর পথটাই খারাপ। তারপরও যেন ওর বলার ইচ্ছা, দেশে সকলে চুরি করতে আরম্ভ করেছে হুজুর। বাবু মানুষেরা বেশী চুরি করছে। এতগুলো কথা বললে সে অনেকক্ষণ বড় বড় শ্বাস নেবে। সে শুধু বলল, সকলে চুরি করছে হুজুর। দু সালে পথটা ভেঙে গেল।

বাবুটিরও যেন বলার ইচ্ছা, যে চুরি করছে সেও সুখী, যার চুরি করছে সেও সুখী। এক হাতে নিচ্ছে, অন্য হাতে দিচ্ছে। কোন হিসাব নেই। লাগে টাকা দেবে ....। এখন আর গৌরীসেনদের টাকা দিতে হচ্ছে না। গৌরীসেনরা শুধু সেলস ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে মরছে। এতগুলো কথা তিনি ইচ্ছে করেই আলীর সঙ্গে বলেননি। ছোটলোকদের সঙ্গে বেশী দহরম ভাল নয় এমন একটি ভাব নিয়ে বসে থাকলেন। এবং সহসা যেন দেখলেন, গাড়িটা একেবারেই চলছে না। তিনি নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, চালাও চালাও। বড় আস্তে

চালাচ্ছ। তুমি দেখছি আমাকে পৌঁছতে ভোর করবে। এবং এ সময়ে রিকশর চেনটা পড়ে গেল। আলী বুঝল,বাবুর বিরক্তি ভয়ানক রকমের। সে তার কিস্যা আরম্ভ করল, জাফর আলী বখের আলী তফাত কত হুজুর! সব নামটা ত আপনাকে বলিনি! বললে এ গাড়িতেই চড়তে সাহস পেতেন না। মীর্জা জাফর আলীর নাম শুনেছেন! বইয়ে ওঁর নাম লেখা আছে। সে ভক্তিতে গদগদ হল।

বাবুটি উদাসীন। যেন এমন নাম তিনি এই প্রথম শুনলেন। বললেন, অঃ। মীর্জা জাফর আলী।

—হাঁ হুজুর সহজ কথা ভেবে লিবেন না। নাম আমার মীর্জা বখের আলী। কিন্তু কি করি বলেন। সরকারী নজরানা আমাদের বাড়ছে না। নানাজী পেত একশ এক রূপেয়া। তার দশ ছেলে দশ টাকা। বাপজীর দশ। ফের বাপজীর পাঁচ। তবে বুঝতে পারছেন, এ হারামের নসিবে দুই। বখের আলী এতগুলো কথা বলে হাঁপাতে থাকল।

—বছরে দুই।

—জী হুজুর। সেদিন তকমা এঁটে, লবাবী টুপি পরে শেরওয়ানী গায়ে ঝুলিয়ে, মুখসীপাতি জর্দা মুখে হাসতে হাসতে এস ডি ও অফিসে চলে যাই। সেদিন বাবুরা দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাবে। আমি একটু হাসব বাবু।

—শুধু গল্পই করবে! রিকশ চালাবে না!

আলী নক্ষত্র দেখল এবং আকাশ দেখল। দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশতই সে যেন এখনও রিকশ টানতে পারছে। এখনও বেঁচে আছে। বাবুকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবার কর্তব্যবোধে ফের শক্তিসঞ্চয় করতে পারছে। সে বলল, দেখেন একটানে এবার লিয়ে যাচ্ছি। বলে সে হ্যাণ্ডেলের উপর নুয়ে পড়ল।

গির্জা অতিক্রম করে ইতস্তত করবী গাছের ছায়ায়, অর্জুন গাছের নীচে অথবা ভাঙা পথটার উপর আলীর কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ছাতিম গাছ দুটো অতিক্রম করার সময় ওর মনে হল সেই যুবক যুবতীকে। গতকাল এই ছাতিমের ডালে ওরা ঝুলেছিল। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আলীর রিকশ আলো ফের ভূতুড়ে হয়ে গেছে। আলী এখানে একটু থামল। প্রতিদিনের মত সে চোখ তুলে দূরের মাঠ দেখল, অন্ধকার মাঠ অতিক্রম করে সাহেবদের কবরখানা দেখল। কবরের ঝোপে ঝোপে তেমনি সব জোনাকি পোকারা জ্বলছে। উড়ছে অথবা হেস্টিংসের প্রিয়তম কন্যার অবয়ব ধরে দূরের মাঠে পাশাপাশি খালের ধারে উড়ে উড়ে শীতের মাঠকে প্রত্যক্ষ করছে। এবং হাওয়া খাওয়ার নাম করে আলীর নিত্য পথ পরিক্রমা দেখছে। অথচ আলীর ফুসফুস হাওয়া টানতে পারছে না, সাদা মৃত চোখ দুটো শীতে নীল নীল হয়ে উঠছে। দূরের মাঠে ঝাউগাছ, শহরের আলো, পাশাপাশি কোথাও সান্ত্রীর বুটের শব্দ আলীকে অন্যদিনের মত শক্ত সতেজ করতে পারল না। তথাপি অন্যদিনের মত সেইসব শব্দের মধ্যে ডুবে যেতে পারল বলে খুশী হল। পলাশীর প্রান্তর থেকে জাফর আলী পালাচ্ছে। ঘোড়সোয়ার সৈন্যেরা পালাচ্ছে। হেস্টিংসের প্রিয়তমা কন্যা জোনাকির অবয়বে জ্বলছে নিবছে। ঘোড়সোয়ার সৈন্যগণ বর্শা অথবা কিরিচ নিক্ষেপ করে শীতের মাঠকে শিহরিত করে তুলল। সে এইসব দেখল। আলী প্রতিদিনের মত এখানে এসে সহসা গাড়ি থামিয়ে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে থাকল।

বৃদ্ধ বাবুটি বললেন, এসব, হচ্ছে কি!

আলী বলল, জিনিসপত্রের দাম চড়ছে অথচ সরকার কিছু দেখছে না হুজুর। রিকশর আলোটা নিবে গিয়েছিল বলে সে নেবে পড়ল এবং ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে বাবুটিকে যেন ভুলিয়ে রাখতে চাইল।

ইচ্ছা করেই আলী আলো জ্বালাতে দেরি করছে।

এই অন্ধকারে তিনি নিঃসঙ্গ। এবং এই প্রেতাত্মার মত লোকটির উপস্থিতি ও উপরে ছাতিম গাছের ডালে ডালে পাতার আওয়াজ, নির্জন প্রান্তরে কবরের আলো বৃদ্ধ বাবুটিকে বার কয়েক প্রচণ্ড রকমের নাড়া দিল। আলী কি জানতে পেরেছে সব! সে কি নতুন ব্যবসাটার কথাও জানতে পেরেছে। বাবুটির কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকল। তিনি বগলের নীচে অন্ধকারে টিপে টিপে দেখলেন। তারপর তিনি ফের ধমক লাগালেন, বখের আলী, আলো জ্বালতে কত সময় নেবে! এমন করলে আমি কিন্তু পুলিস ডাকব।

—হুজুর বড় ভয় পেয়ে লিচ্ছেন। দূরে সিপাই-এর বুটের শব্দ আসছে না। এখানে চোর-বাটপাড়ের ভয় নেই হুজুর। বখের আলী এই বলে দাঁড়িয়ে থাকল।—হুজুর এই ছাতিম গাছে গতকাল দুজন মাগী-মরদ ঝুলেছে! (আলী মরার ইচ্ছায় কতবার কত ছাতিমের ডালে বিশমিল্লা বলে ঝুলে পড়বার জন্য প্রাণপাত করেছে... অথচ—অথচ...) মেয়েটার শরীরে কত গহনা ছিল। পথে এতলোক যে আমরা এই পথে গাড়িই চালাতে পারিনি। কিছুই হয়নি বলে হুজুর ভুখা আছি। গতর দিচ্ছে না হুজুর। তবে ভয়ে পাবেন না, ঠিক পৌঁছে দেব।

—কি বলছ! আমি ভয় পাব! তুমি এমন কথা ফের বলবে না। তবে যথার্থই তোমাকে পুলিসে দেব। আজকাল এটা হল কি! সবাই ফোঁস করতে শিখেছে। কি কাণ্ড সব! কেবল পুলিসগুলোই দিন দিন ভদ্র হয়ে উঠছে। পাঁচেও খুশী, পাঁচ হাজারেও খুশী।

আলী আলো জ্বেলে সিটে চেপে বসল। ওর পা দুটো ভেঙে আসছে। হাত দুটোর ভিতরে কোন উত্তাপ নেই যেন। রক্ত সমস্ত শরীরে কোন উত্তাপ সঞ্চার করতে পারবে না। ভাঙা আরশিতে মুখ ও শরীর দেখে ভাবত, এমন একটা শরীর দীর্ঘদিন বাঁচে কি করে! দীর্ঘদিন বাঁচার পথকে অতিক্রম করছে কি করে। অথচ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার অভ্যাস ওকে কোনদিনের জন্য মরতে দিল না। অথবা এমন কোন ঘটনাই ঘটল না। সেজন্য শরীর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, রক্ত উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারছে না জেনেও নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলী কোন সন্দেহ লালন করতে পারল না। শুধু বুক স্পর্শ করে অসহায় ভঙ্গীতে ফের সে নক্ষত্র দেখল এবং আকাশ দেখল।

আলী রিকশ টেনে যাচ্ছে। ওরা পরস্পর এখন কথা বলছে না। আলী কথা বলতে পারছে না। গলাটা শুকনো কাঠ। ওর জলতেষ্টা পাচ্ছে। চোখ দুটো চিংড়ি মাছের মত গোল গোল, চিংড়ি মাছের মত বের হয়ে চোখের পাশে যেন ঝুলে পড়বে। হ্যাণ্ডেলের উপর হাতের আঙুলগুলো শীর্ণ—সে টানতে পারছে না। পারছে না। এখন বাবুটি জোরে চালাবার জন্য বারবার তাগাদা দিচ্ছে, পাশাপাশি কোথাও গাছের পোকা ফরফর করে উঠল এবং সে দেখল টায়ারটা অদ্ভুত রকমের জীর্ণ শব্দ করে ফেঁসে গেছে। কপালে করাঘাত করার ইচ্ছায় ডান হাত তুলে পরীক্ষা করতে বুঝল---বৃথা। হাতটা তুলে এনে কপালে করাঘাত করার শেষ সামর্থ্যটুকুও যেন শেষ। সে নীচে কোন রকমে গড়িয়ে নামল।

বৃদ্ধবাবুটি চিৎকার করে উঠলেন, তোমাকে আমি শূলে চড়াব।

—হু-জু-র!

—আমি নামতে পারব না বাপু। হেঁটে যেতে পারব না।

—হু-জু-র হাঁটতে হবে না। ঠিক পৌঁছে দেব। দম ফেলবার ফুরসত চাই হুজুর।

—তুমি এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে বখের আলী?

—হুজুর, হেঁটে যেতে কষ্ট হবে। পায়ে ঘা। আমি পৌঁছে দিচ্ছি হুজুর।

—এমন করলে আমি তোমাকে এক পয়সাও ছোঁয়াব না।

বাবুকে অন্যমনস্ক করার জন্য সে পুনরাবৃত্তি করল, একটা কিস্যা শোনবেন?

ভিতরে ভিতরে বাবুটি এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে পারলে তিনি আলীর গলা টিপে ধরেন। পারলে তিনি আলীকে খুন করেন। আলী মশকরা করছে। আলী ফের কাশতে থাকল। রাতের শেষ ট্রেনের শব্দ আরা শোনা যাচ্ছে না। শুধু কাপড়ের মিল থেকে এখনও শব্দটা ভেসে আসছে। এ তল্লাটে কোন কুকুর পর্যন্ত নেই। কোন পাখি অথবা কাঠবিড়ালীর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। অন্ধকারে কিছু দেখাও যাচ্ছে না! বখের আলীর বুকের শব্দ এবং গলার ঘরঘর শব্দ বৃদ্ধ বাবুটিকে অবসন্ন করছে। অশেষ যন্ত্রণার মত রুগ্ন কণ্ঠে বললেন, আলী, তোমাকে আমি এক টাকাই দেব। তুমি নিয়ে চল। লোকের আমি কত উপকার করেছি, তুমি আমার এ উপকারটুকু কর।

আলী হ্যাণ্ডেলের উপর মাথা রেখে বলল, একটু সবুর করেন হুজুর। ততক্ষণে কিস্যাটা বলি, আমার হাঁপের টানটা কমুক। আলী গল্প আরম্ভ করল। ওর এটাও একটা অভ্যাস। সোয়ারী নিয়ে যখন সে টানতে পারেনি, যখন সে অবসন্ন হয়ে পড়েছে তখন এই মসনদের গল্প বলেছে। সে কত সোয়ারীকে এই মসনদের গল্প শোনাল। সে নিজের মসনদে চেপে সোয়ারীকে গল্প শোনাল কতবার। কতবার বলল, হুজুর, এ মসনদের আখের খারাপ। মুর্শিদকুলী খাঁ বলেন, আলিবর্দি বলেন, সিরাজ বলেন কেউ ত থাকল না হুজুর। ব্যাভারটাই থাকে। হে হে করে এ সময়ে বখের আলী কাশল কি হাসল তিনি ধরতে না পারায় হাতের টর্চ জ্বেলে মুখ দেখেই আঁতকে উঠলেন—আলীর মুখে রক্ত, চোখ দুটো সাদা এবং মৃত মানুষের মত মুখ করে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

---এই! এই! বৃদ্ধ বাবুটি চিৎকার করে উঠলেন।

---হুজুর, এমন করলে কিন্তু রিকশ ফেলে চলে যাব।

রাস্তার দুপাশে কিছু বাঁশের বন। তারপর শহরের প্রথম আলো। শহরের প্রথম ল্যাম্পপোস্ট। বাঁশবনে বাদুড় নেই। অন্ধকারের মত, বাদুড়েরাও যেন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। শীতকাল বলেই হোক অথবা রাতের গভীরতার জন্যেই হোক দূরের ল্যাম্পপোস্টের আলোর উত্তাপ ওদের টেনে নিতে সক্ষম হবে না। বৃদ্ধ বাবুটি বললেন, যাক, তবু শহরে উঠে যেতে পারছি।

আলী কোন জবাব দিল না। বৃদ্ধ বাবুটির ইচ্ছা হল লাঠি দিয়ে একবার আলীকে খোঁচা দিতে। লোকটা রিকশ টেনে নিয়ে যাচ্ছে ত, না, যাবার ভান করে শুধু হেলে শরীরকে টান করে রিকশ টানার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। না, লোকটা বাজ-পড়া মৃতের মত দাঁড়িয়ে অন্ধকারকে তামাশা দেখাচ্ছে। তিনি লাঠিটা কাছে নিয়েও খোঁচা দিতে সাহস করলেন না। আলী যদি সেই চোখ নিয়ে ফের তাকায়, যদি বলে, থাকল সব—আমি চললাম হুজুর...সুতরাং সুতরাং...। তিনি প্রিয়-জনের মত কণ্ঠ করে বললেন, এ ঠাণ্ডায় এমন ছেঁড়া কোট গায়ে দিয়ে স্টেশনে আসা উচিত হয়নি। বুঝলে বখের আলী, বখের আলী, তুমি কথা বলছ না কেন? তুমি গল্প করছ না কেন বখের আলী!...আলী!...আলী!

সহসা আলী ধনুষ্টঙ্কারের রুগীর মত বেঁকে গেল এবং সহসাই বাবুটির মুখের উপর উপুড় হয়ে বলল, সে সব নবাবী আমলের কিস্যা আপনার কি ভাল লাগবে হুজুর!

বৃদ্ধ বাবুটি যখন দেখল, আলী বাজপড়া মৃত মানুষ অথবা বখের আলী সত্যি রিকশ টানার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ছিল না এবং বস্তুত বখের আলী যখন জীবিতই আছে তখন গল্প না শুনে যতটা সম্ভব শীঘ্র নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো দরকার। তিনি বলেন, অত প্রাচীন গল্প কি হাল আমলে ভাল লাগবে?

—সে ভাল না লাগারই কথা। কিন্তু হুজুর, ঘুলঘুলি দিয়ে নবাব যা দেখলেন, আমরা কটা লোক তা দেখতে পেলাম।

—কি দেখলেন! কি দেখলেন। তখন সোনা পাচার হত! বৃদ্ধ বাবুটি ইচ্ছাকৃত অন্যমনস্কতায় বললেন, যাক, আমরা ল্যাম্পপোস্টের আলোতে এসে পৌঁছে গেলাম।

—আমি বলেছি হুজুর আপনার কোনও ভয় নেই। ঠিক পৌঁছে দেব। নবাব ঘুলঘুলি দিয়ে দেখলেন; লোকটা রোজ গঙ্গায় মাছ ধরতে আসে।

বৃদ্ধ বাবুটি ফোড়ন কাটলেন, নবাবের বুঝি কোন কাজ ছিল না?

—ছিল হুজুর। কাজও করত, ঘুলিঘুলি দিয়ে মাছ ধরাও দেখত।

কথা বলতে যত কষ্টই হোক তখন যেন শরীরের কষ্ট থাকে না আলীর। আলী তার শেষ সামর্থ্যটুকু দিয়ে হেঁটে হেঁটে রিকশ টেনে চলেছে। একটি ল্যাম্পপোস্ট, দুটি ল্যাম্পপোস্ট সে পার হল। সে একবার সার্কাস পার্টিতে সিংহ দেখেছিল। আলোগুলো অন্ধকারে সিংহের চোখের মত জ্বলছে। সে বলল, হুজুর, আপনি সিংহের ডাক শুনেছেন?

—আলী, তুমি ভয়ানক কথা বলতে পার।

—এ শীতে একটা বিড়ি খেতে পারলে বড় ভাল হত হুজুর।

বৃদ্ধ বাবুটি পকেট থেকে আল্লা করে বিড়ি এবং দেশলাই দিলেন। আলী বিড়ি ধরাল। হ্যাণ্ডেলের উপর ভর করে বিড়িটা পরম নির্ভরতার সঙ্গে টেনে সদর জেলের পাঁচিল দেখল। পাঁচিলটার ভিতরের দিনগুলো ওর সবচেয়ে সুখের ছিল এমন ভাবল। শেষে বড়বাড়ির বাগানের কেয়া ফুলের গন্ধ নেওয়ার সময় দেখল বড় বাড়ির একটি জানালা খুলে গেছে। জানালায় যুবতীর মুখ। জানালার আলো নীচে গড়িয়ে নামছে। সেই আলো ধরে একজন যুবক তরতর করে উপরে উঠে কার্নিশ ধরে ঘরে ঢুকে গেল।

বিড়িটা খাওয়াতে আলীর মনে হল সে আরও একশ বছর বাঁচবে। সে বলল, হুজুর এবার আপনাকে ইস্কুলে নামিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব।

বাস্তবিক পক্ষে আলী কোথাও থামেনি। একটি বিড়ি শীতের ঠাণ্ডায় যথার্থই তাকে একশ বছরের পরমায়ু দিয়েছিল। সারাদিন পর এই বিড়ির ধোঁয়া ওর সমস্ত রক্তে ফের বেঁচে থাকার প্রাণপণ ইচ্ছার ধুনুচি জ্বালিয়ে ওকে পাগলা ঘোড়ার মত কদম দিতে সাহায্য করছে। সে হাঁটছে, হাঁটছে। বৃদ্ধ বাবুটি শরীর ঢেকে বসে আছেন। শহরের আলো, ইতস্তত অন্ধকার পার্ক-ময়দান পার হয়ে তিনি চলছেন। চলছেন। আকাশের হাজার নক্ষত্রের আলোতেও তিনি লক্ষ টাকার হিসাবের ভিতর এক পয়সার গরমিলের দুঃখ ভুলতে পারলেন না।

বখের আলী তখন তার কিস্যা শেষ করল।

[আলীর □□□□□□ খুবই অস্পষ্ট। আলীর মুখে রক্তের কস। সে কাশতে কাশতেও শেষ পর্যন্ত গল্পটা করছিল। বৃদ্ধ বাবুটি শুনছিলেন। শোনার স্পৃহা না থাকলেও যেন শুনছিলেন। আলীর অস্পষ্ট কথার ভিতর থেকে তিনি অর্থ উদ্ধার করেছিলেন : লোকটা রোজ মাছ ধরতে আসত, অথচ কোনদিন বঁড়শিতে খোট দেবার প্রয়োজন মনে করত না। ঘুলঘুলি দিয়ে নবাব রোজ দেখেন আর ভাবেন। একদিন অবশেষে নবাব পাত্রমিত্রসহ নদীর পারে এসে দাঁড়ালেন। সেদিনই সে প্রথম খোট দিয়েছিল এবং নবাবের পাগড়িটা বঁড়শিতে তুলে এনেছিল। এমত অপমানে নবাব গর্দান নিলেন লোকটির এবং ওর গৃহে গিয়ে দেখলেন স্ত্রী সুন্দরী, স্ত্রী পাথর খোদাই করে সব রমণীয় মূর্তি তৈরী করেছে। রমণীয় পসরা খুলেছে। নবারের আদেশে সুন্দরী স্ত্রী নবাবের মসনদ তৈরির জন্য নিযুক্ত হল। মসনদের সৌন্দর্যে নবাব বিমুগ্ধ এবং উত্তেজিত। রমণীর শিল্পসত্তা নবাবকে গ্রাস করল। অভিষেকের বাৎসরিকে তিনি রমণীর ঘরে শয়ন করার বাসনা জানালেন। সে রাতে হতভাগ্য রমণী আত্মহত্যা করল। তারপর কত নবাব এল গেল। মসনদের আখের একটা দুঃস্বপ্ন।]

যেন সে শেষ কয়েকটি কথায় বলতে চেয়েছিল : দুঃস্বপ্নের অংশীদার বস্তুত সে নিজেও।

বৃদ্ধবাবুটি দেখলেন, আলী হ্যাণ্ডেলের উপর পড়ে কাশছে। দম নিতে ফুরসত পাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পঞ্চাশটি নয়া পয়সা ওর হাতে গুঁজে দিলেন। আলী উঠে একবার দেখল না। আলী ধীরে ধীরে হ্যাণ্ডেলের উপর নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। সে সামনে গাঢ় অন্ধকার দেখছে অনেক দিনের মত। অনেক দিনের মত সেরেও যাবে এমন ভেবে গামছা দিয়ে ঠোটের কস গড়ানো রক্ত মুছতে চাইল। অথচ হাতটাকে টেনে আনতে পারল না। আকাশ সমস্ত শরীরে বরফের কুচি ঢেলে দিচ্ছে যেন। সে শেষবারের মত আন্তরিক স্পৃহাতে শরীরকে শক্ত করার জন্য মাথা তুলতে গিয়ে দেখল, ঘাড়েও কোন শক্তি নেই। বৃদ্ধবাবুটি লাঠিতে ভর দিয়ে চলে যাচ্ছেন। নির্জন নিঃসঙ্গ পথে লাঠির শব্দ ঠ্যাঙাড়ে দস্যুদের রাহাজানি শেষে অন্ধকারে মিশে যাওয়ার মত। সে দূরে তিনটে ঘণ্টা পেটার শব্দ শুনল! সদর জেলে ঘণ্টি পড়ছে। সে ক্রমশ হ্যাণ্ডেলের দুপাশে ঝুলে পড়তে থাকল।

যে পথ ধরে জাফর আলী পলাশীর প্রান্তর থেকে সৈন্য নিয়ে ফিরে গিয়েছিল দীর্ঘদিন পর সেই পথে আলী ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন বৃদ্ধবাবুটি ফের এই পথে ফিরে আসছেন। আট আনা পয়সার পরিবর্তে একটা টাকা দিয়ে ফেলেছেন এই সন্দেহে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প্রায় দৌড় দেওয়ার মত করে তিনি ফিরে আসছেন। তিনি ডাকছিলেন আলী, আলী—কিন্তু কাছে এসে দেখলেন আলী পূর্বের মতই হ্যাণ্ডেলে ঝুলে আছে। তিনি এবার যথার্থই লাঠি দিয়ে

খোঁচা দিলেন এবং যখন দেখলেন, লোকটা শীতে জমে গেছে তখন কর্তব্যনিষ্ঠ অর্থবিদের মত সব পয়সাকটা তুলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অন্ধকারে মিশে গেলেন। এবং তিনিও যেন আজ শুনতে পেলেন একদল ঘোড়াসোয়ার সৈনিক এইমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেইমানি করে এই পথ ধরেই ফিরে চলেছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দে আলীর দেহটা কাঁপছে।

কাল-ভুজঙ্গ

নিশি ফিসফিস করে ডাকল, 'সোনামণি, অ সোনামণি।'

সোনামণি কোন উত্তর করল না। মানুষটা বারান্দায় বসে সোনামণিকে ডাকছে। সোনামণি উঠোনে কচু সেদ্ধ করছে। দু' মেয়ে সোনামণির। অঙ্গি, বঙ্গি দুই ছানা-পোনা উনুনের ধারে কচু সেদ্ধ হবার আশায় বসে রয়েছে। উদোম গায়ে বসে আছে। আর অভাব অনটন সোনামণির নিত্যদিনের। সারা অঞ্চল জুড়ে খরা আর খরা। বর্ষা নেই। বৃষ্টি হচ্ছে না। বৃষ্টির আশায় মানুষটা বারান্দায় বসে আকাশ দেখছিল। বর্ষা এলেই ফসল ফলবে। ঝোপে-জঙ্গলে শাকপাতা গজাবে। অন্ন নেই পেটে, মানুষের অন্ন না থাকলে মাথা ঠিক থাকে না। সুতরাং নিশির ডাকে সোনামণি বিরক্ত হচ্ছিল।

'কিছু বুলছিস মোরে সোনামণি, খর গলায় ফের ডেকে উঠল নিশি।

তবু সোনামণি জবাব দিল না। মানুষটা খাবার লোভে অমন করছে।

'আমি কি তুর কেউ হই না রে সোনামণি'?

এবার সোনামণি ক্ষেপে গেল। 'তু আমার ভাতার নিশি।' রাগলে সোনামণির কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। মরদকে ভাতার, আলসে ভাতার অথবা গালাগাল—মরে না কেন, যম কি নেই, হা ঈশ্বর, তুর মুখে আগুন—এসব বলে সোনামণি কেমন সুখ পায়। সুখ পেলে তখন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হাঁটুর উপর কাপড় তুলে কটুবাক্য বর্ষণ। বারান্দা থেকে অল্প জ্যোৎস্নায় নিশি টের পেল—সোনামণি এবার হাঁটুর উপর কাপড় তুলে কটুবাক্য বর্ষণ করবে। ভয়ে নিশির গলা প্রায় কাঠ হয়ে গেল। সে ভয়ে ভয়ে বলল, 'রাগ করিস না সোনামণি। তুকে একটা কথা বুললে রাগ করে লিবি না ত!'

'মরণ'—সোনামণি মুখের উপর ঝামটা মারল একটা। মাঠে এখন আগুন জ্বলছে, পেটে আগুন—মানুষটার চোখে আগুন। সোনামণি এই প্রখর খরার দিনে নিশির চোখে আসঙ্গলিপ্সা দেখে ভয় পেয়ে গেল।

'মরণ' বুলছিস সোনামণি! মরণ বুলতে লাই রে। মরণ বুললে স্বামীর ঘরে আগুন লাগে। ঢোল বাজায় যে মানুষ, যে মানুষ বাড়ি বাড়ি পূজা-পার্বণে ঢোল বাজায়, কাঁসি বাজায় তারে মরণ বুলতে নাই।' তারপর বারান্দা থেকে সন্তর্পণে নেমে খোলা মাঠের দিকে মুখ করে বলল, 'তুই সোনামণি নিশির সঙ্গে মাঠে যাবি। বড় মাঠ। মাঠের দক্ষিণ সামুতে সরকারী খামার। খামারে বাবুরা বীজের ধান্য বুনছে। সোনামণি রে সোনামণি, কি ধান্য, কি ধান্য!' বলে নিশি একটা ঢোক গিলল। নিশি, যে ঢোল বাজায় পূজা-পার্বণে, যে কাঁসি বাজায় পূজা-পার্বণে, মুচিরাম হিঁদে যার বাপ ছিল, পাঁচ কাঠার জমির উপরে যার ঘর ছিল, যার এখন কিছুই নেই—সব বন্ধক নিয়েছে ভালমানুষের ছা শশী। শশী এখন বাবু, বাবু শশী খামারে এখন দারোয়ানের কাজ করছে।

সোনামণি বলত—'নাগর আমার!'

সেই নাগরের বিয়েতে, কন্যার অন্নপ্রাশনে ঢোল বাজিয়েছে নিশি। পাপ মুছে পুণ্য তুলে দিয়ে এসেছে, আর ধান্যদূর্বা ঢোলের উপরে—নিশি কত মঙ্গলকামনা করেছে শশীর। সেই শশীবাবু দু'গণ্ডা টাকায় জমি বন্ধক রেখে সোনামণি সহ নিশিকে বিবাগী করে দিল।

নিশির দুই মেয়ে, অঙ্গি বঙ্গি। ওরাও পূজা-পার্বণে নিশি ঢোল বাজাতে গেলে ছোট গামছা পরে সঙ্গে সঙ্গে যায়। বাপের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি কাঁসি বাজায়। কিন্তু খরা, প্রবল খরা। এখন আর কে কার পাপ মুছে পুণ্য নেয়। তাই অঙ্গি বঙ্গি দুই মেয়ে কচু সেদ্ধ পাতে তুলে খুব তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে।

বোধ হয় দুই মেয়ের তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া দেখেই নিশি আগুন হয়ে উঠেছিল। পেটে আগুন, পিঠে আগুন, সারা মাঠময় শুধু আগুন ছড়িয়ে আছে—ক্ষুধার আগুন। নিশি ক্রমশ ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল—'অ সোনামণি, শুনতে পেছিস!'

দুই মেয়ের খাওয়া দেখে সহ্য হচ্ছে না মানুষটার। সোনামণিও আগুন হয়ে আছে ভিতরে ভিতরে। সে দাঁত শক্ত করে বলল, 'শুনতে পেছিস নাগর।'

সব শুনতে পেয়েছে, তবে। সে এবার গলে গলে পড়ল। 'আর সোনামণি, অ সুমি, তবে দে, দু'টা খেয়ে লিলে শান্তি পাই।'

'হা আমার মানুষ রে!' বলে সোনামণি কপালে করাঘাত করল। প্রায় বিলাপের মত সুর ধরে বলতে থাকল, 'হায় ছানাপোনা পাখ-পাখালির হয়; গাছের পাতা মাছের মাথা হেথা-হোথা যা মিলে লিয়ে আসে, ছানা-পোনার কষ্টে পাখ-পাখালির ঘুম থাকে না চোখে—আর তু এক মনুষ্যের ছানা, মেয়ে দু'টা খেয়ে লিচ্ছে তর সহ্য হচ্ছে না!'

'অরে সোনামণি, অরে সুমি, তুই এমন করে রেতের বেলা বিলাপ করিস না। বিলাপ করলে মাঠে-ময়দানে মড়ক লেগেছে ভেবে সকলে ছুটে আসবে। আমি এক মানুষ, ঢুলী মানুষ, আমার দুই মেয়ে অঙ্গি বঙ্গি। ঢুলী মানুষের অমঙ্গল বইতে নাই।' নিশির ইচ্ছা হল, ঘরে ঢুকে ক্ষুধার জ্বালায় ঢোলটা কাঁধে নিয়ে মাঠে নেমে যায়। মেয়ে দুটো কচু কদু সেদ্ধ খাচ্ছে। সোনামণি কাঠের হাতা নিয়ে বসে রয়েছে, ওরা পাতেরটুকু শেষ করে ফেললেই বাকিটুকু ঢেলে দেব। নিশির ঢোল নিয়ে ছুটতে ইচ্ছা হল মাঠে, তারপর ঢোলের উপর বোল তুলে, ছররা ছুটিয়ে, মাঠে ময়দানে আগুন ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছা হল। খরার আতঙ্কে সোনামণির গলা টিপে ধরতে ইচ্ছা হল।

বড় দুঃসময়। না আছেপূজা, না আছে পার্বণ। দেশের লোক আকালে আকালে গেল। কি করবে, কাকে দোষ দেবে, সে ভেবে পেল না। তা ছাড়া মনে হল, রেগে গিয়ে লাভ নেই। বরং ঠাণ্ডা মাথায় পেটে হাত রেখে বসা যাক। উঠোনের উপর চুপচাপ বসে থাকলে সোনামণির দয়া হতে পারে। সে সোনামণিকে সেজন্য আর বিরক্ত করল না। উঠোনের উপর সে হাঁটু গেড়ে বসে থাকল। মনে হল শশীর কথা। শশীর জমির কথা। সরকারী খামারে বীজের জন্য ধান ছড়িয়ে রেখেছে শশী। ধানের কথা মনে পড়তেই নিশির সবটুকু জ্বালা মুহূর্তে উবে গেল। সে এবার গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াল সোনামণির কাছে। 'দে, একটু দে। পেটের জ্বালা নিবারণ করি। দে, দোহাই তুর সোনামণি, দে একটু দে, পেটের জ্বালা নিবারণ করি। দিলে তুর আয়ু বাড়বে সোনামণি। পুণ্য হবে তুর। সতীলক্ষ্মী হয়ে মরবি'। তারপর খুব কাছে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'যাবি তু, যদি যাস তবে সোনার ধান্য তুলে লিব। শশী কাদামাটিতে বীজের ধান্য ছড়িয়েছে। যাবি তু! তু আর আমি দু' পাখিতে সারা রাত ঠুকরে ঠুকরে সব ধান্য তুলে লেব।'

সোনামণিকে বড় তাজা মনে হচ্ছে এখন। স্বপ্ন দেখছে যেন। নিশি এবার সুযোগ বুঝে বলে ফেলল, 'দে সোনামণি, দে একটু খাই। খেয়ে পেটের জ্বালা নিবারণ করি'। সঙ্গে সঙ্গে সোনামণি কেমন জেগে গেল। শক্ত হয়ে বসে থাকল। সারা দিনমানে এই কচু সেদ্ধ সম্বল। সে নিশিকে আড়াল দেবার জন্য হাঁড়িটা পেছনের দিকে টেনে নিল।

বড় দুঃসময়। বড় বেহায়া নিশি। সে ঘুরে গিয়ে সামনে বসল। তারপর সেই আগের মত হাত বিছিয়ে বলল, আমি ঢুলী মানুষ সোনামণি, আমারে তু ছোট করে লিচ্ছিস। তু আর আমাতে এত ভালবাসা, তু আমারে ছোট করলে ধম্মে সইবে না।

তখন অঙ্গি ডাকল, 'বাপ।' বঙ্গি ডাকল, 'বাপ।'

তখন সোনামণি টিনের ভাঙা থালার অবশিষ্ট কচু সেদ্ধ দু'ভাগ করে নিশির পাশে খেতে বসে গেল। লে খা। ইবারে কি বুলবি বুল।'

'সোনার ধান্য আছে গ মাঠে।' নিশি কচু সেদ্ধ মুখে আলগা করে দেবার সময় কথাটা বলল। এমন করে বলল, যেন স্বপ্নে দেখা গুপ্তধনের খবর দিচ্ছে।

'কোথায়?'

'শশীর খামারে।' নিশি দুলে দুলে এত বড় খবরটা ভাল করে এবার শোনাল সোনামণিকে।

অঙ্গি বলল, 'আমি যাব বাপ।'

বঙ্গি বলল, 'আমি যাব বাপ।'

'দেখলি ত!'

সোনামণি ঢকঢক করে জল খেল। তারপর এনামেলের তোবড়ানো ঘটিটা পাশে রেখে বলল, 'গেলে কি অধম্মটা হবে শুনি।'

'ধরা পড়ে যাব।'

'চুপি চুপি যাব। কেউ টেরটি পাবে না। ওরা খুঁটে খুঁটে ধান তুলে লিবে।'

অঙ্গি বঙ্গি দুই মেয়ে। সুদিনে দুর্দিনে এই দুই মেয়ে। সুদিনে ফসল কাটা হলে মেয়ে দু'টো মাঠময় ঘুরে বেড়ায়। কোন মাঠের কোন সামুতে ইঁদুরে গর্ত করে ধান চুরি করে নিয়েছে তার খবর বয়ে আনে ঘরে। তখন নিশি আর ঢোল কাঁধে লয় না। মাথায় ফেটি, কাঁধে কোদাল। নিশুতি রাতে দুই মেয়ে সঙ্গ দেয়। সরু হাতে অঙ্গি বঙ্গি দুই মেয়ে গর্তের ভেতর থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ ধান তুলে আনে অথবা ওরা পাহারা দেয়। মাঠময় চোখ সজাগ করে রাখে—বাপ, কে যেন আসে! বাপ, ওটা কি? বাপ, কোদালে যেন কি লেগে আছে—অক্ত লেগে আছে। অক্ত বাপ, কিসের অক্ত! ইঁদুরের! তখন হেই হেই করে নিশির চিৎকার, না রে না, ইঁদুর-বাদুড় কিচ্ছু লয়, মা বসুন্ধরার কন্যা মা মনসার বাহন ভুজঙ্গ। কালো রঙের ভুজঙ্গ—চিকচিক করছে, আর মাথাটা দোলাচ্ছে। কিন্তু সেবারে কি হল বাপ। কোদাল মেরে মেরে হয়রান নিশি, কোন সুদূরে ইঁদুরে ধান টেনে নামিয়েছে টেরটি পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও ধানের গুচ্ছ নেই একটা। হায় হায়, পরিশ্রম বৃথাই গেল। রাগে দুঃখে গান ভেসে এল নিশির গলায়, সময়ে ওটা সুখের গান ছিল—হায় মা, কে কার তরে চুরি করে হে মা ঈশ্বরী। কিন্তু নেই, ধান গর্তের ভিতর কোথাও নেই—প্রায় মাঠ চষে ফেলেছে নিশি, নিশুতি রাতে অঙ্গি বঙ্গির ভয় ধরে গিয়েছিল, তখন নিশির নজর হক করে থেমে গেল। গর্তের মুখে আলিসান ভুজঙ্গ। কালো রঙের ভুজঙ্গ। কোদাল মারলে সামান্য লেজটুকু কাটা যাবে। গোট শরীর গর্তের ভিতরে। হায় তবে সব যাবে। ভিতরে সোনার ধান্য আছে গ মা জননী। তবে ইবারে কি করি। বলে এক হ্যাঁচকা টান লেজ ধরে। হাত বিশেক দূরে আলিসান ভুজঙ্গটা ভুঁইয়ে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর যায় কোথায়। নিশি দেখল ভুজঙ্গটা ওকে তেড়ে আসছে। ঠিক মনে হল সোনামণির মত তেড়ে আসছে। নাকে নথ ছিল সোনামণির, বালির চরে সোনামণির হক করে কাকে কামড়ে দিয়েছিল—বুঝি শশীকে, বুঝি নিশিকে এখন কামড়ায়, নিশি ছুটতে থাকল, ঘুরতে থাকল। নিশি এঁকেবেঁকে চলতে থাকল। আর হাঁকতে থাকল—অঙ্গি বঙ্গি ধান তুলে লে। আমি ভুজঙ্গরে ডাঙ্গায় তুলে আড়াল করে লিচ্ছি। নিশি আলোর উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে ছুটতে থাকল। আর হাঁকতে থাকল—অঙ্গি বঙ্গি ধান তুলে লে। আমি ভুজঙ্গরে ডাঙ্গায় তুলে আড়াল করে লিচ্ছি। নিশি আলের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে ছুটতে থাকল।

অঙ্গি বঙ্গি নাছোড়বান্দা। ওরা যাবেই। মৃগয়াতে বাপ যাবে, সঙ্গে মা সোনামণি যাবে—ওরা যাবে না কেমন করে হয়।

সুতরাং অঙ্গি গেল, বঙ্গি গেল। সঙ্গে মা সোনামণি এক কাপড়ে মাঠে নেমে গেল। কিছু আর সম্বল নেই সোনামণির। এক কাপড়ে, এক আঁচলে ওকে সব সংগ্রহ করে আনতে হয়। নিশি কাঁধে গামছা ফেলে, কোমরে নেংটি এঁটে সকলের আগে আগে চলল। আর গান ধরল, সুখের গান। কে কার তরে চুরি করে হে মা ঈশ্বরী।

গহন মাঠ। দূরে লণ্ঠন নিয়ে শশী খামারে উঠে যাচ্ছে। সে মাঠের ভিতর একটা ভাঙা টিন বেঁধে রেখেছে। টিনটা থেকে থেকে বেজে উঠছিল। একটা দড়ি, লম্বা দড়ি মাথার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে খামারে। শশী থেকে থেকে টিনটা বাজায়। নদী থেকে, বিল থেকে পাখ-পাখালি উড়ে আসার সম্ভাবনা। বীজধান বুনে শশীর চোখে ঘুম নেই। যখন দেশে আকাল, যখন দেশে শস্য মিলছে না—ইঁদুরে-বাদুড়ে শস্য খেয়ে নিতে কতক্ষণ। শশী খামারে বসে এখন শুধু টিন বাজাবে। নিশুতি রাতে শব্দটা বড় ভূতুড়ে মনে হয়—মনে হয়, কেউ যেন মাঠময় আকালের ঘণ্টা বাজাচ্ছে। পাখ-পাখালিরা আকালের ভয়ে আর নদী বিল থেকে উড়তে সাহস পায় না।

ওরা তখন তারকাঁটার বেড়টা পার হচ্ছিল। ঠিক তখনই টিনটা বেজে উঠল। ঝরঝর করে বেজে উঠল। মাথার উপর দড়িটা অনেক দূরে টেলিগ্রাফের তারের মত চলে গেছে। শশী খামারে বসে দড়ি টানছে। নিশি পায়ের উপর ভর করে দেখাল—'ঐ যে হোথা, ভুঁইয়ে সোনার ধান্য।'

অঙ্গি বলল, 'কোথা রে বাপ?'

বঙ্গি বলল, 'কুনঠিতে?'

নিশি বলল, 'হুই যে, দেখতে পেছিস না!'

ওরা পা টিপে টিপে হাঁটছিল। শশীর দড়ি ওদের মাথার উপর। বীজধানের জমিতে বাঁশের খুঁটি। খুঁটির মাথায় ভাঙা টিনটা ঝুলছে। জ্যোৎস্না ছিল সামান্য। কোথাও একটা পাখি ডেকে ডেকে তেপান্তরে হারিয়ে যাচ্ছে। সোনামণির বড় ভয় করছিল, শশীর ভয়। দড়ি ধরে শশী বসে আছে। ভয়ে সোনামণির বুকটা শুকিয়ে উঠছে। নিশি ফিসফিস করে ডাকল, 'কোন কথা লয় সোনামণি। কথা বললে শশী টের পাবে। ধরা পড়লে জেল হাজতবাস। গেরস্থের ঘরে চুরি লয়, সরকারী ধান্য, বীজধান্য, ধান্য থেকে হেথা হোথা সব পুণ্য উঠবে।'

অঙ্গি ডাকল—'বাপ।'

বঙ্গি ডাকল—'বাপ।'

আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা চারজনই আলের উপর উপুড় হয়ে গেল। টিনটা ঝনঝন করে বাজছে। আকালের ঘণ্টা বাজাচ্ছে শশী। ঘণ্টাটা ক্রমাগত বেজে চলেছে। শশী কি টের পেল—পাখ-পাখালি উড়ে এসে বসেছে। আকালের ঘণ্টাও পরানে ডর ধরাচ্ছে না! যেন শশী শরীরের সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে দড়ি টানছিল। যেন প্রাণপণ ঘণ্টাধ্বনি করছিল। ভয়ঙ্কর শব্দটা গ্রাম মাঠ পার হয়ে বিলের দিকে নেমে যাচ্ছে। তখন কে যেন কেবল বলছিল, হুই হোথা নিশি রে, সোনার ধান্য পড়ে আছে রে! ওরা হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছিল। শুধু একটু যেতে পারলেই হয়। ওরা প্রাণপণ হামাগুড়ি দিতে থাকল, গোসাপের মত ওরা হাঁটছে। শুকনো জমি, উত্তাপে সব ঘাস জ্বলে পুড়ে গেছে। ওদের হাঁটু থেকে, কনুই থেকে রক্ত ঝরছিল। ওদের হুঁশ ছিল না, ওরা বীজধানের জমি নাগাল পাবার জন্য অধীর এবং বীজধানের ভুঁই নাগাল পেয়ে নিশি আনন্দে প্রায় কিছুক্ষণ জমিতে হাত রেখে মড়ার মত পড়ে থাকল।

সোনামণি ডেকে উঠল, মানুষটা কতকাল অন্নের মুখ দেখেনি, কতকাল ওরা অন্ন ভোজন করেনি, সোনামণি ভয়ে ডেকে উঠল, 'হেই!' মাথার চুল ধরে টানল। 'হেই, কি হয়েছে তুর!' সোনামণির ভয়, নিশি, দুবলা নিশি এত দূর আসতে গিয়ে ফুসফুসটা জখম করে ফেলেছে। ফুস করে হাওয়া বের হয়ে গেলে আর কি থাকল।

'নিশি। অঃ নিশি।' সোনামণি ফের ডেকে উঠল।

নিশি এবার চোখ মেলে তাকাল এবং খপ করে হাতটা ধরে ফেলল সোনামণির। তারপর ভুঁইয়ের ভিতর, কাদা জমির ভিতর নেমে গেল। ওরা প্রায় চারটা পাখির মত খুঁটে খুঁটে যেন ধান খেতে থাকল। খুঁটে খুঁটে খুব সন্তর্পণে—আলগোছে হাত বাড়িয়ে তুলে আনল ধান। একটা ধান, দুটো ধান, একসঙ্গে পাঁচটা সাতটা ধান তুলতে পারছে না। পাঁচটা সাতটা ধান তুলতে গেলে এক মুঠো কাদা উঠে আসছে। জ্যোৎস্না প্রায় মরে

আসছিল। ওরা ধানের চেয়ে কাদা তুলে ফেলছিল বেশী। শশী খামারে বসে দড়ি টানছে ত টানছেই। এক মুহূর্তের জন্য থামছে না। থামলেই ওরা চারটা পাখি ভুঁইয়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। হাতে পায়ে কাদা, শরীরে কাদা—সর্ব অঙ্গে কাদা লেগে আছে। চোখ মুখ দেখলে এখন কে নিশি, কে সোনামণি, আর কে অঙ্গি বঙ্গি বোঝা দায়।

ঠিক পাখির মত ওরা এক পা দু পা করে এগুচ্ছিল। কাদার ভিতর হামাগুড়ি দিচ্ছিল। ধান খুঁটে যে যার গামছায় রাখছে। সোনামণি ধান তুলে আঁচলে রাখছে। ধানের সঙ্গে কাদা আর জমি থেকে জল শুষে আঁচলটা ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে। ধান সামান্য, কাদাজলে গামছা ভরে গেল নিশির। সে কি করবে ভেবে পেল না। ধীরে ধীরে সোনামণির কাছে বুদ্ধির জন্য উঠে গেল। কাছে গিয়ে দেখল সোনামণি গোসাপের মত কাদা হাঁটকাচ্ছে। শরীরে কোন বাস রাখেনি। সোনামণির অঙ্গ ছোলা মুরগীর মত। গোটা শরীরটা ভুঁইয়ে বিছিয়ে রেখেছে। সে তাড়াতাড়ি ধান তুলে নিচ্ছে। কারণ শশীকে বড় ভয় সোনামণির। শশী বড় চেনা মানুষ। কঠিন মানুষ। মনে হতেই দাঁত শক্ত হয়ে গেল সোনামণির। কটুবাক্য বর্ষণ করতে ইচ্ছা হল। বেইমান শশী, নেমকহারাম শশী। লজ্জা শরম মানুষটার দিন দিন উবে যাচ্ছে। পয়সা হাতে আসতেই শশী তবলা ডুগী কিনে বোলানের একটা দল করে ফেলল। ওস্তাদ শশী সোনামণিকে তাড়ি খাবার লোভ দেখাল! সোনামণির সোনার ধান্য চুরির লোভে নিশি বাড়ি না থাকলে শশীর ঘুরঘুর করা বেড়ে যেত। 'শশী—তুমি গোলাম হে শশী।' সোনামণির চোখে আগুন জ্বলছিল, জিভ ভয়ে শুকিয়ে আসছিল, আর সেই এক সিংহের খেলা দেখানো চোখ সোনামণির। সামান্য দূরে অঙ্গি বঙ্গি। সেচের জলে বীজের ধান, সেই ধান তুলে এদিকেই এগিয়ে আসছে অঙ্গি বঙ্গি। আর সেই মানুষ নিশি কুঁড়ে মানুষ বসে বসে সোনামণির তামাশা দেখছে। সোনামণি খ্যাঁক করে উঠল।

নিশি আমতা আমতা করে বলল, 'গামছাটা ভরে গেল সোনামণি। ধান লেবটা কিসে!'

'হা রে আমার মরদ।' সোনামণি ফের দুঃখে দাঁত শক্ত করে ফেলল। এখন বচসার সময় নয়। নাচন-কোদনের সময় নয়। এখন শুধু ধান তুলে নেবার সময়। নিশিকে বসে থাকতে দেখে আগুনের মত ওর শরীর জ্বলে উঠছিল। সে কি ভাবল, কি দেখল নিশির, তারপর সহসা নিশির নেংটিটা হ্যাঁচকা টানে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। ঠিক যেন এক ভুজঙ্গ এখন ভুঁইয়ের মাঝে পড়ে আছে চিত হয়ে।

নিশি বলল, হ্যা ল সোনামণি, হ্যা ল সুমি, আমি নিশি, আমি ঢোল বাজাই পূজা-পার্বণে, আমারে তুই উলঙ্গ করে দিলি!'

'মরদের কথা শুন!' সোনামণি ধান রেখে শাড়িতে মুখ মুছে কথা বলল। 'আমার সাধু রে।' সোনামণি ফের সাঁতার দিল কাদার ভিতর। কিছু জানে না মরদ। খুঁটে খুঁটে কি ধান তুলে আনল। অঃ আমার গাজনে সন্ন্যাস লিয়েছে রে, জয় মহাদেবের বাচ্চা রে! যা যা ওটা বিছিয়ে যা পারিস তুলে লেগা'। সোনামণি আর তাকাল না নিশির দিকে। মাথার উপর এখন আর দড়িটা নড়ছে না। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে শশী। 'শশী তুমি বড় চতুর হে। তুমি মাঠময়, নিশিকে টাকা দিয়ে বশ করেছ।' আর তখন চারিদিকে খরা, আগুনের মত ঝিল্লি গরু বাছুর জলের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। 'আর শশী তুমি বড় চতুর হে। তাড়ির খোঁজে তুমি শশী বন-বাদাড়ে ঘুরঘুর করছিলে।'

নিশি সেদিন বাড়ি ছিল না। অঙ্গি বঙ্গি নিশির সঙ্গে ঢোল বাজাতে চলে গিয়েছিল দূর গাঁয়ে। তখন সোনামণি, একা সোনামণি বন-বাদাড়ে ঝোপে-জঙ্গলে কচু কদু খুঁজে মরছে। তখন হনুমানটা গাছ থেকে লাফ দিয়ে একেবারে সামনে নেমে ভূতের মত পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকল। আর যায় কোথায় সোনামণি। সে ঝোপের ভেতর থেকে বলল, 'অঃ ভালমানুষের ছা, দেখ ত গাছে ওটা কি?' আর যখন লোকটা গাছ দেখতে গিয়ে বলল, কৈ কোথাও ত কিছু দেখতে পেছি না রে সোনামণি, কই রে, কি দেখালি তুই, কি দেখাবি তুই আমারে...' তখন সোনামণি তাড়াতাড়ি ঝোপ থেকে বের হবার ফাঁক খুঁজছে! বের হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সব লতাপাতার ঝোপ। কোনরকমে লতাপাতা গা থেকে সরিয়ে মাঠে নেমে যাবার চেষ্টা করছে।

এবং বলছে, 'দ্যাখ দ্যাখ গাছের মাথায় পাখি, পাখিটা ডিম পাড়ছে দ্যাখ।' কিন্তু হায়, মানুষটা গাছ দেখছে না, সে সোনামণিকে দেখছে—'আমি বলি ঝোপের ভিতর কি খচখচ করে, দেখি নিশির বউ সোনামণি।' বলে মুখটা ঝোপের কাছে নিয়ে হা হা করে হেসে উঠল। কথা শুনে সোনামণি বলল, 'অত হাস্য ভাল লয় শশী।' কেমন শুকনো গলায় কথাটা বলল এবং ঝোপের ভিতর একটা পাখি হয়ে বসে থাকল। চীৎকার করতে পারল না। কেউ কোথাও নেই। এই ভরদুপুরে এত বড় মাঠে খরা বলে কেউ নেই। আগুন জ্বলছে মাঠে, শশীর সুদের কথা মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে শশী সেই যেন এক আলিসান ভুজঙ্গ—হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকতে চাইছে। সোনামণি বলল,'অ মা গ!' বলে ফুড়ুত করে মাঠের ভিতর উড়ে যেতেই খপ করে আলিসান ভুজঙ্গটা ওর একটা পা কামড়ে ধরল যেন। পাখি গাছে ডিম পাড়ে, বড় বড় ডিম, মুরগীর মত ডিম। তারপর সোনামণির শরীরের ভিতর কোথাও না কোথাও ডিম আছে, মুরগীর ডিম লুকানো আছে, সোনামণি শরীরে মুরগীর ডিম লুকিয়ে রেখেছে—আর যায় কোথায়, শশী ডিমের জন্য, ডিম বের করার লালসায় ওকে তছনছ করে দিতে গিয়ে দেখল, সোনামণি ওর হাতে কামড় বসিয়ে দিয়েছে।

সোনামণির চোখ দুটো কাল-ভুজঙ্গের মত ফোঁসফোঁস করছিল তখন! সোনামণির কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। কচু কদু ফেলে সোনামণি একসময় ছুটতে থাকল।

নিশি এখনও পাশে বসে রয়েছে। ওকে সোনামণি টান মেরে উলঙ্গ করে দিল। সে রাগে দুঃখে প্রায় কথা বলতে পারছিল না। সোনামণিকে বড় ভয় তার। তবু কাতর গলায় বলল, 'আমি ঢোল বাজাই, পাপ ফেলে পুণ্য আনি, তু আমারে সোনামণি উলঙ্গ করে দিলি।'

সোনামণি ধান দেখে রসে বশে আছে। ওর সব দুঃখ কষ্ট এই ধান, এত ধান হরণ করে নিয়েছে। সে উল্লাসে প্রায় নীচু গলায় গান ধরেছিল, হায় মা, কে কার তরে চুরি করে হে মা ঈশ্বরী।' তারপর বলল, 'কত সোনার চান্দে পরান কান্দে...অঃ নিশি তু আমারে মেরে ফেল রে।'

কিসে কি কথা হয়, নিশি বোঝে না। সোনামণি এখন প্রায় পাগলের মত হাসছে। কথা বলছে। কথা ত নয়, যেন সুর ধরে চড়ক পূজার দিনে মেলার শূনি মাসীর মত কণ্ঠ খুলে দিয়েছে। বিরক্ত হয়ে নিশি বলল, তর পরান এত উথাল-পাথাল করে কেন রে সোনামণি?'

তখনই খামারবাড়িতে কার গলা যেন হেঁকে উঠল, 'ও সামুতে কার গলা পাই হে। এত রাতে কার গলা পাই হে!'

সোনামণি গলা চিনতে পেরে বলল, 'হেই, হেই নিশি, কি বুলছে শুনে লিচ্ছিস।'

'কি বুলছে?'

'বুলছে, কার গলা পাই হে।'

নিশি, দুবলা নিশি তাড়াতাড়ি করে মাথায় পোঁটলা তুলে ছুটতে থাকল। মেয়ে দুটো বাপের পেছনে ছুটতে থাকল। যাবার সময় নিশি বলছিল, বুলেছি না অত হাসা ভাল লয়।

'ও সামুতে কে কথা বলে হে? জবাব নেই কেন হে।'

অন্ধকারে মনে হল শশী দানবের মত থপথপ করে খামারবাড়ি থেকে নেমে আসছে। আকালের ঘণ্টা ওর হাতে এখন বাঁধা নেই। অথবা মনে হল, কালো কুচকুচে এক ভুজঙ্গ পাখি ধরার জন্য নেমে আসছে। সে খুব জোরে হাঁকছিল না। কারণ ফাঁদের ভেতরে পাখি ধরা পড়েছে—ও যেন গলা শুনে আকালের ঘণ্টা বাজাতে সব টের পাচ্ছিল। সুতরাং সে চোর চোর বলে জোরে পর্যন্ত চেঁচাল না।

চাঁদের আলোটুকু পর্যন্ত মরে গেছে। নিশুতি রাতের অন্ধকার তেমনি ভয়াবহ। বিলে সেই এক পাখি তখনও ডাকছে। আর কাদাজলের ভিতর সোনামণির পায়ের শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছিল। সে নিশির সঙ্গে ছুটে যেতে পারল না। নিশি ছোট্ট এক পুঁটলি মাথায় করে দ্রুত চলে গেল। কিন্তু সোনামণির পুঁটলি ভারি, সে কিছুতেই বোঝাটা মাথায় তুলতে পারল না। দূরে নিশি ছুটছে। অঙ্গি বঙ্গি ছুটছে। সোনামণি মাথায় তুলে নেবার জন্য আরও দুবার চেষ্টা করল। বার বার চেষ্টা করল। বার বারই জলে কাদায় পড়ে যাচ্ছে সোনামণি,

পা হড়কে যাচ্ছে, পা শক্ত করে কাদার ভিতর দাঁড়াতে পারছে না। পালাবার জন্য বোঝা নিয়ে সে টানাহ্যাঁচড়া করতে থাকল—টেনে টেনে বোঝাটা ভুঁইয়ের এক পাশে নিয়ে আসার চেষ্টা করল—পারল না। চোখ মুখ ক্রমশ শুকিয়ে আসছে ভয়ে। ক্রমশ সোনামণির হাত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। শশী এখন সেই এক দানবের মত অথবা সেই এক আলিসান ভুজঙ্গ খাব খাব করছে। যেন বড় উল্লাস শশীর, আর হায় সোনামণি সামান্য এক প্রাণ, কাদার ভিতর পাখির মত ধরা পড়ে গেল।

শশী রসিকতা করে যেন হাঁকল, 'সাহস ত বড় কম লয় হে! জবাব দিচ্ছ না ক্যানে!'

সোনামণি বুঝল, এত বড় বোঝা ওর তুলে নেবার ক্ষমতা নেই। বুঝল, এত কষ্টের সংগ্রহ প্রাণের চেয়েও মূল্যবান পুঁটলিটি ফেলে গেলেও রেহাই পাবে না। এখন ছুটতে গেলেও ধরা পড়ে যাবে।

শশী এখন হাত দশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সে আর এগুল না। সে বোধ হয় দাঁড়িয়ে পাখিটার তামাশা দেখছিল। কাদার ভিতর হুটোপুটি দেখছিল। শেষে দরাজ গলায় যেন পাখি আর পালাতে পারবে না, এমন এক দরাজ গলায় হাঁকল, 'কে ভুঁইয়ের ভিতর হুটোপুটি করছে হে।'

অন্ধকারে সোনামণি কি করবে ভেবে পেল না। ভয়ে উত্তেজনায় অস্থির সোনামণি। তবু ছুটে একবার দেখতে পারে। এখনও সময় আছে। যখন আর উপায় নেই, শশীই ওর কাল-শশী...ওকে ধরে ফেললে দুবলা নিশিকে নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি হবে তখন মাঠের ভিতর দিয়ে ছোটাই ভাল! সে ওর সোনার ধান্য ফেলে ছুটতে থাকল।

'কে আছে হে! দ্যাখ, দ্যাখ, চোর পালাচ্ছে। খামারে চোর পড়েছে।' শশী এই বলে হাস্য ছড়াল। তারপর শশী চোর ধরার মত অন্ধকারে সোনামণির পেছনে পেছনে ছুটতে থাকল। সোনামণি আপ্রাণ ছুটছে, অন্ধকারে ছুটছে। তারকাঁটার বেড়া সামনে। বেড়াটার সামনে সোনামণি পথ পেল না পালাবার। শশী চোরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিন্তু সোনামণির গা পিছল, কাদাজলে গা পিছল। পাঁকাল মাছের মত সোনামণি শশীর শক্ত বাহু থেকে হড়কে গেল। হড়কে গিয়ে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য সোনামণি। সোনামণি অন্ধকারে ছুটছে, যেদিকে ভুঁই আছে সেদিকে ছুটছে। সেই অন্ধকারে মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে দু হাত উপরে তুলে জনহীন প্রান্তরে শশী চীৎকার করে উঠল, 'তুমি সোনামণি, তুমি জান না আমি শশী, আমি কালশশী। তোমাকে আমি ফাঁদে ফেলেছি হে সোনামণি।' ফাঁদের কথা শুনে সোনামণি আর ছুটতে পারল না। হাত পা অসাড় হয়ে গেলে। চারিদিকে অন্ধকার, চারিদিকে তার কাঁটার বেড়া আর সেই আকালের ঘণ্টা কে যেন কেবল বাজিয়ে চলছে। 'হা মা ঈশ্বরী আর ছুটতে লারছি।' বলেই সে ভুঁইয়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। জমির পাড়ে দাঁড়িয়ে শশী হা হা করে সেই এক হাস্য ছড়াল। খাকী হাফ-প্যাণ্ট পরা শশী কাদার ভিতর নেমে গেল। উদোম গায়ে শশী সোনামণিকে সাপটে ধরল। কিন্তু হড়কে যেতেই শুকনো জমি থেকে ধুলো মাটিতে হাত শুকনো করে এল। তারপর ফের কাদার ভিতর নেমে সোনামণিকে মরা মাছের পাখনা ধরে টানার মত একটা হাত টেনে তুলল উপরে। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'আমার ভুঁইয়ে খোলা গায়ে মুরগী ওড়ে, এ কি তাজ্জব হে!' কিন্তু কোন জবাব নেই। কাদার ভিতর মড়ার মত পড়ে আছে সোনামণি। শশী শরীরের ভিতর হাত দিয়ে কি খুঁজল, শেষে হাঁটু গেড়ে পাশে দু হাত রেখে কাদা থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল, বড় পলকা শরীর সোনামণির। সে তাকে কাঁধে তুলে নিল। দূরের মজা দিঘিতে ধুয়ে পাকলে নেবার জন্য শশী হাঁটছিল। দু পা যেতেই সোনামণি কাঁধ থেকে হড়কে নীচে পড়ে গেল। আর শশী শক্ত করে ধরতেই সোনামণি যেন প্রাণ পেয়ে গেল। সে আবার ছুটছে। শশীর শরীর ভারী, সে কাদার ভিতর ছুটতে পারছিল না। সোনামণির পলকা শরীরে সে সামান্য আরামে প্রাণ পেয়ে গেল, সে উড়ে উড়ে পাখির মত ভুঁইয়ে খেলা দেখাতে থাকল শশীকে। সে প্রায় উড়ে উড়ে ছুটতে থাকল। সে এই কাদার ভিতর শশীকে ঘুরিয়ে মারছে। সেই যেমন নিশি একদিন এক মাঠে এক ভুজঙ্গ নিয়ে ঘুরে ঘুরে খেলা করছিল, মাঠের ভিতর তেমনি সোনামণি এক ভুজঙ্গ নিয়ে কাদায় ভুঁইয়ে লড়ছে। কিন্তু হায়, এ খেলা বিষম খেলা। ভুজঙ্গ পাখি ধরার জন্য লড়ছে, পাখি প্রাণ বাঁচানোর জন্য লড়ছে। ফাঁদের ভেতরে পাখি। শুধু ছটফট করা যায়।

সোনামণি খেলায় শেষ পর্যন্ত হেরে গেল। কারণ পা হড়কে পড়ে গিয়ে সে কাদার ভিতর আটকে গেল। শশীরও তর সইছে না। সে হাঁটু মুড়ে কাদার ভিতর বসেই বলে উঠল, 'খোলা গায়ে মুরগী ওড়ে, হায় কত সুখ রে।'

সোনামণি জবাব দিল না। মরা গোসাপের মত চিত হয়ে পড়ে থাকল। কারণ এতটুকু শক্তি আর সোনামণির অবশিষ্ট ছিল না। সামান্য যেটুকু শক্তি সে শুধু বিলাপের জন্য, সে নীচে পড়ে শুধু বিলাপ করতে থাকল, হ্যাঁ রে নিশি, তুই আমারে ফাঁদে ফেলে চলে গ্যালি রে! হ্যাঁ রে নিশি আমার সোনার ধান্য চুরি যায় রে!'

শশী বলল, 'সোনার ধান্য আমার।'

সোনামণি বলল, 'সোনার ধান্য আমার। তু আমার সোনার ধান্য চুরি করে লিচ্ছিল।' বলেই হক করে শশীর গলাটা কামড়ে ধরল। ভালমানুষের ছা শশী মুরগীর মত, জবাই করা মুরগীর মত উঠে দাঁড়াল। দু-তিনটে বড় লাফ দিল কাদার ভুঁইয়ে, পাগলের মত দু হাত উপরে তুলে ঘুরে ঘুরে শেষে এক আলিসান ভুজঙ্গের মত লুটিয়ে পড়ল। সোনামণি, সামান্য এক প্রাণ-পাখি শশীর মত দানবের, যে আকালের ঘণ্টা বাজাত প্রাণ হরণ করে চলে গেল। তখন থেকে থেকে পাখির ডাকটাও কমে গেছে, থেকে থেকে শশীর হারিকেনটা খামারে দপদপ করে জ্বলছিল, শুধু জ্বলছিল। তেপান্তরের পাখিটা শূন্যে তখন উড়ছিল, ঘুরছিল আর বুঝি বলছিল—আকালের ঘণ্টা কে বাজায় দেখ।

বাতাসী

বাতাসী চোখ তুলতেই দেখল, কিছু গাছের জঙ্গল এবং পরে পায়ে-হাঁটা পথ! আশ্বিনমাস বলে গাছের মাথায় ভোরের রোদ চিকচিক করছে। আশ্বিন মাস বলে রাতের শিশির এখন ঘাসে ঘাসে শ্যামা পোকার মত জ্বলছে অথবা ডালে পাতায় স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ ছড়াচ্ছিল। অথবা মনে হল বাতাসীর, এই রোদটুকুর উত্তাপে চাপ চাপ ভারী বাতাস এবং গেরস্ত বাড়ির সুখ দুঃখ সব ক্রমশ হাল্কা হচ্ছে। সে কোলের শিশুটিকে কোলের কাছে আরও ঘন করে এবং নাবালক নিবারণের হাত ধরে এবার হাঁটতে থাকল।

দূরে পূজার বাজান বাজছে। এই সব শিশুদের পূজামণ্ডপ দেখার বাসনা। আর আশ্বিন মাস সুতরাং নদী-নালার কথা মনে আসছিল। কাশফুলের কথা মনে আসছে।

সে দেখল পায়ে পায়ে অনেকদূর এই হাঁটাপথ। ওর আর হেঁটে যেতে সাহস হচ্ছে না। হাঁটু ভেঙে আসছে ক্রমশ। সে অসহায়, কারণ শেষ আশ্রয়স্থলটুকু পর্যন্ত গেছে। বাতাসী সারা রাত কেঁদেছিল। চোখ দুটো ফুলে গেছে। চোখের নীচে দুঃখের দাগ। বাতাসী বলল, নিবারণ বাপ আমার, জোরে পা চালাইয়া হাঁট। ওরা পূজামণ্ডপে প্রসাদের জন্য হাঁটতে থাকল।

গতকাল নিবারণ ও কোলের শিশুটি সারাদিন চ্যাঁ চ্যাঁ করেছে। অন্নাভাব এবং নিখোঁজ স্বামীর জন্য বার বার ঈশ্বরকে দায়ী করেছে বাতাসী। বাতাসী ক্ষুধায় কাতর সুতরাং হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে বাতাসীর এবং এক ধরনের অন্যমনস্কতা এ-সময় ভিতরে ভিতরে কাজ করছিল। ছোট চালা ঘর, বড় রাস্তার ধারে বাবুদের বাড়ি পূজামণ্ডপ সবই ভয়ঙ্কর দীর্ঘ মনে হচ্ছে, যেন শেষ নেই এবং কেবল একটানা হেঁটে যেতে হবে। বাতাসী ভেবেছিল—দুদিন সময় পেলে কোথাও কাজের সন্ধান করবে, দুটো মুখের জন্য ভাবনা থাকবে না। সে মণ্ডপে মণ্ডপে প্রসাদের জন্য ঘুরে বেড়াতে থাকল।

অথচ প্রসাদে পেটের জ্বালা বাড়ছে। বাতাসী স্থির করতে পারছে না কি করণীয়। ওর শেষ আশ্রয়ের কথা মনে হল। মামা মোহনচন্দ্রের কথা মনে হল। মামা মোহনচন্দ্র মণ্ডলের দু বিঘে জমি এবং গেরস্ত বাড়ি। মোহনচন্দ্র বাতাসীকে গতকাল বলেছিল, তর মত আমি-অ রিফুজী। আমি আর তরে খাওয়ান দিতে পারমু না। তর তিন প্যাটের যোগাড় ইবারে তুই কর দ্যাহি।

বাতাসী বলেছিল, দুইটা দিন সবুর কর‍্যান মামা। আপনের ভাগিনারে আইতে দ্যান।

—হ্যায় আর আইছে! মোহনচন্দ্র একটুকু বলে হুঁকা সাজতে বসে গেল। মোহনচন্দ্রের রুগ্ন স্ত্রী জল খেতে খেতে বলছিল, সংসার, যার যার তার তার। এবং এক গ্রাম্য শ্লোকে বাতাসীকে তীক্ষ্ণ খোঁচা দিল। মোহনচন্দ্রের সন্তানেরা খেল, মোহনচন্দ্র এবং তার রুগ্ন স্ত্রী খাচ্ছে—বাতাসী এবং তার সন্তানেরা শুধু দেখছিল আর চোখে অন্নের ছবি জলের মত ভেসে যাচ্ছিল ... বাতাসী রাতে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করতে করতে উঠে এসেছিল এবং বলেছিল, মামা তবে আপনে আমারে কি করতে কন?

সন্তানেরা না খেয়ে আছে দিনমান। বাতাসী দুঃখ কষ্ট আর সহ্য করতে পারছে না। সে তার মামার সৎ পরামর্শ চাইল এবং কাঁদতে থাকল, আমার কি হৈব।

মোহনচন্দ্র বুদ্ধিমানের মত জবাব দিয়েছিল, কি হৈব আবার! যার কে-অ নাই তার দশজন আছে, ভগবান আছে। তর দশদুয়ার আছে।

সুতরাং অনেকক্ষণ বাতাসী পথের উপর দাঁড়িয়ে এই পথ দেখল। হাঁটতে হাঁটতে সে অনেকদূর চলে এসেছে। ইতস্তত গেরস্ত বাড়ি অতিক্রম করলে সড়ক এবং সড়ক ধরে শহরের পথ। বাতাসী পথে নিবারণকে বলল, নিবারণ বাপ আমার, তুই বড় হৈবি কবে! তর বাপের আর কৈ খোঁজ করমু!

নিবারণ এসে সামনে দাঁড়াল এবং বলল, মা।
বাতাসী বলল, আমি কি করমুরে নিবারণ।
নিবারণ বলল, মা তর মামার কয় বাবারে কাইটা ফ্যালাইছে।
বাতাসী নিবারণের মুখ চেপে ধরল। নিজে কোন কথা বলতে পারছে না। ওর বুকে ভয়ঙ্কর কষ্ট এবং দম বন্ধ হয়ে আসার মত ভাব। পূজার বাজনা বাজছে দূরে। ঢাকের শব্দ সানাইয়ের শব্দ আর নিবারণ বায়না ধরেছে, মা খামু, খুদা পাইছে।
বাতাসী টগরের মুখে শুকনো স্তনটি সব সময়ের জন্য দিয়ে রেখেছিল। আনাজ তরকারীর বাগান এখন তারা অতিক্রম করছে। নিবারণ মার কাছ থেকে কোন উত্তর পাচ্ছে না। সে চারিদিকে তাকাতে থাকল এবং বলল, মা একটা ঢেঁড়স তুইলা আনমু।
এই সব গাছে এখন ঢেঁড়স ফলে আছে। গাছগুলি শেষ ফলদানে বৃদ্ধের মত। এবং ইতস্তত পোকায় খাওয়া সব ঢেঁড়স। নিবারণ মার অনুমতির জন্য প্রতীক্ষা করল না। সে বাগানে ঢুকে দুটো ঢেঁড়স তুলে ফেলল।
নিবারণকে ঢেঁড়স খেতে দেখে কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হল বাতাসী। কারণ পিতার মৃত্যু সম্পর্কে নিবারণ আর কৌতূহলী নয়। নিবারণ ঢেঁড়স খাচ্ছে আর চারিদিকের পাখ-পাখালি দেখছে। বাতাসী নিবারণের চোখ দেখে বুঝল ঠিক ঠিক যেন সেই এক নিরাপত্তাবোধ ওর চোখে। সীমান্ত অতিক্রম করার সময় নিবারণ মার হাত ধরে বলেছিল, আমার বাবার এহানে পালাইয়া আইছে না মা?
সীমান্ত অতিক্রম করার সময় সবই আনন্দজনক। সেই একই মানুষ—তারা হাল চাষ করছে; পাখিরা উড়ছিল—কোথাও কোন বিষণ্ণতা ছিল না। না রোদে, না মাঠে, এমন কি মানুষের ভিতরেও নয়। জমিতে বীজ বোনবার সময়। সীমানার দু দিকে সেই এক ঝোপজঙ্গল এবং এ-পারের পাখ-পাখালিরা অন্য ধারে উড়ে যাচ্ছে এবং সেই এক অশ্বত্থ গাছ নদী পার হলে, অথবা সেই এক বৃদ্ধ, আব্বাসের মত ঘোলা চোখে সকল কিছু সামলাচ্ছে। আব্বাস বলেছিল ডোলের ভিতরে লুকাইয়া পড় মা। তর পোলারে একটা তফন পরাইয়া দ্যা। আর বাতাসী সীমানা অতিক্রম করার সময় ভেবেছিল, এখানে কোথাও না কোথাও বৃদ্ধ, আব্বাসের দেখা পাওয়া যাবে। সুতরাং সে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের জন্য, নিখোঁজ স্বামীর জন্য কখনও রেলে চড়ে অথবা কখনও ইতর মানুষদের ভোগ্য দ্রব্যের মত সে নিজেকে সীমান্ত অতিক্রম করতে সাহায্য করেছিল।
বাতাসী কত পথ ভাঙল কত হাট-বাজার অতিক্রম করে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত সব মানুষদের ভিতর স্বামীকে খুঁজল। কখনও সরকারের দয়া, কখনও কায়িক শ্রম অথবা দূর-সম্পর্কের পরিচিত ব্যক্তির সাহায্যে সে অন্নাভাব দূর করছিল আর, নিজের দুঃখকে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর জন্য ধরে রেখে শুধু কান্না আগলাত। বলত, তুমি ঠাকুর কৈ আছ? তোমার পোলাপান দুইডা কেবল কয় বাবায় কৈ গ্যাল মা! আমাগ ফ্যালাইয়া তাইন কৈ গ্যাছে? অথবা যেন বাতাসী বলতে চাইল, এই যে এত দুঃখ, এত বেদনা এবং বিষণ্ণতা সবই যেন তোমার প্রত্যাশাতে।
বাতাসী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। কিছু ভাবতে পারছে না। মাথাটা কেমন ঘুরতে থাকল। যখন চাষীরা বীজ বুনছিল, যখন চৈত্র বৈশাখ মাস ছিল এবং যখন নদী-নালা জলের জন্য হাহাকার করছিল, তখন যেন কোথাও না কোথাও তার স্বামী সাধুচরণ মণ্ডল সন্ন্যাসীর মত বসে ছিল--এ-কল্পনা সে করেছে কত।
ওরা মুলি বাঁশের বেড়া অতিক্রম করল। নিবারণ মার পাশে আঁচল ধরে হাঁটছে। ছোট মেয়েটা কেবল স্তন খাচ্ছিল। বাতাসী কাপড় আলগা করে রেখেছে এবং এই বুকের প্রতি নিদারুণ অবহেলা--খালি গা বাতাসীর। ভোরের কুয়াশা এখনও গাছের ফাঁকে ফাঁকে ধোঁয়ার মত লেগে আছে। ফুরফুরে বাতাস এবং কলাগাছের পাতা নড়ছে। নিবারণ কলাগাছের পাতা ছিঁড়ল ভেঁপো বাজল। নিবারণের প্যাণ্ট ছেঁড়া, খালি গা এবং নাক থেকে সর্দি ঝরছে। বাতাসীর চোখ দুটো বড় উদ্দেশ্যবিহীন--বারান্দায় বাবুলোক বসে, চেয়ারে পা তুলে

বাতাসীকে তিনি লক্ষ করছেন। মেয়েটা নির্বোধের মত বাড়ির উঠোনে ঢুকে গেল। কোন কথা বলছে না—চারিদিকে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

বাবুলোকটি বললেন, এখানে কি চাই?

বাতাসী আমতা আমতা করতে থাকল। সে ভয়ে তার সন্তানদের আরও কাছে টেনে আনল। তারপর মরিয়া হয়ে বলল, কর্তাগ আমার পোলাপানেরে দুইডা খাইতে দ্যান। কথাগুলো খুবই অস্পষ্ট। বাতাসী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মাথা এবং মুখ যেন জ্বালা করছে! সে ফের কথাটা আবৃত্তির মত বলতে চাইল কিন্তু পারল না।

বাবুমানুষটি এবং তার স্ত্রী ওর দুঃখে যেন কিঞ্চিৎ কাতর। সুতরাং ওরা ওকে নানাভাবে প্রশ্ন করছিল।

বাতাসী বলল, তখন খাইতে বইছি। বাতাসী দাঙ্গার বিবরণ দিতে চাইল। বাতাসীর সেই সব কথার ভগ্নাংশ একই দৃশ্যকে প্রকাশ করছে—ওদের হাতে মশাল, ওরা শীতলক্ষার চর ধরে ভয়ঙ্কর নাম নিতে নিতে ছুটছে। নিরীহ মানুষেরা পেট ভরে খেতে পারল না। শীতলক্ষার জলে রক্তের নদী বইতে থাকল।

বাতাসী বলল, তাইন কাম থাইক্যা আর ফিরল না।

বাতাসী বলল, লোকে কয় তাইন মাইনষের লগে ঠিক হিন্দুস্থানে চইলা গ্যাছে। আর আমি-অ মাইনষের লগে ঠাকুর খুঁজতে চইলা আইলাম।

নিবারণ মার আঁচলের ফাঁক থেকে জাদুকরের লাঠির মত সহসা মুখ বের করে বলল, মাইনসে কয়, আমার বাবারে কাইটা ফ্যালাইছে।

হত্যার কথা শুনে আবেগে বাবুটি তিনজনের মত চাল দিতে বললেন স্ত্রীকে এবং কিছু নগদ পয়সা। তারপর এক কোচ মুড়ি ভরে দিতেই বাতাসী হাউ-হাউ করে কাঁদতে থাকল। সারা মাস ধরে পূজা-পার্বণ, মা দুগগা ঠাকুর এসেছেন।

মার কান্না দেখে নিবারণও কাঁদল। কোলের শিশুটি একবার মার মুখ দেখে ফের স্তন খেতে থাকল। সদাশয় ব্যক্তিটি এই দুঃখজনক ঘটনা সহ্য করতে পারছেন না। বাতাসী ঠাঁই খোঁজার জন্য নতুন বাতিঘরের দিকে রওনা হয়েছে। সদাশয় ব্যক্তিটি যেন দেখতে পেলেন, এই বাতিঘরের আলো একমাত্র সমুদ্রে যাবার পথ বাতলে দিচ্ছে—ঘরে ফেরার কথা অথবা কোন বন্দরে নোঙর ফেলতে সাহায্য করছে না।

তিনি বললেন, কেঁদে কি করবে। অথবা যেন বলতে চাইছেন, দুঃখ মানুষকে মহৎ করবে। তারপর তিনি বললেন, যতদিন সাধুচরণ না ফিরছে, ততদিন তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

বাতাসী হেঁটে চলে গেল। নিবারণ পিছনে পিছনে হাঁটছে। নিবারণের চোখে দুঃখের জল, বাতাসীর চোখে দুঃখের জল। দরজায় দরজায় হাত পাতার অসম্মান বাতাসীকে যথার্থই আজ কাতর করছে।

বাতাসী ডাকল, বাপ নিবারণ।

নিবারণ বলল, ভাত হৈয়া গ্যাছে মা।

নিবারণের বোন টগর হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। কাক ডাকছিল বড় রাস্তায়। তখন সকাল। মা খাবে, টগর খাবে আর নিবারণ বসে থাকবে। মার খাওয়া হলে নিবারণ সব ধুয়ে পাকলে আনবে।

নিবারণ ভাত বেড়ে বলল, খাইতে বও মা।

বাতাসী খেতে বসে বলল, কাইল দুইটা আলু আনছিলাম।

নিবারণ বলল, রাইখ্যা দিছি। বাগুন পাইলে রসা রানমু।

বাতাসী ডাল সেদ্ধ দিয়ে ভাত মাখল। সোনা-বৌমা তিনটে কাঁচালঙ্কা দিয়েছে—বাতাসী সযত্নে ব্যাগ থেকে তা বের করল। বাতাসী একটা লঙ্কা ঘষে ঘষে মাখল এবং নাকের কাছে গন্ধ নিল তারপর সযত্নে ভাত ডাল মেখে বড় বড় গ্রাসে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে ঢকঢক করে এক ঘটি জল খেল।

বাতাসী পান মুখে দেবার সময় বলল, নিবারণ কাইল টগর কি কয় জানস? কয় আমার বাবারে স্যাখেরা কাইটা ফ্যালাইছে। ঠিক তর মত কইল।

নিবারণ বলল, আমি সুর ধইরা কইতে পারতাম।

বাতাসী বলল, দুই চাইর দিন বাদে টগর কইতে পারব।

নিবারণ বলল, মা তর হেই মানুষটার কথা মনে আছে? তুই আমি কানছিলাম, টগর কানছিল।

বাতাসী বলল, যাই। তবে আগের মত ভিক্ষা দেয় না। অর বৌটা মইরা গ্যাছে।

বাতাসী পান খাচ্ছে। গালের এক পাশে পান এবং মুখে এক ধরনের সুখী ভাব ফুটে উঠেছে। নিবারণ ফের বলল, মা আমারে ইটু পান দাও। নিবারণকে বাতাসী মুখ থেকে চিবানো পান এনে খেতে দিল। সুতরাং টগরেরও বাসনা পান খাওয়ার। সেও হাত পাতল, অস্পষ্ট কথা টগরের মুখে। বাতাসী টগরকে চিবানো পান দেবার সময় বলল, আইজ যদি রাস্তায় তুই মাইয়া না হাঁটস, তবে তর একদিন কি আমার একদিন--বলে, বাতাসী এক ধরনের বিরক্তিকর শব্দ করল। ভোরের সংসার এইটুকু বাতাসীর। এখন স্বামী সাধুচরণের কথা মনে আসছে না। এই সময়টুকু বাতাসী, টগর এবং নিবারণ গতদিনের ভিক্ষালব্ধ সব জিনিসপত্রের একটা মোটামুটি হিসাব নিয়ে বেঁচে থাকে। জীবনে সুখ আছে, কারণ, গরম ভাত একটু পান। তারপর সামনে লাউমাচানে কিছু কচি লাউ অথবা গাছে গাছে বসন্তের ফুল ফুটছে—ঠিক এমনি এক জীবন যা ছেড়ে চলে এসেছে এবং যার জন্য ধীরে ধীরে এক মমতাবোধ গড়ে উঠছে বাতাসীর।

বাতাসী ঝোলাঝুলি নিয়ে টগরকে নিয়ে বের হয়ে পড়ল। বড় রাস্তা ধরে সে হাঁটছে। বসন্তকাল—গাছে গাছে নতুন পাতা এবং রোদে উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে—আবার বীজ বুনবার সময় হয়ে এল। সামনে সব পরিচিত পথ। শহরে বাস যাচ্ছে, গরুর গাড়ি যাচ্ছে, ক্যাচক্যাচ শব্দ অথবা পাখ-পাখালির শব্দ বাতাসীকে ঘর থেকে শহরে এবং আশেপাশে গেরস্ত বাড়ির ভিতরে যাবার জন্য মরিয়া করে রাখে।

একটা পরিচিত কামরাঙা গাছ—বাতাসী সেখানে দাঁড়াল। একদা এই গাছ ওকে মৃত ডাল দিয়ে সাহায্য করত সুতরাং আজও দেখল সঙ্গে কোন মৃত ডাল কিংবা পাকা কামরাঙা ঝুলছে কিনা। অথবা কখনও কয়েতবেলের আচার খাবার জন্য জিলা বোর্ডের সদর রাস্তায় আমীনকে—বলা নেই কওয়া নেই, আমীনকে এক কোঁচড় শাক তুলে দিয়েছিল। মিষ্টি কথা, সেই জাদুকরের লাঠির মত টগর আঁচলের তলা থেকে বের হয়ে বলেছে, মাইনসে কয় বাবারে কাইটা ফ্যালাইছে। যেন একটা ভেল্কি—ভিক্ষার জন্য বাতাসী সকলকে টগরের সাহায্যে এই ভেল্কি দেখাচ্ছিল। এবং জীবনধারণের জন্য এই ভেল্কি মানুষের প্রয়োজন। এজন্য রাতে বাতাসী মোটা কাঁথায় শুয়ে নির্বিঘ্নে ঘুমোতে পারত, কোন অনুশোচনা থাকত না।

বাতাসী আজ শহরের দিকে হাঁটছে না। সে ভিন্ন পথে কলোনীতে উঠে যাচ্ছে। পরিচিত পথ বলেই টগর আগে আগে হাঁটছিল। টগর ছুটছে কখনও, যেন পার্বণের নিমন্ত্রণ পেয়েছে। পরিচিত পথ বলেই সে জানত এ-সময় এখানে ঢেঁকিশাক অথবা কাঁটাশাক এবং অন্য অনেক রকমের বন্যলতা ফুল এবং ফল পাওয়া যাবে। বাতাসী ফুল ফল শাকপাতা সংগ্রহ করল। ঝোপের পাশ থেকে তখন টগর ডাকছে—মা দ্যাখ, কত গিমা শাক!

অসময়ে এত গিমা শাক পেয়ে বাতাসী খুব খুশি। সে টগরকে নিয়ে বসল। দূরে পাঠশালা। শিশুদের কোলাহল বাতাসে ভেসে আসছে। বাতাসী বলল, টগর তুই বড় হৈলে তরে ইস্কুলে পড়ামু। বাতাসী সযত্নে শাক তুলছিল এবং টগরের সঙ্গে কথা বলছিল। কখনও গুনগুন করে সুখের গান গাইছে। সারাদিন এখন বাতাসীর জীবনসংগ্রাম অথবা এ যেন এক নূতন কৌতূহল প্রতিদিন। অতীব এক সুখ এই জীবনসংগ্রামে। সে তার কোঁচড় টিপল। অনেক শাক, কোনও পল্লীতে এই শাকের বিনিময়ে সে কিছু পাবে। এক ব্যবসায়ী বুদ্ধি নিয়ত তার ভিতরে কাজ করছে।

সে বাড়ি বাড়ি হাতের খঞ্জনী বাজাল এবং গান করল ... এ কি হেরিলাম নয়নে। টগর ভাঙা ভাঙা গলায় দুয়া দিল। বৃদ্ধারা বলল, আর একটা গাও।

বাতাসী গাইল, নদীয়ায় এলেন শ্রীহরি ...। তারপর বাতাসী ঝোলা খুলে বলল, দ্যান গ মা ঠাইরেন। বাড়ির সকলে পরিচিত সুতরাং বাতাসী বলল, আপনে গ সোনাবউরে দ্যাখতাছি না? ঝোলাতে চাল পড়তেই

সে বিড়বিড় করে আশীর্বাদের মত কি সব বলল। সব কিছু বাতাসী ধীরে ধীরে রপ্ত করেছে—জীবনধারণের জন্য কিছু ভিন্ন ভিন্ন কৌশল আয়ত্ত করার মত। আর পরিচিত বলেই কিছু কিছু পরিবার তার আত্মীয়ের মত। সে গিমাশাকটুকু এক বাড়িতে রেখে বলল, বউদি খাইয়েন। সে দাওয়ায় বসে এক ঘটি জল খেল।

বাতাসী বলত, বুঝলেন মা সরকার গ পুষ্কণীতে এত বড় একটা উদবিড়াল ধরা পড়ছে।

বাতাসী বলত, তখন আমরা খাইতে বইছি। ঠাকুর কামে গ্যাছেন। ভোরের রোদ যখন দুপুরের মাথায় এসে থামত বাতাসী বলত, ঠাইরেন আমাগ বাড়ি নারায়ণগঞ্জে। নাম শুনছেন নি? নদীর ঐ পারে বন্দর। আমার ঠাকুর গঞ্জির কলে কাম করত। ঠাইরেন মাইনসের দিন সমান যায় না। পরিবারের লোকেরা হয়ত ব্যস্ত, বাতাসীর কথা কেউ শুনছে না—বাতাসীকে গান গাইতে বারণ করছে, তখন সে বলত, নাঙ্গলবন্দের নাম শুনছেন? আপনা গ দ্যাশত প্যারাব পোনাবর কাছেই আছিল। নাঙ্গলবন্দের কামার কুমার কে-অ নাই। সব পোড়াইয়া দিছে।

তখন পরিবারের লোকজন দেশের খবর এবং সেই মাঠঘাটের খবর নিচ্ছে, আর বাতাসী কথকঠাকুরের মত বলছে মাঠঘাটের খবর আর কি কমু! এবং এভাবেই সে যুদ্ধ জয় করে চলেছে। ওকে দেখলেই সকলের সেইসব মাঠের ছবি দেখার ইচ্ছা—এমন একটা দেশ যার পাখ-পাখালি, মাঠ এবং শস্য প্রাণের চেয়েও মহৎ।

বাতাসী বলত, মা'গ সব দ্যাখলাম। জীবনটা আমার এক বছরে একশ বছরের কৈরা দিছে। তার বলার ইচ্ছা যেন, মাসের পর মাস ঝোপে জঙ্গলে কাটা মানুষের মাথা, কলমীলতার ভিতরে বিবস্ত্র যুবতীর মুখ অথবা বাদাম তুলে যাত্রীরা কোথায় যেন চলে যাচ্ছে—এই সব দেখতে দেখতে বাতাসীর এক বছর একশ বছর হয়ে গেল। বাতাসী বলত, এক জীবনে কত দ্যাখলাম গ মা। অরা লুটতরাজ করল, নাঙ্গলবন্দের ভৈরবীর ঠ্যাং ভাইঙ্গা দিল। সে চোখ বড় বড় করে বলত, বুজলেন নি মাসি, একটা লোক পাতিলের নীচে মুখ ঢাইকা জলে লুকাইয়া আছিল পাঁচদিন। ড্যামরার ঘাটে অরা কয়, হ্যারে সোতের পানি ভাইসা যায়, পাতিলডাত ভাইসা যায় না লগে লগে। দিল এক বাড়ি। টগর এই কথায় মুখটা হাঁ করে ফেলল আর বাতাসী একটু থেমে বলল, আহাগ মানুষটার মাথা বাঙ্গির মত ফাইট্টা গ্যাল।

বাতাসী তারপর টগরের হাত ধরে বলত যাইগ ঠাইরেন।

পরিবারের লোকজন বলত, খাড়ও। ওরা বাতাসীকে দুমুঠো চাল বেশি দিত।

তখন বাতাসী বলত, খ্যাতে মেলা বাগুন হৈছে ঠাইরেন। একটা দ্যান না! নিবারণের বড় সখ আলু দিয়া বাগুন দিয়া রসা করব।

এখন রোদ হেলতে আরম্ভ করেছে। সে আরও দু বাড়ি ভিক্ষার জন্য ঢুকে গেল।

এই ভরদুপুরে, মানুষেরা বলল, তোমার সময় অসময় নেই।

আঁচলের নীচে বাতাসী জাদুর লাঠি লুকিয়ে রেখেছিল। এবং মুখের চেহারা এখন করুণ। গলার স্বর অভিনয়ের মত।

টগর আঁচলের ফাঁক দিয়ে লোকগুলোর চেহারা দেখছে। গিন্নীমার চোখ ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। তবু টগর ফাঁক থেকে বের হয়ে বলল, মাইনসে কয় বাবারে কাইট্টা ফ্যালাইছে। বাতাসীর এটাই শেষ অস্ত্র। বাতাসী আকাশ দেখে বুঝল এবার ফেরার সময়। কারণ চাষীরা মাঠ থেকে ফিরছে। সারাদিন ভিক্ষার জন্য শরীরে ক্লিষ্ট ভাব —বাতাসী শিমূলগাছের নীচে টগরকে নিয়ে বসল। কৌটা থেকে পান বের করে সামনের মাঠ দেখল। মাঠ দেখলেই মৃত মানুষের সব মুখ মনে আসে, মাঠ দেখলেই অন্ধকারের কথা মনে হয়, অথবা দূরে দূরে মশালের আলো, ঈশ্বরের নামে ভয়াবহ চীৎকার। সাধুচরণ যেন সর্বদা তার কাছে হেঁটে আসছে। সাধুচরণ আর ফিরবে না। সাধুচরণকে হয়ত কলের মানুষেরাই কেটে ফেলেছে। রাতে যখন ওর কুঁড়েঘরটা নিঃসঙ্গতায় ডুবে থাকে, যখন ঝোপেজঙ্গলে জোনাকী জ্বলে অথবা মোটরের আলো হর্ন দিতে দিতে দ্রুতগতিতে বড় শহরের দিকে যায় তখন সাধুচরণ যেন ফিসফিস করে বলে, বাতাসী আমি আইছি দরজা খোল।

চারিদিকটা পোড়া ইটের মত খাঁখাঁ করছে। বাতাসীর ঝিমুনি আসছিল টগর মার কোলে মাথা রেখে শুয়েছে। বাতাস বইছে না, দূরে কোথাও কাক-শালিখের শব্দ। শহরে লোক যাচ্ছে সাইকেলে চড়ে—ওরা ঘণ্টি দিচ্ছিল, সাধুচরণের ভাঙা সাইকেলের কথা মনে আসছে। পাশে ঝোলাঝুলিতে চাল, আলু, বেগুন। সুতরাং কোন কষ্টই নেই। এখন শুধু সাধুচরণ। সাধুচরণের উপস্থিতি একান্ত কাম্য। সাধুচরণকে সে এখন খাওয়াতে পারে। সারা দিন সঞ্চয়ের জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা, সুতরাং দিনটা বড় তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হয়। রাত দীর্ঘ, বাতাসীর ঘুম আসে না, তখন শুধু কান্না পায়। সাধুচরণের জন্য সে রাতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

রোদের তেজ তীব্র তীক্ষ্ণ বলে অথবা জায়গাটা খুব নিরিবিলি বলে বাতাসী গায়ের কাপড় নামিয়ে রেখেছিল। ঝোপজঙ্গলে কীটপতঙ্গের আওয়াজ। চাষের জন্য মাঠ অমসৃণ। গাছের ফাঁকে টিনের চাল এবং দেয়ালের ঘর দেখা যাচ্ছে। সে টগরকে নিয়ে ঝোলাঝুলি সঞ্চয় নিয়ে দুপুরের রোদে গাছের ছায়ায় বসে ফের গুনগুন করে একটা গান গাইল। এইসব পায়ে হাঁটা পথ ভিন্ন ভিন্ন পরিচিত পরিবার এবং ঝোপজঙ্গলের পাশে ফুল, কয়েতবেলের গাছ। অথবা রিকশায় চড়ে শহরে চলে যাওয়ার ভাবনা, সবই এক পরম উত্তেজনা বহন করছে। এর জন্য তার বাঁচার প্রবল ইচ্ছা, প্রবল এক স্বাধীনতাভোগ। এবং বাতাসীর সহসা মনে হল এরা সকলেই ধীরে ধীরে তার ভালবাসার সামগ্রী হয়ে গেছে। সাধুচরণকে এইসব কীটপতঙ্গ পাখপাখালি এবং কুল কয়েতবেলের পাশে বড় ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছিল।

যখন রোদ নরম হল, যখন শহর থেকে সারি সারি গরুর গাড়ি বড় রাস্তা ধরে গ্রামের দিকে নেমে যাচ্ছে তখন বাতাসী টগরকে ডাকল, টগর ইবারে উঠ। ঘরে যাইবি না!

বাতাসী সামনের পুকুরে স্নান করে নিল। তারপর অবেলার রোদে চুল ছেড়ে শ্যামা সংকীর্তন করতে করতে ঘরের দিকে ফিরল। সে গাইল, শ্যামা বসন পর, ভূষণ পর...আর ওর মনে হল এই বসনভূষণের জন্য এক অজ্ঞাত ইচ্ছা মানুষকে সব সময় তাড়না করে ফিরছে। সে বলল, টগর কাইল আমরা শহরে ভিক্ষা করতে যামু। এই বলে ওরা ঘরে ফিরছিল। যেন এইমাত্র কোন দ্রুতগামী তীর্থের শকট থেকে নেমেছে। তাদের মুখ এবং চোখ বড় উদাস দেখাচ্ছে।

রাতে বাতাসী ঘুমিয়ে আছে। ঘরে কোন আলো জ্বলছে না। ঘরের কোণায় একটা ব্যাঙ থেকে থেকে ডাকছে। বর্ষার দিন, মাঝে মাঝে ঝড়ো হাওয়া দিচ্ছিল। কড়কড় করে গাছের মাথায় মেঘের শব্দ—নিবারণ তখন খুব ঘুমোচ্ছে। টগর স্বপ্নে কেঁদে উঠেছিল একবার আর বাতাসী থেকে থেকে দুঃস্বপ্ন দেখছিল, যেন সাধুচরণ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকছে, দরজা খোলা ঝড় বৃষ্টির জন্য মেঘের কড়কড় শব্দের জন্য ঘটনাটাকে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল।

দরজার পাশে মানুষের গলা। বাতাসী কান খাড়া করে রাখল। বাতাসী শুনল, মোহনচন্দ্র ডাকছে, বউ দরজা খোল। সাধু আইছে।

বুকে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা এবং ভূত দেখার মত ভয়। সে বড় বড় চোখে এবং কাঁপতে কাঁপতে দরজা খুলতে গেল। দরজার ফাঁকে দুজন মানুষের ছায়া শুধু দেখা যাচ্ছে। স্পষ্ট কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সুতরাং বাতাসী কুপি জ্বালাল। কুপিটা এক হাতে রেখে বেড়ার ফাঁকে ফের প্রশ্ন করল, আপনেরা ক্যাডা।

—আমি মোহন। সাধুরে লইয়া আইছি।

বাতাসী দরজা খুলে যথার্থই সাধুচরণকে দেখল। এখনও সব কিছু রহস্যজনক ভেবে বাতাসী ভাল করে কথা বলতে পারছে না। সে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকল। সাধুচরণের গায়ে ময়লা জামা, মুখে বড় দাড়ি এবং চোখ দুটো জ্বলছিল। মোহনচন্দ্র চলে গেলে বাতাসী সাধুচরণের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং গা হাত শরীর টিপে মানুষটা সাধুচরণ এই সত্য জেনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল।

বাতাসী বলল, তোমার পোলাপানেরে ঠাকুর কষ্ট পাইতে দেই নাই।

সাধুচরণ শুধাল, তুই আব্বাসের বাড়িতে আছিলি?

বাতাসী বলল, হ। কিন্তু রাইতের ব্যালায় মনে হৈল আব্বাস আমাগ বাঁচাইতে পারব না। আমি নাকে নথ পৈরা, আব্বাসের বৌর বোরখা গায়ে দিয়া আর নিবারণেরে তফন পরাইয়া বাইর হৈয়া পড়লাম।

সাধুচরণ এবার নিজের কথা বলতে গেলে বাতাসী বলল, দুঃখের কথা পরে হৈব। তুমি জামাকাপড় ছাড়। বাতাসী নিজের হাতে ওর চুল মুছে দিল। বলল, ঠাকুর তোমার লাইগ্যা রাইতে আমার চক্ষে ঘুম নাই। তোমার মামায় কয়, তোমারে কাইটা ফ্যালাইছে। বাতাসী এবার তার দু'হাত সাধুচরণের দাড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। তারপর ঘন হয়ে বলল, তোমারে-অ কষ্ট দিমু না।

সাধুচরণ বলল, কাছে আয় তুই। দূরে দূরে থাকবি না।

বাতাসী বলল, ক্যামন লজ্জা লজ্জা লাগতাছে।

সাধুচরণ এবার উঠে দাঁড়াল। তারপর বাতাসীকে এত ঘন করে নিল যে—বাতাসী ভয়ে বলে উঠল, নিবারণ বড় হৈছে, টগর বড় হৈছে। কুপিটা ফু দিয়া নিভাইয়া দ্যাও।

সাধুচরণ ফুঁ দিয়ে কুপি নেভাল না। বরং কুপির আলোতে সে বাতাসীর মুখ দেখল, অথবা যেন গন্ধ নিচ্ছে মুখের—এই মুখে কোন দুরারোগ্য ব্যাধির গন্ধ আছে কিনা দেখতে চাইল।

বাতাসী সহসা মনে পড়ার ভঙ্গিতে বলল, দুফরে কি খাইছ?

—কিছু না।

বাতাসী তাড়াতাড়ি নিজেকে ওর দু হাতের ভেতর থেকে ছাড়িয়ে নিল। বলল, ঠাকুর সিদ্ধ ভাত কৈরা দিই। খাও।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। নিবারণ, টগর তখনও ঘুমোচ্ছিল। বাতাসী ঘরের কোণ থেকে শুকনো ঘাসপাতা এনে উনুনের পাশে রাখল। বাটিতে চাল, কুমড়া একসঙ্গে ধুয়ে হাঁড়িতে ছেড়ে দিল। উনুনে আগুন জ্বলছে। সাধুচরণ উনুনের পাশে বসে সুখ দুঃখের গল্প করছে। ওর শরীরে কাপড়ের খোঁট জড়ানো এবং সে কেবল বাতাসীর মুখ দেখছিল। মুখে এক ধরনের লাবণ্য—উনুনের উজ্জ্বল আলোতে বড় মায়াময়—সে এই উনুনের পাশেই বাতাসীকে ফের জড়িয়ে ধরল এবং বলল, বাতাসী তর মুখটা আমার ভগমান। কত দ্যাশে গ্যাছি, কেবল চাইয়া রৈছি—তর মুখের মত যদি পাই। লোকে আমারে পাগল কৈত। মারধর করত।

বাতাসী তখন সাধুচরণের দিকে তাকাতে পারছে না। সাধুচরণের লম্বা দাড়ি, বড় বড় চুল এবং কোটরাগত চোখ এতক্ষণ পর যেন বড় অসহায় ঠেকছে। সুতরাং সাধুচরণকে সন্তানের মত মনে হল। সোহাগ করার ইচ্ছাতে হাত বাড়াল বাতাসী। বলল, য্যায় তোমারে মারছে তার হাত য্যান খইয়া পড়ে। সে এই রাতে বসে বসে তাদের শাপ শাপান্ত করল।

সাধুচরণ বলল, নবদ্বীপে সন্তোষ পালের কাছে খোঁজ পাইলাম তরা মামার কাছে গেছিলি।

বাতাসী মোহনচন্দ্রের নাম শুনে ক্ষেপে গেল। মুখটা ওর থমথম করছে। সাধুচরণকে নিয়ে মোহনচন্দ্র ঘরে এলে ঘৃণায় সে চোখ তুলতে পারেনি। ততক্ষণ সে বিমূঢ়ের মত বসেছিল।

সাধুচরণ ঘরের চারপাশটা দেখল। পাটকাঠির বেড়া, খড়ের চাল। তারপর বাইরে বৃষ্টি পড়ছে তখনও। ট্রাকের শব্দ ভেসে আসছে, ব্যাঙের শব্দ হচ্ছিল। আর সাধুচরণ বাতাসীর কাছে বসে ভাবছিল যেন সে জীবনের শেষ তীর্থক্ষেত্রে পৌঁছে গেছে। সে বাতাসীর মুখ কছে টেনে বলল, আমার এত সুখ কি সহ্য হৈব। বলে, সাধুচরণ হাউহাউ করে পাগলের মত কেঁদে ফেলল।

সাধুচরণ কাঁথার নীচে শুয়ে এক সময় প্রশ্ন করল, বাতাসী মামায় কয় তুই ভিক্ষা করস?

—কী করমু কও তবে!

সাধুচরণ কোন জবাব দিতে পারল না। পরদিন বাতাসী বলল, তুমি আইছ, আইজ আর ভিক্ষা করতে যামু না।

সুতরাং সারাদিন সাধুচরণের সঙ্গে বাতাসীর দেশ গাঁয়ের গল্প। নিবারণ টগর বাপের কাছাকাছি থাকছে। এই সংসারের ছোট ছোট ইচ্ছারা আজ হালকা হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়ছে। সাধুচরণ পাশের নালা থেকে

কিছু পুঁটি মাছ ধরল বঁড়শিতে। বাতাসী মাছের ঝোলে ধনেপাতা দিল। সাধুচরণ খেতে বসে নিবারণ এবং টগরকে ডাকল। ওরা বাপের সঙ্গে খেয়ে এখন বড় বড় ঢেঁকুর তুলছে। আজ রোদ ছিল বলে, বাতাসে আর্দ্রতা কম। বাতাসীর শুকনো কাপড় হাওয়ায় উড়ছে। তারপর যখন রাত হল, রাতের জ্যোৎস্না এই নরম মাটিতে আশ্রয় নিচ্ছে এবং কীটপতঙ্গ গরুর গাড়ির চাকার শব্দ দূরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে তখন সাধুচরণ বলল, বাতাসী তরে একটা কথা কৈতে চাই।

—কও।

—কথাটা কিন্তু তর রাখন লাগব।

—কথাটা আগে কও।

—তুই কাইল থাইক্যা ভিক্ষা করতে যাইস না।

বাতাসী জবাব দিল না।

সাধুচরণ বলল, চুপ কৈরা থাকলি যে বড়!

—চুপ কৈরা থাকমু না ত কি করমু!

—জবাব দ্যা।

—দিমুনে। আইজ জবাব দিলে চলব কি কৈরা।

—ক্যান চলব না ক।

—আগে কাম কৈরা আন।

সুতরাং পরদিন সাধুচরণ গ্রামে কামলা খাটবার জন্য ভোরে ভোরে বের হয়ে গেল। বাতাসীও অন্যান্য দিনের মত নিবারণকে সব বুঝিয়ে টগরের হাত ধরে পরিচিত পথ ধরে এবং পরিচিত পাখিদের ডাক শুনতে শুনতে বাড়ি বাড়ি ঘুরল।

সেইসব খবর, কখনও গান গেয়ে—য্যান বাতাসী উজানী নৌকার মাঝি—সে সওদাগরের মত বাণিজ্য করল।

কাজ থেকে ফিরে সাধুচরণ বলল, তর মায় কৈরে নিবারণ?

—মায় টগরের লৈয়া ভিক্ষা করতে গ্যাছে।

সাধুচরণের ভাল লাগছিল না। সুতরাং সাধুচরণ তিক্ত মুখে বসে থাকল।

নিবারণ বলল, আপনে সান কৈরা আইয়েন। ভাত খাইতে বন।

সাধুচরণের তিক্তমুখ এই অবেলাতে বড় করুণ দেখাচ্ছে। যখন বাতাসী বাণিজ্য করে ফিরল সাধুচরণ কথা বলল না। সাধুচরণ উঠানে বসে অপরিচিত ব্যক্তির মত হুঁকা টানছে।

বাতাসী ফিরে সোজা ঘরে ঢুকে গেল। নিবারণের হাতে ঝোলাঝুলি দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ল। বলল, কিগ মুখ ব্যাজার কৈরা বৈসা আছ ক্যান। দ্যাখ তোমার লাইগ্যা কি আনছি। বাতাসী একটা ছোট কচি শসা সাধুচরণের পায়ের কাছে রাখল। গরম গরম মুরি দিয়া খাইয়া।

নিবারণ হুঁকা টানছিল যেন সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। সে ট্যাঁক থেকে তার রোজগার বের করে দিল। —নে, কাইল আর ভিক্ষা করতে যাইস না। তুই আমার বৌ, আমি গেঞ্জির কলের সাধুচরণ। কথাটা মনে থাকলে ভিক্ষা করতে তর মন চাইব না।

বাতাসী ঠোঁট টিপে হাসল। বলল, তুমি খাইছনি?

—খাইছি। সাধুচরণের গলায় এখনও তিক্ততা আছে সুতরাং বাতাসী পায়ের কাছে গিয়ে বসল। বলল, কার লাইগ্যা করি কও। তোমার লাইগ্যা, তোমার পোলাপানের লাইগ্যা করি। তুমি যদি রাগ কর তবে কোনখানে যাই কও দ্যাখি।

সাধুচরণ বলল, আমি আবার কৈলাম, তুই যাইস না।

বিকেল মরে যাচ্ছে। সাধুচরণ কোথাও আর বের হল না। দুজন অত্যন্ত কাছাকাছি থাকার জন্য, রাতের জ্যোৎস্নার জন্য প্রতীক্ষা করল।

যখন উঠানে জ্যোৎস্না নেমে এল যখন ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে এবং শরীরে যখন আর ঘাম হচ্ছে না তখন সাধুচরণ বলল, কাইল শহরে যামু। যদি গেঞ্জির কলে কাম লইতে পারি।

এবং একদিন যথার্থই গেঞ্জির কলে কাজ নিয়ে সাধুচরণ যখন ফিরে এল সেই অবেলায় সাধুচরণ বলল, তরে ইবারে কৈতাছি—আমার শ্যাষ কথা, তুই আর ভিক্ষা করতে পারবি না। বাতাসী দুঃখে নুয়ে পড়ল। অন্যান্য দিনের মত বাতাসী আজও কোন উত্তর করল না। সে পাশের নালা অতিক্রম করে বড় রাস্তার পারে দাঁড়াল। এইসব বিচিত্র পথ কত এঁকে বেঁকে চলে গেছে। পরিচিত গাছ, পরিচিত পাখ-পাখালী সকলে নিঃসঙ্গ যেন। বাতাসী অনেকক্ষণ টগরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। তার কথকঠাকুরের মত কথামৃত কেউ শুনবে না তার গলায় শ্যামা গান কেউ শুনবে না অথবা সে যখন পাখিদের ডাক শুনতে শুনতে গ্রাম্যপথে হারিয়ে যাবে তখন তাকে দেখলে কেউ বলবে না—বাতাসী দুঃখী। ভিক্ষা বাতাসীর তীর্থের মত। কি ভেবে আজও বড় রাস্তা থেকে বাতাসী উজানী নৌকার মাঝির মত ঘরে ফিরল আর শ্যামা গান গাইল—শ্যামা বসন পর ভূষণ পর। এবং সে তার বাণিজ্য করার ঝোলা ঝুলিগুলোকে রিপু করতে বসল।

নদী, নারী, নির্জনতা

আজকাল প্রায়ই তাকে কেউ নীল খামে চিঠি দিয়ে যায়। বয়স বাড়ছে। চিঠিটা গোপনে রেখে যায়, গোপনে সে পড়ে —তাতে লেখা নদী, নারী, নির্জনতা মানুষের জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

সে সফল মানুষ। ঘর-বাড়ি তার ভারি ছিমছাম। অতিকায় টবে বোগেনভিলিয়া বাড়ছে, বড় হচ্ছে, বুড়ো হচ্ছে। ফুল ফোটে, পাতা ঝরে যায়। শীত আসে। বসন্ত চলে যায়। চিঠি আসার তবু বিরাম নেই। সে চিঠিটা কখনও ব্যালকনিতে বসে থাকলে দেখতে পায় নীল আকাশে নক্ষত্র হয়ে ফুটে আছে। কখনও চাঁদের আলোয় ভেসে বেড়ায় চিঠির বর্ণমালা। সুন্দর হস্তাক্ষরে বড় মনোরম সুষমায় কথাগুলো গেঁথে থাকে মালার মতো।

সে দেখতে পায় এক বড় নদী—দু' পাশে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ—মাঠের ওপারে সূর্যাস্ত হচ্ছে। পাখিরা উড়ে যায়। ছায়া পড়ে। ডানায় কুয়াশা লেগে ক্লান্ত হয়। আঁধার পেরিয়ে মাঠ এবং শস্যক্ষেত্র, সোনালী গমের খেত জ্যোৎস্নায় দুলছে। বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি চুপচাপ বসে থাকে শিষে। নীল খামের চিঠি পকেটে নিয়ে সে পার হয়ে যায় মাঠ। তাঁর হুঁশ নেই।

—কেউ ডাকে, শুনছ!

—কে! অ তুমি।

—অনেক রাত হল, ঘুমোতে যাও।

সন্তর্পণে সে উঠে দাঁড়ায়। ইজিচেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে দেয়। তারপর ক্লান্ত এক মানুষ যেন, তার যাওয়া দেখলে এমনই মনে হয়। জানালা খোলা, টেবিলে জল। রোজকার অভ্যাস, শোবার আগে একটু জল খাওয়া।

খাবার টেবিলে একদিন রুণুকে একা পেয়ে বলল, আচ্ছা রুণু, তোমার মনে হয় না কোথাও যাবার কথা ছিল, হল না।

—না, মনে হয় না।

—মনে হয় না, কেউ সারা জীবন তোমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে?

—না। আমার সব ত তোমরা।

—ছেলেরা শুনতে পাবে। আস্তে বল।

রুণু কেমন কাতর গলায় বলল, জানি আমার কপালে দুঃখ আছে। তুমি দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছ।

সে বলতে পারত বয়স বাড়লে মানুষের এটা হয়। সব থেকেও মনে হয় কি যেন তার নেই। তার কোথাও যাবার কথা ছিল। রুণু তোমারও। এই যে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাও—কার জন্য। তুমি কি মনে কর না সংসার তোমার কাছে খুব বেশি দাবি করছে। তোমার নিজস্ব পৃথিবীটাকে সে কখন হাঁ করে গিলে ফেলেছে। সে জানে রুণুর কাছে এ-সব কথার কোন অর্থ নেই। ছেলেরা মানুষ হলেই তার সব হয়ে যায়। মীনা-করা গ্লাসে ঠাণ্ডা জল রেখে দিতে পারলেই তার শান্তি। সে মনে মনে বলল তবু ইচ্ছে করে নদীর পারে কারো উষ্ণ হাত নিয়ে বসে থাকি। বড় মাঠে সূর্যাস্ত দেখি।

রুণু একদিন দেখল, মানুষটা টেবিল থেকে সব লেখা তুলে এক এক করে ছিঁড়ছে আর হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে।

—এই এই কী করছ?

—কিছু না।

—এমন সুন্দর লেখাটা ছিঁড়ে ফেললে।

—লেখা! কোথায়!

—ওমা, আমার কী হবে! ফোন তুলে কাউকে রুণু চাইল। তারপর বলল, দাদা দাদা!

সে বুঝতে পারল না, এতে এত অবাক হবার কী আছে? আর ছিঁড়ছি না। দাদাকে আর কিছু বলতে হবে না।

রুণু পাগলের মতো ছুটে এসে বলল, তোমার কী হয়েছে বল, বল। না হয় মাথা কুটে মরব। মানুষের যা কিছু দরকার সব আছে তোমার। কিছু নেই এমন মুখ করে বসে থাক কেন? বল বল। রুণু তাকে দু'হাতে ধরে ঝাঁকাচ্ছে।

—রুণু আমার কিছু হয় নি, সত্যি কিছু হয় নি বলছি। অযথা ভয় পাচ্ছ।

—আমি অযথা ভয় পাচ্ছি! আমি বুঝি না, আসলে আমার কাছে তোমার আর কিছু পাবার নেই।

— না না তা নয় রুণু। আমি কী করে বোঝাই। তুমি জানি এখন কাঁদতে বসবে। আমি পৃথিবীর বাড়তি লোক হয়ে যাচ্ছি।

—রাখ তোমার হেঁয়ালি কথা। আমি কিছু শুনব না। চল আজ আমরা ডাক-ঘর বইটা দেখে আসি।

—দেখা বই, আবার দেখবে!

—চল সারাদিন আজ ঘুরব।

—কোথায়?

—কেন এই শহরে। পার্কে। নদীর পাড়ে।

—এখানে নদী কোথায়?

রুণু না পেরে বলল, জীবনে তুমি পোড় খাওয়া মানুষ। তোমার ক'দিন থেকে এমন কী হল?

—ক'দিন থেকে হবে কেন। কবে থেকেই আমি এমন আছি। সবাই এমন থাকে। কেউ ভয় পায়, কেউ পায় না। ছেলেরা বড় হয়ে গেল। আমার আর করণীয় কিছু নেই রুণু।

ঠিক এ-সময় একদিন ভুজঙ্গ এল। ভুজঙ্গকে রুণুর খুব দরকার। ভুজঙ্গকে বলল, দেখুন আপনার বন্ধুটি কী হয়ে যাচ্ছে। কোথায় নাকি ওর যাবার কথা ছিল, যাওয়া হয় নি।

ভুজঙ্গ বলল, আজকাল ও কোন অনুষ্ঠানে কেন যেত চায় না বৌদি।

—কী করে বলব!

—কিছু বললেই এড়িয়ে যায়! বলে বয়েস হয়ে গেল—বাড়তি লোক।

—কী বয়েস হয়েছে বলুন। পঞ্চাশ হলে না হয় হত, তাও তো হয় নি।

—পঞ্চাশ হলেই কি মানুষ অর্থহীন হয়ে যায়। মানুষের ত সারা জীবন কাজ পড়ে থাকে।

ও-ঘরে তখন সে অফিসে যাবে বলে ঠিক-ঠাক হচ্ছে। ভুজঙ্গ বলল, এই যে বাবু আপনার একবার এ-ঘরে আসা হউক।

সে জানালায় উঁকি মেরে সামান্য হাসল। ভুজঙ্গকে ওর খুব পছন্দ। কবি মানুষ এবং পৃথিবীটার জন্য তার এখনও অনেক মায়া আছে।

সেই ভুজঙ্গ তাকে ডাকছে। সে পাশের ঘরটায় ঢুকে বলল, 'কী খবর!'

—খবর ত অনেক। এখনও বৌদি কিন্তু চা দেয় নি।

—দেবে। এই অসময়ে!

—ওরা এসেছিল। তোমাকে যেতে হবে।

—সেই তরুণ কবির মৃত্যু—না কি যেন স্মৃতিসভা।

তোমাকে ওরা আদিষ্ট থেকে তুলে নেবে না তোমার বাড়িতে সোজা চলে যাব।

—তাই হবে। বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবে।

ভুজঙ্গ বললে সে না করতে পারে না। কোথায় যেন ভুজঙ্গ তাকে বেঁধে ফেলেছে। সে বলল, সঙ্গে কাউকে আসতে হবে না।

ভুজঙ্গ চা খেয়ে চলে যাবে এমন সময় সহসা সে বলল, কী যেন নাম কবির। এত কবি যে নাম মনে রাখতে পারি না।

সে, নাম জানে না, সে জন্য ভুজঙ্গ দুঃখিত নয়। কারণ ভুজঙ্গ, তাকে চেনে।

একজন তরুণ কবির প্রতি এটা অপমানজনক কিছু সে মনে করে না। ভুজঙ্গ সিগারেট ধরিয়ে বলল, সত্যব্রত! ইদানীং খুব নামটাম করেছিল—ওর একটা লাইন তোমার ভাল লাগবে—বন্ধুর শ্মশানে স্ত্রী একা রক্ত জল করা দেহে এখনও নখের দাগ। ঘা অন্তিমে শেষ সূর্যাস্ত তবু থাকে জেগে, তুমি কার কে তোমার! হাড়ে মজ্জায় বাজে বরফের কুচি।

সে বলল, কী করে মারা গেল!

—অসুখে মারা গেল, তবে ঠিক অসুখ না। সুরমা বলল, ইদানীং সে পর্যাপ্ত মদ খেত। দু-তিন দিন বাড়ি ফিরত না। কলকাতায় এলে কখনও ওকে সুস্থ দেখি নি।

সে ফিক করে হাসল, তারপর দরজা খুলে বের হবার সময় বলল, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল—বেচারা!

সে জানে, সে সব ভুলে যেতে ভালবাসে। সে আবার বলল, সত্যব্রতের বয়স কী রকম, এই মানে...। ভুজঙ্গ এবার কেমন কৌতুকের সঙ্গে বলল, গল্প মাথায় আসছে বুঝি! যাচ্ছই ত। সব দেখতে পাবে।

সে সবই শেষ পর্যন্ত দেখতে পেল। স্টেশনে তরুণ কবিরা এসেছিল নিতে। ওরাও বলল, আপনার কথা খুব বলত সত্যব্রত।

বাড়িতে সুরমা বলল, আপনার কথা ও খুব বলত। সুরমাকে কুমারী মেয়ে মনে হচ্ছে। সত্যব্রত বলে একজন তার স্বামী ছিল, দেখে তাকে বোঝবার উপায় নেই।

স্কুলের একটা হলঘরে সত্যব্রতের ছবি রাখা। কিছু রজনীগন্ধা এবং ধূপদীপ যা না জ্বালালে আন্তরিকতার স্পর্শ থাকে না—সবই ছিল। কবিরা আজ সত্যব্রতের কবিতা আবৃত্তি করল। ভুজঙ্গ বলল, সুরমা আমরা চাই তুমিও আজ ওর কবিতা পাঠ করবে।

সুরমা বলল, না না। আমি পারব না।

একে একে সব তরুণ কবি বলল, সুরমাদি আজ অন্তত পড়ুন।

সুরমা বলল, পারব না।

শেষে সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকল। যে একমাত্র এখনও অনুরোধ করে নি। ভুজঙ্গ বলল, তুমি বললে হয়ত করতে পারে। ফিসফিস করে বলল, সত্যব্রতকে সুরমা ভালবেসেছিল, তার কবিতাকেও। ধন নয় মান নয় ছোট্ট এ-তরী। তরীখানি কবিতার। সুরমা কবিতা পাঠ না করলে সত্যব্রতের আত্মা শান্তি পাবে না। কবিতা ভালবেসে বিয়ে।

সুরমা সাদা জমিনের ওপর লতাপাতা আঁকা শাড়ি পরে আছে। কপাল সাদা, চুল স্যাম্পু করা। প্রসাধন করে নি কোন। নাক চাপা, সুন্দর মুখে তা মানিয়ে গেছে। হাল্কা ঠোঁট।

সে সহসা বলল, নীল খামে কেউ সব সময় চিঠি রেখে যায় সুরমা। সত্যব্রত তার খোঁজেই ছিল। খুঁজে পায় নি। রাস্তা হারিয়েছে। রাস্তা না হারালে কেউ আত্মহত্যা করে না।

সবাই স্তম্ভিত। শোকসভায় আত্মহত্যা কথাটা ভারি বেমানান।

ধূপ দীপ জ্বলছে। ধোঁয়ায় সত্যব্রতর প্রতিকৃতি কিছুটা আবছা। সুঠাম বলশালী যুবক—কবিতার মায়াবী ঘ্রাণ যেন চোখে সব সময় লেগে আছে। সত্যব্রতর ছবি দেখে সে অনুমান করল বয়স চল্লিশ হয়নি। সে বলল, সুরমা তোমাদের কত বছর আগে বিয়ে হয়েছিল?

ভুজঙ্গ ভারি অস্বস্তি বোধ করছে। সুরমার ইচ্ছা ছিল সত্যব্রতর শোকসভায় তিনি আসুন। সেই তিনি এখন অদ্ভুত কথা বলছেন। শোকসভায় যা একেবারেই বেমানান।

সে আবার বলল, সত্যব্রত কি তোমাকে কখনও বলত তার দূরে যাবার কথা আছে।

ভুজঙ্গ আর পারল না। অত্যন্ত কাছাকাছি বসে আছে—সে মুখ কানের কাছে নিয়ে বলল, এখন এ-সব কথার সময় নয়। তুমি ওকে সত্যব্রতের কবিতা পড়তে বল।

সে কিছুই শুনছে না। কবিতার তরুণ-তরুণীরা মুখ নিচু করে বসে আছে। সত্যব্রত তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে। ঠিক যেখানে সুরমা মুখ নিচু করে বসে আছে। সত্যব্রত আত্মহত্যা করেনি কথাটা বলতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। সত্যব্রত লিভারের অসুখে মরে গেছে—ক'দিন গলা দিয়ে সব রক্ত বের হয়ে এল—এবং সে-সময়ও সে দুটো লাইন লিখে রেখে গেছে—জর্জরিত আত্মা, ভিখারি নিদেনপক্ষে। সেবা শুশ্রূষার চেয়ে কাম্য দূরবর্তী অগ্নিশিখা, লাভা, গলিত শব এবং দুর্গন্ধ মিলে নারীর নাভিমূলে পড়ে আছি সখা—এ-সবে প্রমাণ হয় সত্যব্রত আত্মহত্যা করেনি। কঠিন পীড়ায় সে পৃথিবী ছেড়ে গেছে। মৃত্যুর কাছাকাছি খবরেও সে কবিতা হয়ে পৃথিবী জয় করতে চেয়েছিল।

সে বলল, সুরমা তুমি কি নীল খামে চিঠি পাও?

সুরমা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল। সে ফের কথাটা বুঝিয়ে দেবার জন্য বলল, এই যেমন যে টানে তুমি সত্যব্রতর কাছে চলে এসেছিলে সেই টানে আবার কোথাও ভেসে পড়তে কখনও ইচ্ছে হয় নি! সত্যি করে বল। এই শোকসভায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাক—আমরা যে যাই বলি, প্রত্যেকের কাছেই দিয়ে যায় কেউ নীল খামে চিঠি। কেউ পায়, কেউ পায় না। যে পায় না সে আত্মহত্যা করে।

সুরমা হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। তার শোকাশ্রু—যে জন্মায় যে বড় হয়, এবং পাশাপাশি হাঁটে তার জন্য। তার শোকাশ্রু—তাকে ছোঁয়া যায় না বলে ধরা যায় না বলে।

সুরমা মুখ নিচু করে রেখেছে। সুরমা কাঁদছে। ভুজঙ্গ ভাবল, আচ্ছা ঝামেলা হল। কী করে যে এমন অস্বস্তিকর বিষয় থেকে পার পাওয়া যায়। সে খুব দ্রুত বলে গেল বরং আমি আবার সত্যব্রতের কবিতা পড়ে শোনাই তোমাদের। তখনই ভুজঙ্গ টের পেল কাঁধে কার হাত। মনে হল, দেয়াল থেকে যেন সত্যব্রত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে—না না, আর না, অনেক বরফ কুচি হাড়ে মজ্জায় ঢুকে গেছে আর না। এই বরফ কুচি নিরন্তর মানুষের রক্তে খেলা করে বেড়ায়—কে আছ তোমরা বল, সুরমার মতো সুন্দরী নারীর টানে এখানে আসেনি? শোকসভা না কামুকের সভা। সে হাতটা সরাতে ভয় পাচ্ছিল, যেন সত্যি কোন কঙ্কালের স্পর্শ পাবে। কাঁধে চেপে বসে যাচ্ছে হাত। ভুজঙ্গ কিছুটা ভীত বিহ্বল চোখে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। সে বলছে, সুরমাকে আজ বলতে দাও। এখন আর কোন কবিতা আবৃত্তি নয়।

ভুজঙ্গ কেমন শিথিল হয়ে গেল। কবিতা শেষ পারানি নয়, নারীও শেষ পারানি নয়, কোন বৃক্ষের ছায়া কি মানুষের জন্য তবে অপেক্ষা করে থাকে! ভুজঙ্গও আর কোন কথা বলতে পারল না। এই শোকসভায় শুধু এখন ধূপ দীপ জ্বলছে। রজনীগন্ধার সৌরভ ছড়াচ্ছে। সবই কত পবিত্র। আবার সেই গলা গমগম করে বাজছে।

নীল খামের চিঠি কে দেয় সুরমা?

ভুজঙ্গ আর না বলে পারল না।—এই ওঠো! বুঝতেই পারছ ওর মাথার ঠিক নেই। আমরা উঠি।

সে বলল, ভুজঙ্গ তুমি আমাকে মাতাল ভাবলে!

মাতাল না। মাথায় কেউ তোমার পেরেক পুঁতে দিয়েছে।

সুরমা তখন মুখ তুলে বলছে, আমি খুব বড় কিছু একটা চেয়েছিলাম। সে বলল, বল বল, খুলে বল।

বড় বলতে এই নয় টাকা মান যশ। ঠিক এমন কিছু যা খুব কাছের হয়ে যায় না।

সে বলল, নারীর সঙ্গে দিন যাপন করলে পুরুষের আর থাকে কি! ভ্যাবলু হয়ে যেতে হয়।

ভুজঙ্গ কেমন ক্ষেপে গেল। অনেক নষ্টামী সহ্য করা গেছে। নারীর সঙ্গে দিন যাপনের কথা আসে কি করে! ভুজঙ্গ বলল, চু-উ-প। আর একটা কথাও নয়। তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাইল।

সুরমা দরজায় দাঁড়িয়ে বাধা দিল। বলল, ভুজঙ্গদা সত্যব্রত আত্মহত্যা করেছে। উনি ঠিকই বলেছেন। ওঁর কোন দোষ নেই। আমি যদি আর একটু ভালবাসতে পারতাম।

ভুজঙ্গ 'থ' হয়ে গেল। সুরমা আর কাউকে ভালবাসে তার জানা নেই। যখনই দেখেছে মনে হয়েছে সুরমা সত্যব্রত ছাড়া কিছু জানে না। ভুজঙ্গ বলল, এখন এ-সব কথা থাক। রাত হয়েছে। খাবার-দাবারের ব্যবস্থা কর।

সে কেমন উদাসীন চোখে মজা দেখে যাচ্ছে। সুরমা তাকে দেখল। বলল, কাছাকাছি থাকলে মানুষের মূল্য হারিয়ে যায়। ঠিক বোঝাতে পারছি না—যতটা মহার্ঘ ছিল সত্যব্রত বিয়ের আগে, ঠিক ততটাই, আর বলতে পারল না—কী যেন বড় রকমের ব্যর্থতায় ভেঙে পড়ছে সুরমা।

সে বলল, সেই। জানা হয়ে গেলে আর রহস্য কী! কবিতা বল, প্রেম বল, সবারই থাকে অভ্যন্তরে ডাকপিওন। যার হাতে সব সময় এক নীল খামে চিঠি। সত্যব্রত টের পেয়েছিল, তোমার কাছে কেউ নীল খামে চিঠি দিয়ে যায়। টের পেয়েছিল, নীল খামটা তার খালি।

সত্যব্রত দেয়ালে ঝুলে। ধূপ দীপ আর জ্বলছে না। তরুণ কবিরা, সুরমা ভুজঙ্গ মাথা নিচু করে রেখেছে। সত্যব্রত যেন ঠাট্টা করে বলছিল নারীদের সঙ্গে দেখা হোক কোন পান্থনিবাসে। একবারই। তারপর যেন জীবনে আর না হয়। সুরমা চলে যাচ্ছে করিডোর দিয়ে। পেছনে সে। কেন জানি মনে হল তার, এইখানেই সেই নদী, নারী এবং নির্জনতা।

ভুজঙ্গ বলল কোথায় যাচ্ছ?

সে না তাকিয়েই জবাব দিল, সুরমার কাছে। নদী, নারী এবং নির্জনতার কাছে।

হা অন্ন

সুমার মাঠে লোকটা দাঁড়িয়েছিল। চুল উস্কখুস্ক। গালে কতদিনকার বাসি দড়ি। চোখ কোটরাগত। তবু চোখে আগুন জ্বলে। যেন দাবদাহ, সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে ইচ্ছে যায়। পেটে হা অন্ন। জন্ম থেকেই সে হা-অন্নের দাস। পরনে ত্যানাকানি। পাশে রেল-লাইন, গাড়ি যায়। তার শব্দ কানে আসে। আর কত শব্দ সব, এই যেমন পাখিরা উড়ে যায়, দুন্দুভি বাজে, দূর থেকেই সে শুনতে পাচ্ছে, ভোটবাবুর জয় জয় হে। সে উবু হয়ে ধান খোঁটে। ধন্যি মা-লক্ষ্মীর সংসার। কাটতে ঝাড়তে দু-এক কণা বাড়তি শস্যদানা পড়ে থাকে। মা-লক্ষ্মীর ভাঁড়ার খালি থাকে না। কাজেই পৌষে সে এই সুমার মাঠে ঘুরে বেড়ায়। কোঁচড় খুঁটে খুঁটে শস্যদানা তোলে। সারাদিন যায়, বেলা পড়ে আসে। সাঁঝ লাগে। আকাশে নক্ষত্র ফোটে। তার নিচে একটা মানুষ, হা-অন্নের মানুষ টিপে টিপে দেখে শস্যদানা। সংসারে বড়ই অমূল্য ধন এরা। তার নিজের গতরে আর শক্তি নাই, সাহস নাই, সংসার অসার ভাবে। অথবা কোন এককালে জমি-জিরাত ছিল, গরুবাছুর ছিল, মেলা-পার্বণ ছিল, আর মনে থাকে না। কোন এক পূর্ণ-গ্রাস এসে একে একে সব তার হরণ করে নিল। চালাক-চতুর না হলে মনুষ্যকুলে এই লেখা থাকে। ধান্দাবাজ না হলে মনুষ্যকুলে এই লেখা থাকে। সে নিজেকেই বলল, হা কুমড়ার বাপ, পায়ে জোর নাই হে তোমার। তার দণ্ডটি তুলে সে খাড়া করে। বটতলায় হেঁটে না গেলে সে একটু আগুন পাবে না। শীতের হিমেল হাওয়ায় তলপেট পর্যন্ত শুকিয়ে উঠছে। সে হাঁটতে থাকল।

তখনও দুন্দুভি বাজে। সকাল থেকেই বাজছে। দুপুরেও বাজছে। কেবল বেইজে যাচ্ছে। ভোটবাবু আসবে। ভোটবাবুর স্যাঙ্গাতরা সারা রাস্তাটা নিশান পুঁতেছে। পতপত করে উড়ছিল। কলাগাছ পুঁতছে। কাগজের লাল নীল রঙের শিকল জড়ানো রাস্তা ঘাট। মহা ধুমধাম, প্রায় মচ্ছবের লাখান। সে বলল, 'জয় জয় দাওহে ভোটবাবুর। তেনার রাজত্বে দুঃখ কষ্ট দূর যাবে। তেনার রাজত্বে পেটভরে খাওয়া। লুচি মণ্ডা যত চাও। জয় জয় দাও হে।' সে চিৎকার করে বলল, 'হা কুমড়ার বাপ, জয় দিতে পার না। দাসবাবু, নগেনবাবু, অমর মহারাজ, বেণী দাস হুজুর, সবাই জয় দেবার জন্য সকাল থেকে সাজগোজ করে আছে। সাঁঝে ভোটবাবু নামবে। তিনি অনন্ত ঈশ্বর, তাঁর দয়ার অন্ত নেই। যখন দেয়ালে দেয়ালে এই সব লেখা, তখন কুমড়ার বাপ চোখ মেলে তাকায় আর দেখে, সম্বৎসর এই দেখে দেখে চোখ হায়রান হয়ে গেলছে। তার অবশিষ্ট কুঁড়ে ঘরটাকেও নোংরা করে গেছে ইবারে ভোটবাবুর লোক। সে লাঠি উঁচিয়ে বলেছিল, মারব এক ঘা ব্যাটারা। আমার পিঠে লিখে রাখছে আর আমারই দাঁড়ি উপড়ালছ'!

ওরা হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। একজন মান্যি গণ্যি মানুষ বলেছিল, 'দেশ থেকে শোষণের মুক্তি আসছে হে। পিঠ না পারলে কলজেটা দ্যাও। বড় সুসময় যায় হে!'

সে বলেছিল, 'নাই। চু চু, নাই। কলজে নাই। দিব কোথা থেকে।'

তখনই যেন কোন এক ছোকরা তীরবেগে ধেয়ে আসে।

বলে, 'সব ফোঁপড়া কুমড়ার বাক্স। বিশ্বাস করবা না। যে যায় লঙ্কায় সেই বাপ, রাবণ, তার পেটে একটা বিশাল গর্ত। নদীমাতৃক দেশ, গিলে খেতে ভালবাসে।'

তারপর সে কিছুদিন ছোকরার আর সাক্ষাৎ পায় নি। একদিন হিজলের বাঁধ অঞ্চলে তার সঙ্গে দেখা। বলেছিল, 'হে কুমড়ার বাপ, ভোট দিলা'।

'তা দিলাম বাপু।'

'দিলা ক্যান!'

'বাবু ভাইরা যে বুলল দিতে।'

'না দিলে কী হয়!'

'তাত জানি না বাপ!'

কিছু হয় না হে। যার যার সংসার। সংসার সামলাচ্ছে। তা ভাঙন থাকে না! ভাঙছে! তোমার কুমড়া কোথায় এখন! সে টাউনবাজ হয়ে যায় নি। সে আলগা হয়ে যায় নি; ভিন ঘরে উঠে যায় নি! তুমি বাপ হয়ে কিছু করতে পারলে।

—না বাপু কুমড়ার কথা কয়ো না। বুকে খিল ধরে। আমার দশটা না পাঁচটা, একটা কুমড়া তাও গোত্র-ছাড়া।

—তুমি অক্ষম মানুষ, তোমার ছেইলেই ভাবে না।

—তা কি বুলব। না ভাবলে কি বুলব। আমার আর ক'দিন!

—কেউ ভাবে না। সংসার। বুঝলা সংসার সামলাচ্ছে।

—কে সামলায়!

—ঐ যে দুন্দুভি বাজে!

—বাজছে!

—ওরা বাজিয়ে যায়, তুমি কুমড়ার বাপ শুনে যাও।

সহসা সে এবার দেখল, কি ভাবতে ভাবতে রেললাইনের ধার এসে গেছে। সুমার মাঠে এখন শীত ঝাপসা হয়ে নেমে এসেছে। উত্তুরে হাওয়ায় ত্যানাকানি উড়ছিল। রাস্তায় ইলেকট্রিকের বাতি দূরে। ভোটবাবুর বিজয় হে। এখনই গা থেকে কোথায় উড়ে যাচ্ছিল ত্যানাকানি। কি টাল! হি হি হি। সে তার দণ্ড ধরে কাঁপছিল। আর একটু যেতে পারলেই বটগাছতলা। সেখানে রাঢ় থেকে আসা ধান বোঝাই গাড়ি পড়ে আছে। মানুষে মোষে থিকথিক। টেমির আলো, খড়ের আগুন, সেদ্ধ ভাতের গন্ধ। যে যত ত্বরিতে সম্ভব হাঁটে। হাঁটতে গিয়ে আবার বুঝল, ত্যানাকানি হাওয়ায় বড়ই ক্ষেপোমো করছে। সামলে-সুমলে না হাঁটলে টাল লেগে মরে পড়ে থাকবে।

দুন্দুভি সেই ক্রমাগত বেজে চলছে। মানুষের মিছিল দূরের রাস্তায়। সাঁজের ট্রেনে ভোটবাবু নামবে। ইস্টিশনে গেলে, মানুষের ওম পাওয়া যাবে। পাশে ডানদিকে মড়ার খাটলি বয়ে নিয়ে যাবার পথটায় গেলেও আগুন পাওয়া যাবে। মানুষের ওমের চেয়ে ঐ আগুনটা তাকে টানছে বেশি। সে বোধ হয় এতটুকু পথ যেতে পারবে। সে বলল, ধন্যি মা বসুন্ধরা, তুই ছেইলে কোলে লইয়ে বইসে আছস। তুই বড়ই দেড় নজরে মা জননী। তোর কেউ খায়, কেউ খায় না। তোর সংসারে কত তাল বেতাল। কত ভৈরব ভৈরবী। আমার ত আর কিছু আহোস ছিল না মা, পেটে দুটো অন্নি, তাই তুই জুটালি না মা!

অন্ধকারে একটা প্রেতাত্মার মতো কেউ এগিয়ে আসতেই লোকগুলি ভয় পেয়ে গেল। রাস্তাটা ভাল না। পেল্লাই অশ্বত্থ গাছটা আরও খারাপ। কিন্তু রাতে নদী পার হওয়া যায় না বলে জেনেশুনেও গাড়োয়ানেরা এই অশ্বত্থতলায় মোষের কাঁধ থেকে গাড়ি নামিয়ে রাখে। খড়ের জাবদা দেয়। ইঁটের ওপর মেটে হাঁড়ি চড়িয়ে আলু সেদ্ধ ভাত। ধনেপাতা কুচি আর সরষের তেল দিয়ে রাতের আহার। এ-সময়টায় এরা আগুন জ্বেলে গোল হয়ে বসে থাকে। ঠাণ্ডায় টাল মেরে যাবার যোগাড়। আষ্টেপৃষ্ঠে শীত কাতর করে রাখে। তরাসে অগ্নিকুণ্ডে তৈরি করে রাখে। শীত এবং শয়তান সবাই আগুনকে বড় ভয় পায়। এসব কারণেই কেউ হাঁকল, আগুনের সামনে কে আসে?

কুমড়ার বাপ বলল, মুই বাপ। আগুনের পাশ থেকে একটা লোক ঠাঙ্গা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। —বলবাত!

কুমড়ার বাপ বলল, আগুন বড় টানে বাপ। তা কোন সড়কের পাড়ে ঘর?

—হুই রামানবাসপুর যেতি হবে।

কুমড়ার বাপ দণ্ডটা নিচে রেখে বলল।—ভাত হলছে ত!

লোকগুলির মধ্যে জ্যেষ্ঠটি বলল, তুমি একটা আবাল লোক হে। গন্ধ পালছ না।

—আর সে গন্ধ পালছি কোথায়! তা গন্ধ ছিল, নয়নজুরি চালের। নোনা মিশ্রি চালের। আঁখ জ্বাল দিছ কখনও। গুঁড়ের গন্ধ বাতাসে মঁ মঁ করে না। সেই গন্ধ আর নেই। দিন বড় খারাপ হলছে হে। সাবধানে থেক।

কুমড়ার বাপকে এরা চেনে। পথ চলতে, গাঁ গঞ্জে এমন অনেক লোকের সঙ্গে ধানী গাড়োয়ানদের দেখা হয়ে যায়। কুমড়ার বাপের বদমতলব আছে। গেল বছরেও উড্ডুটে মানুষটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসেছিল। আকালের কিসসা, পরীর জাদুকরী প্রভাব আর হিজলের বানবন্যার কথা বলে পাত পেতে বলেছিল, দাও দিখিনি, কি চালের কি গন্ধ দেখি। যেন গন্ধ শোঁকার জন্যই পাত পেতে বসা। যেন না দিলে অধম্ম হবে। পথে কু-প্রভাবে পড়ে যাবে। ধানী গাড়োয়ানরা রাত বিরেতে পথ চলতি বিশ্বাস অবিশ্বাসে ভোগে। লোকটা কোন জাদু টোনা করে শেষে না মোষের ঘাড় ভেঙে দেয়। ফলে ঐ থেকে ভাগ করতে গিয়ে দেখেছিল লোকটা একাই চারজনের ভাত জঠরে ঠেলে দিয়েছিল। বলেছিল, খ্যালাম। বড়ই সুস্বাদু অন্ন। অন্নের দাস মানুষ। অন্ন ঈশ্বরের শামিল। তার অবহেলা দেখাতে নাই। লোকটার মুখে খাবার পর অমৃত ঝরছিল।

আবার এই জাড়জরাতে লোকটার উদয়। যেন রেললাইনের হুঁই উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে দেখে—ধানী গাড়োয়ানরা হিজলের মাঠ ভেঙে আসছে কি না! দণ্ডে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে। আসে, পথ পার হয়ে যায়, নদী পার হয়ে যায়। থামে না। না থামলে আগুন জ্বলে না অশ্বত্থের আন্ধারে। আর জ্বললেই দণ্ডে ভর করে উদয়—মুই কুমড়ার বাপ। সাকিন নাই, নিবাস নাই, পরকিতির লীলা খেলায় মত্ত হয়ে আছি বাপ। দাও দুটো দেখিনি, কি গন্ধ, কেমন গন্ধ দেখি।

এবার কনিষ্ঠটি বলল, ভাত হবে না, ভাগ।

—ভাত রোচে না বাপ! আগুন লাগে। আগুনে সেঁইধে যেতে ইচ্ছে করে। তা একটুখুনি আগুন। হা হা টাল। বড় টাল হে। বলেই লোকটা হুড়মুড় করে ভাতের আগুনে হাত ঠেলে দিয়ে কাতর গলায় বলল, দুন্দুভির আত্তয়াজ বড় গুম গুমায়।

সত্যি গুমগুম করছিল। যেন প্লাবন আসছে। মানুষের মিছিল। বিজয় মিছিল। পাকা সড়কে যানবাহন ভ্যাপো ভ্যাপো করছে। ইস্টিশনে গিজগিজ করছে—ভোটবাবুর বিজয় হে। কুমড়ার বাপ হাত দিচ্ছে আগুনে। হাত ঝলসে যায় না। মরা আগুন। কুমড়ার বাপ হামলে পড়ল এখানে সেখানে। খড়কুটো তুলে আনছে। আর নিক্ষেপ করছে। বড় টাল। শরীর টাল খাচ্ছে। তবু জাড়জরা থেকে বাঁচার বড় শখ। বছর যায়! বয়স বাড়ে। হে পারে নদীর জলে কুম্ভীর ভাইস্যা আসে। ভোটবাবুর জয় হে।

জ্যেষ্ঠ বলল, অ কুমড়ার বাপ ভোটবাবুরে দেখতে যালছ না!

কুমড়ার বাপ মুখটা তুলে হাঁ করে থাকল। রোঁয়া ওঠা শরীর। ছেঁড়া ত্যানাকানিতে হাত পা অসাড়। গায়ে পায়ে বদহজমের মত ঠাণ্ডা লেগে চোখ মুখ ফোলা। সে বলল, বড় সুঘ্রাণ হে। দাও দিকিনি গন্ধ শুঁকি। কি ধানের কোন চাল বলে দিলছি।

প্যাঁ করে কি যেন বাজল। ট্রেন থেকে চাগা চোপকান পরে কে নামছে একজন। হল্লা হচ্ছে। দু সাল পাঁচ সাল যায় আর হল্লা ওঠে। জমি রুখাই থাকে, কুমড়ার বাপের কাছে ভাতের ঘ্রাণের চেয়ে বড় ঘ্রাণ আর কিছু নাই। সে ফের বলল, কানে যেইছে না।

এবারে গাড়োয়ানদের জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সবাই বলে ফেলল, ও তোমারে চিনাতে হবে না। ভাগ।

কুমড়ার বাপ বড় বিস্ময়ে বলল, মা জননীর সন্তান আমি। জমি জিরেত থেইকে অন্ন তুলে নিয়ে যাবি, জননীর ছেইলেটারে অন্ন দিবি নে!

বড় সামিয়ানার নিচে ভোটবাবু। সাদা চাদর বিছানো। ফুলের মালা গলায়। রজনীগন্ধার ঝাড় ফুলদানিতে। মাইকে কে একজন হ্যালো হ্যালো করছে। বলছে জয় দিন!

জ্যেষ্ঠটি বলল, জয় দাও। শোনছ না জয় দিতে বুলছে।

সে বলল, জয় দিলে খেতে দিলছ?

সবাই বলল, দাও না।

—এই দিলম। বলে সে ত্যানাকানি যা ছিল অঙ্গে উত্তরের হিমেল হাওয়ায় ছুঁড়ে দিল। ফের বলল, এই দিলম। সে তার দণ্ড ধরে ঘুরাতে থাকল। রক্ত বড় সঞ্চালন জীব।

জ্যেষ্ঠ বলল, মরবে শালা। বলে সে ত্যানাকানি তুলে এনে জড়িয়ে দিল গায়। ওদের কষ্ট হল। মনুষ্য জাতির বড় গোলমেলে রহস্য—যার লতাপাতা আগাছায় বনজঙ্গলে ভরা। গাছের নিচে গাছ, তার নিচে কচু কদু আগাছার ঝাড়। রোদ যে পায়, সে বাড়ে। যে পায় না, সে মরে। জ্যেষ্ঠটির মনে সুমার মনুষ্য সমসারের কথা ভেবে দয়া উপজিল। বলল, খাও হে কুমড়ার বাপ। ত্যানাকানি পরেই খাও। তারপর জয় দিও, ভোটবাবুরে জয় দিও। তিনার দয়াতেই তোমার অঙ্গে শেষে হাড় কখানা আছে। জয় না দিলে বাকি ক'দিনে, তাও যাবে। তার আগে শুধু জয় দিয়ে যাও হে।

কুমড়ার বাপ গোগ্রাসে খালছিল। খাচ্ছিল না। খাচ্ছিল শব্দটা বাবুভাইদের কথা। কুমড়ার বাপ খালছে। খাচ্ছে না। খালছে। কুমড়ার বাপ খেতে খেতেই বলল, অন্ন বড়ই সুস্বাদু। তারে অবহেলা করতে নাই। অন্ন মানুষের ঈশ্বর। তখন মাইকে ফুলকো লুচির মতো গলার আওয়াজ ভেসে বেড়াচ্ছে। কুমড়ার বাপ তখনও খালছে। মাঝে মাঝে বলছে হ হ। অন্নে বড়ই সুঘ্রাণ। তারে কেড়ে লিলে ঝাড়ে বাঁশ।

গান বাজনা আলো আরও কত কি ইস্কুলের মাঠে তখন। সামিয়ানার নিচে ভিড় ভারাক্কা। মঞ্চে কোলাহল। মাইকে বাজনা। উত্তুরে হাওয়া আরও হিমেল। হিজলের মাঠে জোনাকিরা উড়ছে না। নক্ষত্রের চরাচরে এক জীব কুমড়ার বাপ। অশ্বত্থের নিচে ধানী গাড়োয়ান। কলাপাতায় গরম ভাপের মধ্যে সাদা সরু তীক্ষ্ণ সব অমূল্য বীজ। কুমড়ার বাপ তাকিয়েই আছে। খাওয়ার কথা মনে আসছে না। হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে দিয়ে কি যেন দেখছে। জ্যেষ্ঠটি ঠ্যালা দিয়ে বলল, ও-কুমড়ার বাপ চোখ নড়ছে না কেন! ও ও কুমড়ার বাপ! হা আবাল আমার। খেতে খেতে আটকে গেছে। শুকনো নাড়ি। ভাত নামছে না। কুমড়ার বাপ বুকে হাত দিতে চাইল। পারছে না। কেমন ঝুঁকে তারপর হাত পা বিছিয়ে পড়ে গেল। ঢেকুর তুলল দুটো।

—হায় আবাল মানুষরে খেতে গিয়ে মরে গেলা!

সামিয়ানার নিচে তখন ভাষণ। ফুলকো লুচির মতো ভাষণ আকাশে বাতাসে ওড়াউড়ি করছে।

বুলুর শেষ লুডোখেলা

সিঁড়িতে পা দিতেই অমলেশ টের পেল বিজু এসেছে। বিজুর স্লিপার বারান্দার এক পাশে, ঠিক দরজার মুখে এবং চৌকাঠের বাঁদিক ঘেঁষে থাকে—কারণ এটা স্বভাব বিজুর, সে এলেই তার হলুদ রঙের স্লিপার দরজার বাঁদিক ঘেঁষে রাখবে। অমলেশ দেখল এপাশে বিজুর হলুদ রঙের স্লিপার। দড়িতে ওর মীর্জাপুরি শাড়ি। এ-সব দেখলেই অমলেশ যেন ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে ওঠে।

এ-সপ্তাহে বিজুর আসার কথা নয়। বিজ আসছে সপ্তাহে আসবে এমন কথা ছিল। চিঠিতেও তেমন লিখেছে। অথচ সহসা এই চলে আসা, এলেই একটা বিস্ময় নিয়ত খেলা করে বেড়ায়, যেন বিজু তার জন্য গ্রাম মাঠ থেকে নানারকমের ফসল সংগ্রহ করে এনেছে। ছেলে দুটো ঘুমিয়ে পড়লেই সে তার সব সংগ্রহ খুলে দেখাবে।

যা হয় অমলেশের—ওর তখন রা-রা করে গান গাইতে ইচ্ছা হয়। গলা জড়িয়ে চুমু খেতে ইচ্ছা হয়। অথচ সে এখন কিছুই পারছে না। যতক্ষণ না টুলু বুলু ঘুমোয়, ততক্ষণ সে চুপচাপ, যেন তার আর তর সয় না, সে যে কি করবে ভেবে পায় না, রান্নার লোকটাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে সে বিজুর পিছু পিছু তখন কেবল ঘুরে বেড়ায়।

অমলেশ বারান্দার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল। বিজুর গলা পাওয়া যায় কিনা শোনার চেষ্টা করল। ভিতরে কোন সাড়া শব্দ নেই।

অথচ বিজু এলে এমনটা হয় না। চারপাশের যা কিছু অগোছালো, যেমন টুলু বুলুর টেবিল, তার টেবিল, নোংরা ঘর-দোর, বিজু এলেই সব পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখে। যে কদিন থাকে ঘর-দোর কি তকতকে ঝকঝকে! আর বিজু চলে গেলেই সংসার বড় অগোছালো হয়ে যায়। ওর পিয়ন এসে দুই ছেলেকে স্কুলে রেখে আসে। বিকেলে সে বাড়ি এসে দুই ছেলেকে নিয়ে পার্কে যায় এবং রাত্রিতে ফিরে এসে ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়লে সে একটা ক্রাইম নভেলে মুখ ডুবিয়ে পড়ে থাকে। ঘর-দোর সাফ সুতরোর ব্যাপারে সে কেমন উদাসীন হয়ে যায় তখন।

আর বিজু এসেই ঘর-দোরের অবস্থা দেখে দু পা ছড়িয়ে ছেলে মানুষের মতো কাঁদতে বসে। তোমাদের এত বলেও পারি না। লোকজন এলে কি ভাবে!

অমলেশের তখন সত্যি হুঁশ হয়—ওদের পড়ার টেবিলটা সত্যি অগোছালো। যেখানে যা থাকবার কথা সেখানে তা নেই। কোন বই টেবিলের নীচে, কোনটা খাটের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। পড়ার পর তুলে রাখার কথা ওদের মনে থাকছে না। বুড়ো মাসির পক্ষে এত দেখাশুনো করা কষ্ট। বিজু চলে গেলে সংসারের সবাই কেমন বাউণ্ডুলে হয়ে যায়। আলনাতে জামা-কাপড় ভাঁজ করে রাখে না কেউ। কোন কোন দিন অমলেশ ভয়ে ভয়ে নিজের টেবিলটার দিকে তাকাতে পারে না পর্যন্ত। বিজু এবার তাকে নিয়ে পড়বে। সে যেন ভয়ে ভয়েই তখন কতকটা নিজের টেবিলের বইপত্র, লেখার প্যাড সব সাজিয়ে রাখতে গেলে দেখতে পায়, বিজু তেড়ে আসছে।—হয়েছে থাক। আর কাজ দেখাতে হবে না, যতক্ষণ আছি করে যাব।

একবার অমলেশের সঙ্গে বিজুর এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। বিজু চলে গেলে অমলেশ এবং টুলু বুলু মিলে খুব সাবধানে থাকল। টেবিল, আলনা, বইপত্র যেখানে যা থাকার রেখে দিল। যেদিন আসবে সেদিন সকালে আর একবার গুছিয়ে রাখল সব।

আর বিজু এসেই দেখল, একেবারে চারপাশটা ঝকমক করছে। কোথায় সে এসব দেখে খুশী হবে, তা না, সে ভয়ঙ্কর দুঃখী মানুষের মতো মুখ করে ফেলল। সে যেভাবে সব রেখে গেছে সব প্রায় তেমনি গুছানো।

বিজুর মনটা টনটন করে উঠল। সে এতটা শাস্তি আশা করেনি। সে সারাক্ষণ কাজকর্ম ছাড়া বাঁচে না। কাজকর্ম করতে করতে একটু বচসা করা ওর স্বভাব। দুই দামাল ছেলে, ঠিক দুজন নয়, ওর কাছে ওরা তিনজন, কারণ সে এ-সময় কখনও অমলেশকে স্বামী বলে ভাবতে পারে না, যেন ঘরে সে তিন দামাল ছেলে রেখে গেছে—ওরা হুটোপুটি করে সব অগোছালো করে না রাখলে তার হাতে কাজ থাকে না—সে চুপচাপ বসে থাকলে মনে হয় বেড়াতে এসেছে এখানে, সে অমলেশের কাছে বেড়াতে এসেছে। সে এ-সংসারের কেউ নয়।

বিজু এসেই সে রাত্রে আর অমলেশের সঙ্গে কথা বলেনি।

—কি ব্যাপার! অমলেশ প্রশ্ন করেছিল। এসেই একেবারে মুখ গোমড়া করে বসে থাকলো।

কোন কথা না বলে বিজু বাথরুমে চলে গিয়েছিল। সে ঘাড়ে গলায় জল দিয়েছিল। অন্যদিন সে যেমন এসেই আয়নায় মুখ দেখে সেদিন সে তাও দেখেনি। হাত-পা ধুয়ে একটা চাদর গায়ে সে পাশ ফিরে শুয়ে পড়েছিল।

অমলেশ বলেছিল, আরে হয়েছে কি তোমার?

বিজু জবাব না দিলে অমলেশ কেমন উদবিগ্ন গলায় বলেছিল, তোমার শরীর খারাপ! ডাক্তার ডাকব।

বিজু আর চুপ করে থাকতে পারেনি। সে ফেটে পড়ল।—আহা, বাবুদের চোখে ঘুম নেই। বাস ট্রেন করে এতদূরে আসা—বিজুর কি কষ্ট! সব কাজ ওর আমরা করে রাখি! বিজু এবার উঠে বসল। সে তার বড় ছেলেকে ডাকল, এই টুলু তোরা সবাই মিলে যে খুব সংসারী হয়েছিস!

ঠিক আছে আর কিছু করব না। তুমি এসে বোকার মতো খাটবে।

বিজুর একটা অদ্ভুত অভিমান আছে ভিতরে। কিছু কথা কাটাকাটি হলেই বিজু বলে, সংসার থেকে তাকে ইচ্ছা করে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, যেন ইচ্ছা করলেই অমলেশ তাকে এই বড় শহরে নিয়ে আসতে পারে। আনে না, অমলেশের ইচ্ছা নেই তাকে নিয়ে আসার। অমলেশের প্রভাবশালী বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই। একটু অনুরোধ করলে কে তেমন মানুষ আছে তাকে অবহেলা দেখায়।

অমলেশ তখন চুপচাপ থাকে। বিজু রেগে গেলে ভীষণ ভয় করে তার। সে কিছুতেই বোঝাতে পারে না, অনেক চেষ্টা করছে কিন্তু সে কিছু করতে পারছে না। সুতরাং আজ এসেই আবার বিজুর তেমন কিছু হল কিনা—কারণ সব চুপচাপ, টুলু বুলুর পর্যন্ত সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, অমলেশের চোখে-মুখে অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠছে। সে ঘরে ঢুকে দেখল পর্দাটা নড়ছে হাওয়ায়। এ-ঘরে কেউ নেই। সে দেখল ক্যালেণ্ডারে এসেই বিজু একটা দাগ দিয়েছে, আবার সে কবে আসতে পারবে তার নির্দেশ। সে আর মুহূর্ত দেরি করতে পারল না। পর্দা ঠেলে শোবার ঘরে ঢুকতেই দেখল, নিবিষ্টমনে মা এবং দুই ছেলেতে কি যেন করছে। টেবিলের উপর চেয়ার রেখেছে বিজু। টুলু বুলু চুপচাপ টেবিলের পাশে। টুলু দু'হাতের ফাঁকে কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছে এবং বিজু চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে টুলুর হাত থেকে সেটা নেবার সময় দেখল পিছনে অমলেশ। যেন ধরা পড়ে গেছে এমন সংকোচে সে তাড়াতাড়ি ওটা উপরে রেখে দেবার সময় শুনল অমলেশ বলছে পড়ে গেলে বুড়ো হাড় জোড়া লাগবে না। যেন এসব কথা বিজুকে বলছে না, এই ঘরের দেয়াল, খাট আলনা এসবের উদ্দেশে বলছে।

বিজু কোন উত্তর করছে না দেখে সে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, নাগাল পাচ্ছ না। দাও আমি রেখে দিচ্ছি।

বিজু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, দেখো যেন পড়ে না যায়।

—এত মায়া তোমার!

অমলেশ যে এমন একটা খোঁচা দেবে সে যেন জানত। কারণ চড়াই পাখি দুটো যখন প্রথম এ দেয়ালে এসে বাসা বাঁধে, বিজুর কি রাগ। সে এসেই যতবার দেখেছে মেঝেতে চড়াই হেগেমুতে একেবারে যাচ্ছেতাই করে রেখেছে, তখন সে যে কতবার রাগে দুঃখে পাখি দুটোকে তেড়ে গেছে, আর বলিহারি যাই

পাখি দুটোও কি বেহায়া। বিজুকে সারা ঘর ছুটিয়ে মেরেছে, কিন্তু ঘর ওরা ছেড়ে দেয়নি। বিজু প্রতিবার এসেই চড়াই দুটোর বাসা ভেঙে দিত। আর বিজু চলে গেলেই চড়াই দুটো আবার বাসা বানিয়ে নিবিষ্টমনে সুখে-স্বচ্ছন্দে এ-ঘরে উড়ে বেড়াত।

আর এ ব্যাপারেও বিজু অমলেশকে দায়ী করত। এরই কাজ। যেন অমলেশ শলাপরামর্শ করে বিজুকে এভাবে বার বার জব্দ করছে পাখিদের দিয়ে। সুতরাং বিজু ভেবেছিল, চড়াইর ছানাটাকে অমলেশ আসার আগে আগেই তুলে রাখতে হবে। যাতে অমলেশের কাছে সে ধরা না পড়ে। এবং বিজু এবারই প্রথম বাড়ি এসে সব সাফসুতরো করার সঙ্গে পাখিটার বাসা ভেঙে দেয়নি। সে বরং দেখল পাখির একটা ছোট্ট বাচ্চা নীচে পড়ে আছে। বুলু খেলতে যায়নি। সে সারাক্ষণ বাচ্চাটাকে পাহারা দিয়েছে। কারণ পাশের ফ্ল্যাটের বেড়ালটা ওৎ পেতে আছে, কখন বুলু উঠে যাবে এবং সে খপ করে গিলে খাবে।

বিজু যখন এসে দেখল বুলু খেলতে বের হয়নি, যখন দেখল বুলু বলছে দ্যাখো মা বাচ্চাটা এখানে পড়ে আছে, আমি সারাক্ষণ বসে আছি, বাবা এলে বলব তুলে দিতে তখন বিজুর এই ঘরসংসারের মত বাচ্চাটার উপর চড়াই পাখি দুটোর উপর কেমন মায়া পড়ে গেল!

বিজু টেবিলটার একপাশে দাঁড়িয়েছিল। অমলেশ কতটা যত্ন নিয়ে পাখির ছানাটাকে উপরে রাখছে লক্ষ্য করছে। এতক্ষণ ওরা যা গোপন করতে চেয়েছিল, কারণ বুলু যেন ছানাটাকে রেখে দেবার ভিতর টের পেয়েছিল মা সংগোপনে কাজটা করে ফেলতে চায়। সেও মার মতো বাবা এলে একেবারে সব চাপতে চেয়েছিল। মা এলেই বুলু কেন জানি মাঝে মাঝে আজকাল বাবাকে প্রতিপক্ষ ভাবে। অথবা সে যদি বলে দিত, বাবা পাখির ছানাটা পড়ে গেছে, মা তুলে রাখছে, তবে যেন মা বলবে, তুমি বলে দিলে কেন বুলু? যা রেগে যাবে। রেগে গেলেই মা তাকে পাশে নিয়ে শোবে না। বলবে বুলু আমি আজ বাবার সঙ্গে শোব। তোমার সঙ্গে শোব না। সুতরাং বুলু এতক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে মার এই কাজ সমর্থন করে যাচ্ছিল। সে বাবাকে দেখেও কিছু বলেনি। মা-কে কেন্দ্র করে বুলুর প্রায়ই তার বাবাকে প্রতিপক্ষ মনে হয়। প্রায় বছর হতে চলল, মা তাকে এখানে রেখে গেছে। আগে বুলু থাকত মার কাছে। কিন্তু এখন সে বড় হয়েছে। তাকে পড়াশোনা করতে হবে। বুলু এখন বাবার কাছে থাকে। বুলু এবং টুলু এক বিছানায়—বাবার আলাদা বিছানা, মা এলে কার সঙ্গে শোবে, ওদের সঙ্গে না বাবার সঙ্গে—বুলুর ঘুম আসে না, মা যতক্ষণ না ওকে পাশে নিয়ে শোবে ততক্ষণ সে ঘুমোবে না।

বিজু এলেই বলবে বুলু, মা তুমি কার সঙ্গে শোবে?

—তোমার সঙ্গে।

কিন্তু বুলু টের পায় যেন গভীর রাতে বাবা তার প্রতিপক্ষ। তখন চোখে তার ঘুম আসে না। পাশে হাতড়ায়। মা নেই। মা বাবার কাছে পালিয়ে বনবাসে চলে গেছে। সে তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

তখন অমলেশেরও কেন জানি মনে হয়, ছেলে তার প্রতিপক্ষ। সে বিরক্ত এবং অস্বস্তিতে বলে ওঠে, দ্যাখো তোমার ছেলের কাণ্ড। যেন ঠেলে ফেলে দিতে চায় বিজুকে। বিজুকে সে তুলে দিয়ে নিজে একটা নীল রঙের আলো জ্বেলে বসে থাকে। আর তার ঘুম আসে না। সে তখন একটা ট্রেনের শব্দ পায়। যেন কোন দূরবর্তী স্টেশনে একটা ট্রেন আটকে গেছে। বার বার ট্রেনটা হুইসল বাজাচ্ছে।

মাঝে মাঝে অমলেশ খুব ছেলেমানুষের মতো বুলুকে বলবে, তোমার মা কতদূর থেকে আসেন। তোমাদের পাশে শুলে ওর ঘুম আসে না। তোমরা ঘুমের ভিতর মাকে বড় বেশি হাত পা ছুঁড়ে মার। তখন বুলু যেন কিছুই শুনতে পায় না। কেবল ওর মনে হয় সবুজ বনের ভিতর একটা লাল রঙের পাখি তাকে উড়ে উড়ে কোথাও চলে যেতে বলছে। সে মাকে ছেড়ে দিতে ভয় পায়। অথচ অমলেশ, বিজুর এমন সুন্দর শরীর, মসৃণ ঘাড় এবং কোমল মুখ দেখে আর স্থির থাবতে পারে না।

অমলেশ বলল, বাচ্চাটার ডান গজিয়েছে। রাখছি ঠিক, কিন্তু বাচ্চাটা আবার উড়ে পালাবে।

—না পালাবে না। তুমি রাখ। বিজু গোড়ালিতে উঁকি দিয়ে দেখল ঠিকমতো অমলেশ রাখছে কি না।—ওটা ওর বাপের কাণ্ড।

—তুমি জানো খুব। অমলেশ বলল।

—ঠিক জানি। বাপটা ঠুকরে ফেলে দিয়েছে।

—ফেলে দিয়েছে ত ভাল করেছে। কতদিন আর খাওয়াবে। বাপটা চাইছে, আর কতদিন! এবার উড়ে খাওগে।

—ভাল করে উড়তে পারছে কই!

—ঠেলে ফেলে না দিলে কেউ উড়তে চায় না।

—বাজে বকো না। বলে সে অমলেশের চেয়ারটা শক্ত করে ধরল।

অমলেশ এবার ভয় দেখাবার জন্য বলল, বরং কাল পাখিটাকে পাতাবাহারের গাছটায় রেখে আসব। সে ঠিক নিজের মতো উড়ে চলে যাবে কোথাও।

বুলু এবং বিজু একসঙ্গে প্রায় কান্না জুড়ে দেবার মতো।—তুমি কি পাগল। ভাল করে উড়তে শিখল না এখনও, ওটাকে তুমি ছেড়ে দিয়ে আসবে!

—বিজু বাচ্চাটা উড়বার জন্য হাতের মুঠোয় পাখা ঝাপটাচ্ছে। ছেড়ে দেব নাকি! বলে সে বাসাটার ভিতর উঁকি দিল, দেখল, মেয়ে চড়াইটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। এতটুকু ভয় পাচ্ছে না। কিংবা উড়ে যাচ্ছে না। সে এবার বিজুর দিকে তাকাল। একটা শর্তে সে পাখিটাকে তুলে দেবে এবং এখন বিজু চোখের দৃষ্টিতে শর্তটা যেন পড়তে পারছে।

বিজু বুঝতে পেরে বলল, সে হবে।

অমলেশ বলল, হবে বল ঠিক, কিন্তু কিছু হয় না। শুয়ে পড়লেই ভোঁসভোঁস করে ঘুমাও।

বিজু চোখ টিপল। টুলু সব বুঝতে পারবে এমন একটা মুখ করে বাসাটার দিকে তাকাল।

হাতের মুঠোয় পাখিটা রেখে এবার অমলেশ বুলুকে বলল, বুলু তুমি বড় হয়েছ।

বুলু বাবার কথায় মার দিকে তাকাল। সে বড় হয়েছে কি না মা ঠিক বলতে পারবে।

অমলেশের মাথায় জিদ চড়ে গেছে। সে বলল, তুমি ক্লাস থ্রিতে পড়। ক্লাস থ্রিতে পড়লে মার সঙ্গে আর শুতে নেই।

বুলুর চোখ ছলছল করে উঠল। সে এখন কিছু বলবে না, অথচ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে। বিজুর মনটা তখন ভারি হয়ে আসে। সে যে কার সঙ্গে শোবে ঠিক যেন এ-মুহূর্তে বুঝতে পারে না। কারণ সে সারাক্ষণ ট্রেনে একটা ফসলের মাঠ দেখেছে। এক পাশে দেখেছে একটা সাদা রঙের বাড়ি। বড় একটা জানালা খুললে সে দেখেছে দুই ছেলের হাত ধরে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে। তার ভালবাসার বৌ আসছে ফসলের মাঠ ভেঙে। মানুষটার চোখমুখ দেখে বিজু নিজেও স্থির থাকতে পারে না তখন।

বিজু বলল, রাখো। দাঁড়িয়ে আছ কেন?

অমলেশ বিজুর কথা যেন শুনতে পেল না। সে বুলুকে ফের বলল, কি রেখে দেব, না ছেড়ে দিয়ে আসব?

—রেখে দাও বাবা।

অমলেশ এখন বুলুকে ভয় দেখাতে পারলে যেন বাঁচে। ভয়, এই যে পাখির ছানা হাতের ভিতর, ছানা ধরে আছি, এখন ছেড়ে দিয়ে আসব তাকে। জঙ্গলে সে উড়ে গেলে, তুমি বুলু কাঁদবে। অথবা অমলেশ বলবে কি না ভাবল, বুলু এস আজ আমরা আবার বাজিতে বসি।

বুলু আবার বলল, বাবা তুমি রেখে দাও পাখিটা। বুলু, মা কার সঙ্গে শোবে এখনও বলছে না। এবার অমলেশ শেষবারের মতো তার সেই খেলাটার কথায় এল। বলল, ঠিক আছে তবে লটারি হবে।

বুলু অন্য দিন এমন শুনে হাত পা ছুঁড়ে বলত, ঠিক আছে। সে বাবার সঙ্গে লুডো খেলতে বসবে। যে জিতবে সেই মাকে পাবে। ওর মুখ খুশীতে ভরে উঠত।

ওরা খেলতে থাকল। টেবিলের ও-পাশে দাদা, এ-পাশে মা আর মুখোমুখি সে এবং তার বাবা। ওরা দুই প্রতিপক্ষ। তখন সেই নীল রঙের আলোটা জ্বেলে দেওয়া হয় ঘরে। জানালাটা খোলা থাকে। ঠাণ্ডা বাতাস এলে বিজু কোন কোনদিন জানালাটা বন্ধ করে দেয়। কি করুণ দেখায়, তখন অমলেশের মুখ। খেলার সময় সে জোরে জোরে হাঁকে ছক্কা পাঞ্জা। সে তার বয়সের কথা ভুলে যায়। ভিতরে ভিতরে মনে হয় শীতে কাঁপছে অমলেশ। বিজু তখন একটা চাদর এনে শরীর ঢেকে দেয় অমলেশের এবং গোপনে হাতে চাপ দেয়। যেন বলার ইচ্ছা, তুমি খেলতে খেলতে এমন ছেলেমানুষের মতো হয়ে যাও কেন! বুলু জিতছে, জিতুক না। বুলু ঘুমোলে আমি ঠিক তোমার কাছে চলে আসব।

সকলের আগে বুলু টেবিলে এসে বসেছে আজ। সে লুডোর ছক খুলে আজ নিজেই গুটি সাজিয়েছিল। মা এবং বাবা খাচ্ছে। টুলু হাত মুখ মুছে তৈরি হচ্ছিল। কারণ সে বাবার পক্ষে চেঁচায়। মা চেঁচায় বুলুর পক্ষে। হারার মুখে টুলু বাবাকে উৎসাহ দেবে। ছক্কা পাঞ্জা, যেন ওরা পাশা খেলায় বসবে এবার। যেন কুরু পাণ্ডবের সভায় পণ রেখে খেলা হচ্ছে, ভালবাসার পণ, মা কাকে বেশি ভালবাসে, বাবাকে না তাকে। মা এসে বুলুর পাশে সুন্দর শাড়ি পরে বসবে। পাট ভাঙা শাড়ি। মুখে পাউডার। কপালে বড় টিপ। মা তার মাথায় হাত রাখলে সে কেমন সাহস পায়। কেউ তাকে হারাতে পারবে না এমন মনে হয়।

বিজু বলেছিল, প্রথম দান বুলুর।

টুলু বলল, সে কেন হবে। রোজ রোজ বুলু আগে খেলবে কেন! প্রথম দান বাবার।

—আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার। বলে বিজু অমলেশের দিকে তাকাল।

অমলেশ ছকের উপর চেলে দিল—ছক্কা!

বিজু দেখল চৌকো উঠেছে। সে বলল, ফুঃ।

বুলু খুব সন্তর্পণে চেলে দেখল পাঞ্জা উঠেছে। আবার পোয়া। ছক্কা পড়ছে না। গুটি বের হচ্ছে না। অমলেশ পর পর তিনবার কোন ছক্কা ফেলতে পারল না। বুলু এবার পর পর তিনটা ছক্কা এবং একটা পোয়া পেয়েছে। অমলেশ হাঁ করে বুলুর খেলা দেখছে। মাথার উপর চড়াই পাখি দুটি ঝুঁকে আছে। নীল রঙের আলো। চারটি মাথা টেবিলে ঝুঁকে আছে। বিজু বুলুকে উৎসাহ দিচ্ছে, টুলু অমলেশকে। মাকে পণ রেখে বাপ ছেলেতে খেলা হচ্ছে। বেশ খেলছে। কি নিদারুণ খেলা, কি অসীম উত্তেজনা, কারণ ঘাম দেখা যাচ্ছে অমলেশের মুখে। অমলেশ হেরে যাচ্ছে।

কিন্তু শেষ দিকে কী হয়ে গেল। অমলেশ পর পর তিনটে পাকা গুটি বুলুর ঘরে ফিরিয়ে দিল। এবং শেষ পর্যন্ত বুলু হেরে গেলে, অমলেশ বলল, তুমি কাঁদবে না বুলু। এখন কাঁদতে বসবে না। মা তোমার সঙ্গে শোবে। আমি জিতে গেছি ত কি হয়েছে। যেন অমলেশ কত মহান আর উদার। জিতে গিয়েও পণ ফিরিয়ে দিতে রাজি।

বুলু কিছু বলল না। সে উঠে গেল নিজের খাটে এবং শুয়ে পড়ল।

বিজু বলল, তুমি সরে শোবে। আমার জন্য জায়গা রাখবে বুলু।

অমলেশ বিজুর দিকে তাকাল। বিজু তাকাল না। সে পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখছে। এখন অমলেশের শুধু প্রতীক্ষা। বুলু কতক্ষণে ঘুমোবে। ঘুমোলেই সে পশুপাখির মতো নির্বোধের হাসি হাসতে থাকে। এবং অমলেশ অন্ধকারে আজগুবি এক জগৎ তৈরি করে নেয় এই সংসারে—বিশ্বাসই হয় না পশুপাখির চেয়ে তারা তখন অন্ধকারে বেশি কিছু দেখতে পায়।

বিজু বলল, তুমি ওকে হারিয়ে দিলে!

—একটু হারতে শিখুক।

বিজু বলল, আস্তে। বুলু শুনতে পাবে। মশারি তুলে বিজু উঁকি দিতেই বুলু পাশ ফিরে শুলো। তুমি সরে শোও। না হলে শোব কি করে!

—আমার পাশে তুমি শোবে না। বুলু কেমন শক্ত গলায় বলল।

বিজু ভাবল অভিমান বুলুর। সে ওকে বুকে টেনে শুলে সে হাত ছুঁড়তে থাকল। বুলু তার মাকে কিছুতেই আজ পাশে শুতে দিল না। দু হাত দু পা ছড়িয়ে জায়গা দখল করে রাখল। এবং বিজু উঠে গিয়ে অমলেশের বিছানায় শুলে মনে হল বুলু ঘুমিয়ে পড়েছে।

মশারির নীচে অমলেশ এত ক্ষিপ্ত হয়ে আছে যে, তার ইচ্ছা করছিল উঠে গিয়ে ঠাস ঠাস করে চড় বসিয়ে দেয়। এত জেদ কেন হবে। অথচ সে জানে বুলুকে মারলে সারারাত বিজু পাশ ফিরে শুয়ে থাকবে। গায়ে হাত দিতে দেবে না। দিতে গেলেই ছ্যাঁৎ করে উঠবে।

বিজুর ঘুম আসছিল না। সে এক পাশ হয়ে শুয়ে আছে। বুলু না ঘুমিয়ে এখন যদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত তবে সে যেন ওকে পাশে নিয়ে ঘুমোতে পারত। নদীর পারে কোন রেল স্টেশনের মতো বুলু ওর কাছ থেকে ক্রমে সরে যাচ্ছে। বুলু বুঝি টুলুর মতো বড় হয়ে গেল। ওর ঘুম আসছিল না। কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে। এবং বিজুর কেন জানি কেবল এ সময় কান্না পাচ্ছে।

অমলেশ বলল, কাছে এস।

বিজু বলল, আমাকে বিরক্ত করবে না। আমি এখন ঘুমোব।

বিজু অমলেশের দিকে পাশ ফিরতেই লেপটা তুলে দিল অমলেশ। জানলা খোলা—টুলু ঘুমুচ্ছে টের পাওয়া যাচ্ছে, বুলু বুঝি এখনও ঘুমোয়নি, তবে না ঘুমোলে সে কথা বলতে পারছে না, না ঘুমোলে বুলু পা নাড়ে, মশারি কাঁপছে এবং এই কাঁপুনি থামলেই অমলেশ বুঝতে পারবে বুলু ঘুমোচ্ছে। সে তখন জোনাকির আলো জ্বালতে বসবে।

বিজুর কিছুই ভাল লাগছিল না। শেষ পর্যন্ত সে আলগা সে হয়ে শুতে চাইলে। অমলেশও কোন জোর করল না আর। পাশাপাশি দুজন শুয়ে আছে অপরিচিতের মতো। কোন কথা না। পথে কোন অসুবিধা হল কি না, ওদের কলেজের সুধাদির কি খবর এবং যা হয়ে থাকে, কিছু না কিছু কথা, খেতে বসে, খেয়ে উঠে, মুখ ধুয়ে এবং বিছানায় শুয়ে—কথার শেষ থাকে না। অথচ আজ চুপচাপ।

শেষ রাতের দিকে অমলেশ টের পেল বিজু ওর পাশে নেই। অমলেশ ধড়ফড় করে উঠে বসল। বিজু গেল কোথায়! সে বুলুর বিছানা দেখল, না বিজু নেই।

সে যে এখন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। অথচ বারান্দায় এসে দেখল দরজা খোলা।

সে কেমন ভয় পেয়ে ডেকে উঠল, বিজু! বিজু! তারপর সে চিৎকার করবে ভাবতেই দেখল, বিজু পাতাবাহার গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে কি যেন খুঁজছে।

—তুমি কি খুঁজছ বিজু।

—পাখিটাকে।

—পাখিটা মানে।

—সেই বাচ্চা পাখিটা। বাথরুমে যাব বলে আলো জ্বেলেছি। পাখিটা এসে আমার মাথায় বসল। ধরতে গেলাম উড়ে জানালা দিয়ে গাছটায় এসে বসল।

—সে ত ভাল হল। উড়তে শিখে গেছে।

—অন্ধকারে কোথায় যাবে বলত! ওত বেশিদূর উড়ে যেতে পারে না। গাছটার কোন ডালে বসে আছে খুঁজে দেখছি। বলে বিজু এ-ডাল ও-ডালের ফাঁকে মোমবাতিটা তুলে ধরে বলছে, দ্যাখ তো আছে কি না!

অমলেশ ম্লান হাসল—এস, ঘরে যাবে। মোমবাতির আলোতে পাখিটাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু বিজু এতটুকু নড়ল না।

ওরা এবার পরস্পর মোমবাতির আলোয় নিজেদের মুখ দেখল। মনে হল ওরা এক দূরবর্তী রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে! একটা ট্রেনের জন্য ওরা অপেক্ষা করছে। এই চেনা মুখ বড় অচেনা মনে হচ্ছে বিজুর। বিজু বেশিক্ষণ সেজন্য তাকাতে পারল না। ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। বাঁ হাতে মোমবাতি জ্বলছে বিজুর এবং গলে গলে অন্ধকার ওর চার পাশে জোনাকির মতো উড়ছিল। বিজু পাতার ভিতর মুখ লুকিয়ে রেখেছে। মুখটা

পাতার ভিতর মোমবাতির আলোতে কাঁপছে। অমলেশ আর স্থির থাকতে পারল না। বিজুকে গাছের নীচে জোর করে সে চুমু খেল। বিজু অমলেশকে চুমু খেল। মোমবাতির আলোতে আর পাখি খোঁজা হল না। বিজুর চোখে জল এসে গেল।

গন্ধ

কলকাতায় আবার বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়েছে। রাস্তাঘাট এবং সব সবুজ মাঠ যদি কোথাও থাকে প্রায় খালবিলের মতো। উত্তর থেকে হাওয়া এলে জানালা দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ থেকে হাওয়া এলে জানালা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের সময় দক্ষিণের হাওয়া প্রবল। গাড়ি ঘোড়া বাস ট্রাম ভিজতে ভিজতে চলে যায়। কখনও সার সার থেমে থাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। আকাশ চুরমার করে দিয়ে বজ্রপাতের শব্দ নেমে আসে। তখন কেউ হুইসকি গলায় ঢেলে বৃষ্টিপাতের শব্দ শুনতে ভালবাসে। ক্যাবারেগুলোতে মধ্যযামিনীতে উদ্দাম নৃত্যমালা। কলকাতায় যে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়ে গেল, একেবারেই তখন তা বোঝা যায় না।

দেবদারু গাছটা ল্যাম্পপোস্টের মতো দাঁড়িয়ে ভিজছে। সকাল থেকে বৃষ্টি। সারারাত বৃষ্টি গেছে। রাস্তায় জল জমছে। বাড়ছে। লোকজন হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে, মেয়েরা শাড়ি তুলে, ছেলেরা প্যান্ট ভিজিয়ে জল ভেঙে যাচ্ছে। কলকাতার এ-সময়ের চেহারা কেমন পাল্টে যায়। নরকের মতো হয়ে যায়। এবং দেবদারু গাছটার নীচে যে সংসারটা ছিল সেটা থাকে না। কোথাও উধাও হয়ে যায়। এবং জল নামতে শুরু করলে, হাইড্রেন খুলে ফেললে দেখা যায় শহরের ওপর সব কাক উড়ছে। এ-সময়টাতে শহরে বোধ হয় কাকের উপদ্রব বাড়ে।

সকালে বিকেলে এভাবে বৃষ্টিপাতের ভেতর যখন কলকাতা ভিজছিল, যখন রাস্তায় মানুষের ভিড় উপছে পড়ছে এবং যখন সূর্য আর দেখা যাবে না বলে সবাই কোলাহল করছে তখন ফ্ল্যাট বাড়ির জানালায় একটা দুঃখী মুখ দেখা গেল। সে দাঁড়িয়ে আছে। দেবদারু গাছটার নীচে জল উঠে এসেছে। ছেঁড়া নেকড়া, হাঁড়িপাতিল ভাঙা এবং দূরে সে টের পেল গাড়িবারান্দার নীচে সেই সংসারের বুড়ো মানুষটি হাঁটু মুড়ে পরিত্যক্ত রোয়াকে বসে শীতে কাঁপছে।

দুঃখী মেয়েটা বেশ সুখে ছিল। বাবা এই সুন্দর ফ্ল্যাট কিনে চলে এসেছে। মা এখন আরও যুবতী হয়ে উঠছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে রোজ সেই দেবদারু গাছ। একেবারে পরিপাটি সংসারের বাইরে বিশ্রী সাংঘাতিক কিছু। সে যে প্রথম দেখছে এমন, সে যে আর কখনও ভিখিরী অথবা ফুটপাথবাসিনীদের দেখেনি তা নয়। কিন্তু এখানে সে রোজ সকালে উঠে যখন স্কুলে যায়, দেখতে পায় বছর দু বছরের বাচ্চাটা পড়ে থাকে গাছের নীচে। ঘুমোচ্ছে। কিংবা কখনও বসে বসে খেলা করছে। ওর বড় বোনটা বসে বসে উকুন মারছে। এবং যখন স্কুল থেকে সে বেণী দুলিয়ে ফেরে, দেখতে পায়, কোত্থেকে সেই মেয়ে এবং মা সংগ্রহ করে এনেছে রাজ্যের পচা পটল, পেঁয়াজ, কুমড়ো, মাছের পচা নাড়ি-ভুঁড়ি, পাঁঠার মাথার কঙ্কাল। ভীষণ দুর্গন্ধে ওর পেট গুলিয়ে ওঠে। সিঁড়ি ভাঙার সময় সব সুখ কারা এভাবে কেড়ে নেয় তার। সে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে বাথরুমে ঢুকে যায়। জল বমি করে ফেলে।

মা দৌড়ে আসে। রাণু আবার বমি করছিস।

—পেটটা আবার গুলিয়ে উঠল।

এভাবেই মেয়েটার অসুখটা আরম্ভ হয়ে যায়। ডাক্তার হাসপাতাল, হাসপাতালে গেলে কমে যায়, এবং বাড়ি ফিরে এলেই আবার কেমন তার অসুখ।—মা তুমি পাচ্ছ না।

—কি পাব।

—কেমন একটা গন্ধ!

—না তো।

সত্যনারায়ণ বাড়ি ফিরে শুনতে পায়, মেয়েটা আবার খাচ্ছে না। খাবার দেখলেই বমি করে ফেলে।

কি গন্ধরে বাবা! জানালাটা মা বন্ধ করে দাও।

সত্যনারায়ণ মোটামুটি হিসেবী মানুষ, সামান্য ক্লার্ক থেকে বড়বাবু অফিসের। এবং টাকা লেনদেনের ব্যাপারে চতুর। স্ত্রীর অভাব অনটন সে একেবারেই রাখে নি, যা যা চাই ফ্ল্যাট বাড়ি এবং ফ্রিজে নতুন, গোদরেজের আলমারি, এবং হিসেবী বলে একমাত্র মেয়ে রাণু। সংসারের কোথাও সে হিসেবের বাইরে নয়। পুত্রসন্তানের যে ইচ্ছে ছিল না, এমন নয়, কিন্তু যা হয়ে থাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে সে আর যায় নি। সে একটি হবার পরই সব থামিয়ে রেখেছে। এবং গতকাল এই শহরে বৃষ্টিপাতের ঠিক আগে সে দেখে এসেছিল, দেবদারু গাছটার নীচে, বৌটা আবার একটা বাচ্চা দিয়েছে। এই নিয়ে কটা বাচ্চা। সে ঠিক গুনে বুঝতে পারে না। ওদের কটা বাচ্চা, সে টের পায় না। বৌটার সঠিক স্বামী কোনটা। সে দেখতে পায়, তিন-চারজন পুরুষ, পরনে লুঙ্গি, কানে বিড়ি গোঁজা, গলায় তাবিজ, এবং সূর্যাস্তের মুখে তারা কোথায় চলে যায়। আবার সে কখনও দেখে বেশ আরামে বৌটার কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে একটা বুড়ো মতো মানুষ। শহরের বাস ট্রাম তেমনি যায়। রাস্তায় লোকাভাব থাকে না, কলেজ এবং স্কুল ছুটি হলে সব সুন্দর সুন্দর দিদিমণিরা কত সব ফিসফাস কথা বলতে বলতে চলে যায়। সত্যনারায়ণ ভেবে পায় না তখন বৌটার কটা বাচ্চা! একটা দুটো না সহস্র। এবং যা হয়, সে রাস্তায় কোন অপোগণ্ড দেখলেই ভেবে ফেলে সেই বৌটার পেট থেকে বাচ্চাটা বের হয়েছে।

সত্যনারায়ণ দরজা জানালা সব বন্ধ করে রাখে। বলে, পাচ্ছিস।

—হ্যাঁ বাবা।

—কোথা থেকে আসে!

রাণু তখন চুপচাপ শুয়ে থাকে। আর কিছু বলে না।

এক টুকরো আপেল, ক'দানা আঙুর এবং নাসপাতি এনে দেয় মালতী। বলে, খা। খাতো মা। না খেলে বাঁচবি কি করে!

এই খাওয়া নিয়ে সংসারে এখন কত অশান্তি। মেয়েটা কিছুতেই কিছু খেতে চায় না। কেমন ভেতর থেকে তার দুর্গন্ধ উঠে আসে তখন। বাবার এত আয়াস, মার এমন যত্ন, তার কাছে তখন অত্যাচার মনে হয়। সে চিৎকার করে ওঠে কখনও, তোমরা সবাই মিলে কেন আমাকে মেরে ফেলতে চাও। আমি কি করেছি!

মালতী আর পারে না। ডাক্তার মজুমদার বললেন, খাওয়াতেই হবে। অসুখটা কি ঠিক তো ধরা যাচ্ছে না। সবই তো করালেন। ট্রপিকেলে রেখে দেখলেন। কোথাও কেউ শরীরে কোন ত্রুটি খুঁজে পাচ্ছে না।

এবং এভাবে দিনে দিনে মেয়েটা যখন শুকিয়ে যাচ্ছিল, এবং সংসারে সত্যনারায়ণ যখন চতুর কথাবার্তা বলতে আর একদম সাহস পায় না, অথবা কোন বিল পাস করে দেবার ব্যাপারে একটা মোটা অঙ্কের টাকা হাতে এসে যায়, সে আর আগের মতো মালতীর হাতে দিতে ভরসা পায় না। কেবল মনে হয় কোথাও কোন দুর্গন্ধ উঠছে, সে ভেতো মানুষ বলে, মালতীর চর্বি জমেছে বলে টের পাচ্ছে না। মেয়েটার ভেতর এখনও সে-সব দুর্গন্ধ জমা হয় নি, বাইরের সামান্য অন্ধকার চেহারা তাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।

সত্যনারায়ণ বলল, রাণু তোমার কিছু হয় নি। ওটা তোমার ম্যানিয়া।

রাণু ও-পাশ ফিরে শুয়ে আছে। পাখা ঘুরছে। কোথাও রেডিওতে বিবিধভারতী হচ্ছে, কোথাও কেউ পেট ভরে খেয়ে বড় ঢেকুর তুলছে এবং জানালা দিয়ে সেই অতীব দুর্গন্ধটা সারা বাড়ি ছেয়ে ফেলছে কেউ টের পাচ্ছে না। ওর হাই উঠছিল। জানালাটা বন্ধ করে দিলে ভাল হত। অথচ বন্ধ করে দিলেই কেমন দমবন্ধ ভাব। সে নিঃশ্বাস নিতে পারে না। কপাল ঘামে। শরীরের সুচিতা কেমন নষ্ট হয়ে যায় তার। তখন চিৎকার করতে থাকে, মা আমাকে কোথাও নিয়ে চল। এ-ভাবে এখানে থাকলে মরে যাব।

মালতী হতাশ গলায় তখন বলে, রাণু তোমাকে নিয়ে পুজোর ছুটিতে গোপালপুর চলে যাব, আর কটা দিন, বাবার ছুটি হলেই আমরা চলে যাব। চলে গেলেই তুমি আর গন্ধটা পাবে না! তুমি নিরাময় হয়ে যাবে।

রাণু আবার চুপ করে থাকে। কথা বলে না। এমন সুন্দর মেয়েটা, কি ভারী চোখ তার, আর হাত-পা লম্বা হয়ে যাচ্ছিল, চুল বড় হয়ে যাচ্ছিল। শরীরে সব অমোঘ নিয়তিরা বাড়ে দিনে দিনে। তখন কিনা এই অসুখ। কিছুই খাওয়ানো যায় না। যতটা খায় তার চেয়ে বেশী বমি করে দেয়। উগরে দেয় যেন। ভেতরে কোন দৈত্য বাসা বেঁধেছে। সুখী মেয়েটাকে এমন দুঃখী করে রেখেছে এবং একদিন চোখের ওপর বুঝতে পারে মেয়েটা মরে যাবে।

সত্যনারায়ণ সেদিন দেবদারু গাছটার নীচে এসে থমকে দাঁড়াল। একটা মরা পায়রার ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। পায়রা না ডাহুক, না কাক, সে আর এখন সঠিক কিছু বুঝতে পারছে না। বাতাসে সব পালক উড়িয়ে নিয়েছে। কেমন একটা পচা দুর্গন্ধ এসে নাকে লাগতেই ওপরে জানালায় দেখল রাণু দাঁড়িয়ে দেখছে। আর তখনই কেন জানি ওর ইচ্ছে হচ্ছিল, লাথি মেরে এই বৌটির হাঁড়ি পাতিল, ছেঁড়া কাঁথা কাপড়, পলিথিনের বাকস সব ফেলে দেয়। দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। কতদিন পর ওর চোখের ওপর এই সব বেআইনী ইতর মনুষ্যকুলের নোংরা তৈজসপত্র তাকে গিলে খাচ্ছিল। রাণু কোন দিন বলে নি, বাবা, ওখানে গন্ধটা আছে। তুমি ওদের দূর করে দাও।

আর সত্যনারায়ণের মাথায় কেমন রক্তপাত আরম্ভ হয়ে যায়। সে চিৎকার করে উঠল, রাণু তুমি ওখানে। দাঁড়িয়ে কি দেখছ, যাও ভিতরে যাও! অথচ সে দেখছে, পাঁচ-সাতটা অপোগণ্ড শিশু সেই ছেঁড়া পায়রার মাংস ভারী যত্নের সঙ্গে ভাঙা এনামেলের প্লেটে কেটে কেটে রাখছে। সাদা ফ্যাকাসে মাংসের টুকরো। পচা গন্ধটা অবিরাম সুখ দিচ্ছিল যেন। সামান্য হলুদ লঙ্কা বাটা মাখিয়ে, একটু আগুনের দরকার, কোথা থেকে প্লাইউডের একটা ভাঙা বাকস টানতে টানতে নিয়ে আসছে। বুড়ো মানুষটা দা দিয়ে কোপাচ্ছে কাঠ, আর দু-তিনটে ইটের ওপর হাইড্রেনের জল তুলে সেদ্ধ করছে বৌটা, ওরা নোংরা শালপাতা এনে বাসি রুটি ভাগ করে বসে আছে। মাংসটা পোড়া সেদ্ধ। পচা গন্ধটা ওদের পেটে খিদের উদ্রেক করছিল। জুল জুল চোখে তাকিয়ে আছে সব কটা জীব। সামান্য হলেই হামলে পড়বে। পোড়া চিমসে মাংস পোড়া গন্ধ। মেয়েটা তখন জানালায় নেই। অবিরাম গন্ধবাহী বাতাস দিকে দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। প্রায় সে যেন কোন শ্মশানে। মানুষের পোড়া মাংসের চামসে গন্ধের মতো উঠে এলে একদণ্ড সত্যনারায়ণ আর দাঁড়াতে পারল না! সে সোজা সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে দরজা জানালা বন্ধ করে দেবার সময় দৌড়ে গেল বাথরুমে। তারপর অক্ করে বমি করে দিল সবটা।

মালতী দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছে। সহসা এই বমি সত্যনারায়ণের, সে কেমন স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। একটা কথা বলতে পারছে না। রাণুর মতো একেবারে সোজা এমন একটা ঘটনা, ফের আর একজনকে আক্রমণ করবে এ-সংসারে সে কখনও ভাবে নি।

চোখে মুখে জল দিয়ে সত্যনারায়ণ বের হয়ে এলে বলল, কি হয়েছে! তুমিও শেষ পর্যন্ত? সংসার কি যে হবে!

সত্যনারায়ণ বলল, গন্ধ!

—কিসের গন্ধ!

—বারে পাচ্ছ না!

—না তো।

ঠিক রাণু যে-ভাবে বটিটমি করে চোখে-মুখে জল দিয়ে দাঁড়াত, কথা বলত, এবং শূন্যতা ফুটে উঠত চোখে, সত্যনারায়ণ ঠিক ঠিক হুবহু একইভাবে কথা বলছে।

মালতী বলল, তোমরা আমাকে পাগল করে দেবে? কিসের গন্ধ—আমি তো পাচ্ছি না।

—পাবে। বলে সে বসার ঘরে সোজা ঢুকে ডায়াল করল, হ্যালো, সুকুমার আছে?

—সুকুমার? আছে ধরুন।

সুকুমার বলল, কি দাদা, আমি সুকুমার বলছি।

—তোমার দাদাকে একটা খবর দিতে পার? যাতে একটা ব্যবস্থা হয়।

—কেন কি হয়েছে?

—আর বলো না, নীচে আমাদের দেবদারু গাছটার নীচে যা সব হচ্ছে না! দেশে কি কোন শাসন নেই! তোমার দাদা তো একজন কর্তাব্যক্তি।

—কি হচ্ছে বলবেন তো!

—পঙ্গপাল!

—পঙ্গপাল! কোথাকার!

—জানি না। বাড়িতে টেকা যাচ্ছে না। আমরা সবাই এবার মরে যাব। হতাশ গলায় বলে যেতে থাকল সত্যনারায়ণ।

—এই তো সেদিন ফ্ল্যাট কিনলেন! এত তাড়াতাড়ি হুজ্জোতি আরম্ভ হয়ে গেল। বুঝিয়ে বলুন না ওদের।

—কোন লাভ হবে না। তুমি একবার অবশ্যই আসবে! ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।

—কি হয়েছে বলবেন তো।

—না এলে বলা যাবে না।

সুকুমার এল সন্ধের একটু আগে। সারাক্ষণ সুকুমার আসবে ভেবে সত্যনারায়ণ জানালায় মুখ রেখে দাঁড়িয়েছিল। দেবদারু গাছটার নীচে এখন সেই বৌটা তার পঙ্গপাল নিয়ে বসে রয়েছে। একটা খঞ্জনী বাজিয়ে বুড়ো লোকটা গান ধরেছে। ছোট দুটো ছেলে বুড়োটার চার পাশে টুইস্ট নাচছে। রাস্তায় গাড়ি রিকশা তেমনি, নির্বিকার মানুষজন, এমন একটা পোড়া চামসে গন্ধ কারো নাকে লাগছে না। ওর তো সেই গন্ধটা সেই যে নাকে লেগে রয়েছে আর যাচ্ছে না। শনিবার বলে সকাল সকাল ছুটি! বেশ বড় রকমের দাঁও মেরে উল্লসিত, একদণ্ড অফিসে সে দেরি করে নি। সোজা বাড়ি ফিরে মালতীর হাতে গোছা গোছা টাকা দিয়ে কোন একাউন্টে কিভাবে জমা দিতে হবে, এবং মালতীর জন্য আর দুটো নতুন ডিজাইনের অলংকার এ-ভাবে ভেবেছিল, হাতে মুখে চুমো খেয়ে রাতে একটা থিয়েটার সেরে আসবে। রান্নার মেয়েটা বাড়ির পাহারায়। রাণু শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়বে। রাণু আজকাল একটু একটু খেতে পারছিল। বেশ নিরাময়ের ছবি আবার যখন ফুটে উঠেছিল চার পাশে, তখনই সে একটা পোড়া চামসে দুর্গন্ধে বমি করে দিল। সিঁড়ির গোড়ায় যারা থাকে, অর্থাৎ একতলার ফ্ল্যাটে, ওরা গন্ধটা পাচ্ছে না। পেলেও বোধ হয় আসছে যাচ্ছে না খুব একটা। সে সবাইকে জিজ্ঞেস করছিল, গন্ধটা আপনারা পাচ্ছেন না! ওরা কেমন নির্বিকার মুখে তাকিয়ে দেখছিল, সত্যনারায়ণকে। লোকটা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মেয়েটা তার কতদিন থেকে একটা গন্ধ পাচ্ছিল, এবার সে পেতে শুরু করেছে।

সে বলেছিল, পাবেন, আপনারাও পাবেন। বাড়ির সামনে এই সব বেওয়ারিশ মাল, অখাদ্য কুখাদ্য এনে জড়ো করছে, না পেয়ে যাবেন কোথায়।

এবং বৌটার খোলা বুকে একটা নতুন বাচ্চা, এই মনে হয় দু-চার দিনও হয় নি, একেবারে বুকের ভেতর মুখ লাগিয়ে রেখেছে। হাত-পা কাঠি কাঠি, সবুজ শরীরটা, আজ কি কাল, যেমন রাণু হবার সময় সে হাসপাতালে গিয়ে একদিনের বাচ্চা রাণুকে দেখেছিল চামড়া কোঁচকানো, এবং চোখ মেলে তাকাতে পারছে না। আর তখনই জানালার নীচে সুকুমার, সে প্রায় স্বর্গ পাবার মতো চিৎকার করে বলল, এলে সুকুমার! পাশে দেখেছ?

সুকুমার চারপাশে তাকাল। সে এমন কিছু দেখতে পেল না। কোথাও কোন গণ্ডগোল নেই, কেউ বাস চাপাও পড়ে নি, কোন মৃতদেহ বাড়ির পাশে কেউ ফেলে রেখে যায় নি, বরং বুড়োটা তার দুই নাতি নিয়ে, দুজন যুবক ছোঁড়া, এবং কিছু বেশী বয়সের দু-তিনটে মানুষ গোল হয়ে কলকাতার আকাশ পরিষ্কার দেখে খঞ্জনী বাজিয়ে গান ধরেছে। পাশে পোস্টাফিসে আলো জ্বালা হয়ে গেছে। আকাশের মাথায় ভাঙা চাঁদ। দেবদারু গাছটা ভারী সজীব। সুন্দর মতো এক যুবতী স্বামীর সঙ্গে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে আছে। পান

খেয়ে রাঙা ঠোঁট উল্টে পাল্টে দেখছে। কোথাও কিছু সে অস্বাভাবিক দেখতে পেল না। সত্যদার মেয়েটার ক'মাস থেকে কি একটা অসুখ, কখনও ভাল হয়ে যায়, কখনও বিছানা থেকে একেবারে উঠতেই পারে না —এসব খবর সে পেয়েছে। দু-চারবার সে দেখেও গেছে। কি একটা গন্ধ পায় সংসারে। মেয়েটা আসলে ভারী আদরে মানষ, ন্যাকা। একটুতেই ঘাবড়ে যায়। এমন একটা বয়সে বালিকারা ভারী কৌতূহলী হয়ে যায়। সংগোপনে সব কিছু দেখে বেড়াবার স্বভাব। আর কিনা মেয়েটা রুগ্ন বালিকার মতো জানালায় দাঁড়িয়ে থাকছে! ভেতরে আসলে সেই অসুখ হয়তো, বড় হতে গেলে কিছু অসুখ শরীরে আসবেই—সে এই সব ভেবে সিঁড়ি ভেঙে যত উঠছিল তত মনে হচ্ছিল, সত্যনারায়ণদা, ভারী মুসিবতে পড়ে গেছে।

সুকুমার বলল, কিছু তো দেখলাম না!

—কিছু না?

—না তো!

—তোমাদের চোখ নেই! তোমরা এত ভোঁতা মেরে গেছ।

সুকুমার অবাক। চোখ মুখ ভয়ঙ্কর রকমের ভীতু, ভূতটুত দেখলে এমন চোখ মুখ হবার কথা! সুকুমার মনে মনে বলল, তোমার মাথাটা গেছে। চুরি করে ফাঁক করে দিচ্ছ—ধরা পড়ে যাবে ভয়ে শালা তুমি এমন মুখ করে রেখেছ। পাগলামি করলেও রেহাই নেই। এবার চাঁদ সত্য কথাটা বলে ফেল।

সুকুমার বলল, রাণু কেমন আছে দাদা?

—দু দিন বেশ খাচ্ছিল, আজ আবার খেতে পারছে না গন্ধে!

—অনেক তো করলেন।

হঠাৎ কেমন অসহায় মানুষের মতো চেপে ধরল সুকুমারের হাত। বলল, তুমি বাঁচাও। তুমিই পার।

সুকুমার বলল, আপনি বসুন তো! উতলা হবেন না। বৌদি বৌদি! সে দরাজ গলায় ডাকলে, মালতী এসে দাঁড়াল সামনে। ওরও চোখ মুখ কেমন শুকনো। সেই নির্মল হাসিটুকু নেই।

—আপনাদের কি হয়েছে?

—জানি না ভাই। আর ভাল লাগছে না।

সত্যনারায়ণ বলল, থানায় তোমার দাদাকে একটু খবর দিতে হবে।

—কেন?

—দেবদারু গাছটা সাফ করা দরকার।

—গাছে কি হয়েছে?

—গাছের নীচে সব পঙ্গপাল। অখাদ্য কুখাদ্য খায়।

—খাচ্ছে খাক না। আপনার কি তাতে?

—নীচে যা তা সেদ্ধ করে খাবে, আর ওপরে আমরা থাকব। সে কখনও হয়? গন্ধ! বলেই যেন ছুটে বের হয়ে গেল সত্যনারায়ণ।

মালতী বলল, বুঝলেন।

—হুঁ বুঝছি। দেখি। এদের সরানো যায় কিনা।

সত্যনারায়ণ ফিরে এসে বলল, যা হয় কর একটা ভাই। আমরা না হলে মরে যাব। দু'দিন বাদে ঠিক মালতীও বমি করে দেবে। তখন আমরা তিনজন, আমি বলছি, কেউ বাদ যাবে না, পাশের ফ্ল্যাট, নীচে সবাই। আস্তে আস্তে সবাই পাবে। সবাই মরবে। একটা কিছু করো।

সুকুমার প্রথমে ওর দাদার কাছে গেল। ওর দাদা বলল, আইনে নেই। তাড়াবার কোন আইন নেই। শেষে স্মরণ নিতে হল ছেলেদের।

ওরা বলল, সরে পড়।

—কোথায় যাব বাবু!

—আমরা কি জানি কোথায় যাবে!

বুড়ো লোকটা বলল, চলে যাব বাবু। সকালে চলে যাব।

—এক্ষুনি। তোমাদের জন্য ভদ্রলোকেরা আর শহরে থাকতে পারবে না। সব অকর্ম-কুকর্ম করে বেড়াচ্ছে, আমরা বুঝি জানি না।

ছেলেগুলো সব পোঁটলাপুঁটলি মাথায় নিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে। হাঁড়ি-পাতিল বুড়ো মানুষটা। চুল সাদা, কানি পরনে, নাকের ভেতরে বড় গর্ত, কান বড় এবং লোমে ভর্তি। বুড়ো মানুষটা, দু বছরের বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিলে আরও দু-চারজন এসে ঘিরে দাঁড়াল। এবং যা হয়ে থাকে বেশ সোরগোল পড়ে গেল। আর তখন যায় কোথায়। দৌড়ে পালাতে পারলে বাঁচে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওরা দৌড়ে কোথায় চলে যাচ্ছে। নিমেষে দেবদারু গাছটার চার পাশ কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। কিছু ভাঙা হাঁড়ি-পাতিল, পোড়া ইঁট, দুর্গন্ধময় কিছু ছেঁড়া কানি, আর সব পচা জীবজন্তুর উচ্ছিষ্ট হাড় মাংস ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। সত্যনারায়ণ জমাদার ডেকে জায়গাটা সাফ করে ফেলল, গঙ্গা জলে ধুয়ে দিল। শরীরে এবং চারপাশে যা কিছু আছে তার ওপর ওডিকোলন ছড়িয়ে এবং রাম রাম বলতে বলতে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেল। তারপর দরজা জানালা খুলে দিল সব। রাণুকে নিয়ে জানালায় একবার দাঁড় করিয়ে বলল, পাচ্ছিস?

রাণু নাক টেনে বলল, না বাবা।

—এখানে?

—না বাবা।

—এদিকে আয়। দ্যাখ তো...?

—না বাবা।

তারপর সত্যনারায়ণ ভাল করে ঘর বারান্দা ধুয়ে দিতে বলল রান্নার মেয়েটাকে। যেখানে যা কিছু আছে সব তাতেই গন্ধটা লেগে আছে ভেবে জল দিয়ে একেবারে ঝকঝকে তকতকে করে ফেলল। মাছ মাংস রান্না হল না। নিরামিষ আহার করল সত্যনারায়ণ। সত্যনারায়ণ এবং রাণু আজ কত দিন পর যেন পেট ভরে ভাত খেল।

আর আশ্চর্য সে রাতে শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ল। এবং নাক ডাকতে থাকল। কিছুক্ষণ পর নাক ডাকা বন্ধ হয়ে গেল। কেউ যেন তাকে ডাকছে।—অমা দেখ এসো কি ব্যাপার। সে উঠে গেল জানালায়। আবার নতুন কারা আসছে। এবার একজন দুজন নয়। সে দেখল, গাছটার নীচে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। চার পাশ থেকে পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আসছে। মাথায় হাঁড়ি-পাতিল, বৌ একটা নয়, একেবারে সার দিয়ে এবং সবার কোলে বাচ্চা। পাঁচটা সাতটা করে অপোগণ্ড, উলঙ্গ প্রায় তারা সব, চুল শণের মতো, এবং অভাবী মানুষ। ওদের সঙ্গে আছে সব পচা শাকসব্জি, উচ্ছিষ্ট খাবার। পচা পরিত্যক্ত মাছ-মাংসের হাড়। মাছি ভনভন করছে। কত দিন চান করে না এরা, যেন এরা শহরের সবকিছু অধিকার করে নিতে আসছে। এবং সে দেখতে পেল, অফিস কাছারী করতে পারছে না মানুষ, রাস্তা পার হতে পারছে না। ডিঙিয়ে যেতে হচ্ছে। পার হতে সেই গন্ধ নাকে এসে লাগছে। মানুষেরা চার পাশে যারা আছে অক্ অক্ বমি করছে। চোখের ওপর একটা বেড়াল ছানা আগুনে লোহার শিকে সেঁকে নিচ্ছে আদিম বন্য হিংস্র এক মানুষ এমন সুসময়ে কলকাতার সব জুড়ে বসতে চাইছে সে। রাণু, মালতী সে পাশের ফ্ল্যাটে, নীচের ফ্ল্যাটে এবং সর্বত্র সেই অক অক জল বমি। প্রায় মহামারীর মত সব শহরকে গ্রাস করছে। এক প্রাগৈতিহাসিক জীবের মত ওদের সার। সে রাণু মালতীর হাত ধরে শহর লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। প্রায় আধমরা হয়ে আসছে। চোখ মুখ ছিটকে বের হয়ে যাবার মত। যেন এবার তারা কোণঠাসা করে মারবে তাকে। সব কলকাতা এ-ভাবে পঙ্গপালে ছেয়ে গেল। সে চিৎকার করে উঠল, সুকুমার বাঁচাও।

ওর ঘুম ভেঙে গেল। সে গলা শুকনো বোধ করল। জানালা খোলা। ভয়ে জানালার পাশে যেতে সাহস হচ্ছে না। জিরো পাওয়ারের আলো জ্বলছে। মালতী অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ও ঘরে রাণু। সে পা টিপে টিপে

এগোতে থাকল। ওরা এখনও ঘুমোচ্ছে। তার চিৎকার পর্যন্ত শুনতে পায় নি। শহরের ফুটপাথে এত মানুষ যাচ্ছে টের পাচ্ছে না। সে কোন রকমে পা টিপে টিপে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। আশ্বিনের বাতাস। দূরে ঢাকের বাদ্যি বাজছে। আর চাঁদের মরা আলোতে সে দেখতে পেল ভূতুড়ে দেবদারু গাছটা একাকী। নীচে একটা রাস্তার কুকুর শুয়ে আছে। গাছটার নীচে কেউ চলে আসে নি। কলকাতা আবার নিরিবিলি নিজের ভেতর ডুবে আছে। কলকাতা আছে কলকাতাতেই।

জীবন-সত্য

সমর ভগ্নিপতির চিঠি পেয়ে চলে এসেছে। চিঠিটি এ-রকমের—বাড়ির সম্পত্তি যেটা এতদিন অনুমতি-দখল বলে রেকর্ডভুক্ত ছিল তা আপনাদের নামে নামে করে নিতে হবে। প্রত্যেকের নামে রেকর্ড হবে। এর জন্য তিন ধারার ফর্ম ফিল-আপ করে ক্যাম্প অফিসে জমা দিতে হবে। এতে অনেক ঝামেলা—তা ছাড়া বাড়ির একটা দাগ নিয়ে গণ্ডগোল ধরা পড়েছে। বিয়াল্লিশ শতক জমির কোনো কাগজপত্র নেই। কাগজ বের করার চেষ্টা করছি—দেখা যাক কী হয়! এ-সব কারণে আপনাদের সবার বাড়ি আসা দরকার। তিন তারিখের মধ্যে ফর্ম জমা দিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এক দিনের জন্য হলেও আসবেন। আপনি না এলে সব কাজ বন্ধ হয়ে থাকবে। যেটা এখন সহজে হবে তারিখ পার হয়ে গেলে কোর্টে আপিল করতে হবে।

ট্রেন লেট। স্টেশনে নেমে সে ঘড়ি দেখল—সোয়া আটটা বাজে। বাড়ি যেতে ন'টা বেজে যাবে। স্টেশন থেকে রিকশায় চেপে প্রায় ঘণ্টাখানেকের পথ। গতকাল বড়দা সকালে তার কলকাতার বাড়িতে হাত-চিঠিটি দিয়ে গেছে। সে বাড়ি ছিল না। দেখা হলে জেনে নিতে পারত বড়দা কবে যাবে। হাতে আরও আট দশদিন সময় থাকা সত্ত্বেও সমর দেরি করতে পারেনি। তাকে নিয়েই সবার বেশি চিন্তা। সময় করে শেষ পর্যন্ত সে একদিনের জন্য হলেও বাড়ি যেতে পারবে কি না! সে না গেলে কিছু হবেও না। মার দুশ্চিন্তা বাড়বে। সবারই কম বেশি তাকে নিয়ে অভিযোগ আছে। মায়ের সব চেয়ে বেশি।

সমর রিকশায় বসে এ-সব ভাবছিল। জ্যোৎস্না রাত। রাস্তার দু-পাশে গভীর বন-জঙ্গল এখনও ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। আগে ছিল একেবারে নির্জন। বেশি রাতে একা এই রাস্তায় যেতে গা ছম ছম করত। এখন এখানে সেখানে ঘর বাড়ি, হিমঘর, শহরের কাছাকাছি জায়গা বলে, মানুষজন এদিকটায় ছড়িয়ে পড়ছে।

ঠিক সাঁইত্রিশ বছর আগে এই রাস্তাটা সে প্রথম আবিষ্কার করেছিল—বাবা জেঠা কাকার সঙ্গে। শহরের জেলখানার পাঁচিল পার হয়ে, পঞ্চাননতলা পার হয়ে লাল সড়ক চলে গেছে লালবাগের দিকে। খোয়ার লাল রাস্তা। ধূলো উড়ত। গরুর গাড়ি সার বেঁধে চলত। সাঁইত্রিশ বছর। সে তখন ক্লাস টেনে পড়ে। তার শরীরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের সব কিছুই বদলে গেল। রাস্তা পাকা হয়েছে। ট্রাক বাস চলাচল বেড়েছে। সেই নির্জনতা হারিয়ে গেছে। মায়া-মমতা স্নেহ ভালোবাসারও ঠিকানা বদল হয়েছে।

তবু এই রাস্তা কেন যে অমোঘ নিয়তির মতো তাকে টানে! দু-পাশের বিশাল সব শিরীষ গাছগুলির কিছু আছে কিছু নেই। দু-পাশে সরকার থেকে লাগানো কোথাও ইউক্যালিপটাস গাছ সাদা রঙের। জ্যোৎস্না রাতে রিকশায় যেতে বড় মায়াবী মনে হয় চারপাশের সব কিছু। যেন সে তার কৈশোরকাল এই রাস্তায় ফেলে গেছে। পৃথিবীর কত দেশে সে একসময় ঘুরে বেড়িয়েছে, কত সব বর্ণময় দ্বীপ সে দেখেছে, আফ্রিকার জঙ্গলে তার রাত্রিবাসও ঘটেছে অথচ এমন নির্জন কৈশোরের রাস্তা সে কোথাও আর আবিষ্কার করতে পারেনি। এই রাস্তাটায় এলেই সে ভারি মুহ্যমান হয়ে পড়ে। সব কিছু ভুলে যেতে ইচ্ছে হয়। যেন এক কিশোর কোনো মাঠের প্রান্তভাগ থেকে হেঁকে ওঠে, তুমি ভাল আছ সমু?

ভাল নেই। সে জানে ভাল নেই। না বলে, বাবা গত হবার দশ বছরের মধ্যে ভগ্নিপতির এই চিঠি পেত না। বন-জঙ্গলের মধ্যে বাবা জেঠা কাকাদের বাড়ি ঘর বানানোর কথা এখন মনে পড়ত না। রাজার পতিত বনজঙ্গল জলের দরে কেনা। মাত্র পাঁচশ টাকায়, এক লপ্তে কুড়ি বিঘার এক বনভূমি কিনে জঙ্গল সাফ করা, বাঁশের গুঁড়ি ওপড়ানো কোদাল মেরে, সে কী দিন গেছে! ছিন্নমূল হবার পর থিতু হয়ে বসার মতো জায়গা পেয়ে বেঁচে থাকার জন্য আরও কিছু দরকার তাঁরা ভুলেই গেছিলেন। ভাগে তিন বিঘে করে জমি, ঠাকুরের নামে বিঘে দুই-জমির বন্দোবস্ত এ-ভাবেই ঠিকঠাক করে নিয়েছিলেন তাঁরা। বাবা কাকারা ছাপড়া ঘর

বানিয়ে যে যার মতো সংসার পেতেছিলেন। দেশের একান্নবর্তী সংসার ছিন্নমূল হবার পর ভেঙ্গে গেল। তখন তার কান্না পেত—একসঙ্গে লম্বা রান্নাঘরে আর পাত পড়ে না। সব খুড়তুতো জেঠতুতো ভাই-বোনেরা আলাদা পাতে খায়।

মানুষের ভিতর একটা আলাদা কষ্ট থাকে। যা গভীর এবং গোপন। সেই থেকে টের পেত সে, কষ্টটা তাকেও আলাদা করে দিচ্ছে। নিরুপায় বাবার মুখ দেখলে সে এটা আরও বেশি টের পেত। দেশ থেকে আনা সামান্য টাকা পয়সা শেষ হতে ছ'মাসও সময় লাগল না। ঘরে খাবার না থাকলে মা আঁচল পেতে মাটিতে শুয়ে থাকতেন। বাবা তখন ঘরে থাকতেন না। রোজ পোস্টাপিসে যেতেন এক ক্রোশ রাস্তা হেঁটে, যদি তাঁর বড় পুত্র কিছু টাকা পাঠায়। বড় পুত্র রেলে কাজ পেয়েছে জানিয়েছে। জীবনের দুঃসময়ে বাবার কাছে এ বড় সুখবর ছিল। সকাল হলেই রোজ হাঁটা দিতেন পোস্টাপিসের দিকে। বাবা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লিখতেন, তোমার কটি টাকা আমাদের সবার প্রাণ রক্ষা করতে পারে। সমু পাশ করলে আমাদের আর কষ্ট থাকবে না। ও একটা চাকরি পেয়ে যাবে আশা করছি। অভাবের তাড়নায় তারও মাথার ঠিক নেই। হাতের কাছে যা পাচ্ছে, তাই ধরছে। পড়াশোনা বন্ধ হবার যোগাড়।

দাদা টাকা পাঠাত না। তবে চিঠি দিত। তার শরীর ভাল না। অস্থানে কুস্থানে খেয়ে পেটের পীড়ায় কষ্ট পাচ্ছে। বাবা কী বুঝে মাকে বললেন, তোমার পুত্রটির বিবাহের চেষ্টা করা দরকার। পেটের পীড়ায় কষ্ট পাচ্ছে ভেবে মন খারাপ কর না। বিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে শেষ পর্যন্ত বিয়ে দাদা নিজেই করে ফিরেছিল। মাসখানেক বাড়িতে থাকার সময় বাবার হাতে কিছু টাকাও দিয়েছিল। বাবার সংসারের চেয়ে তার নিজের সংসারের দায়িত্ব কতখানি, বাবাকে আভাসে ইঙ্গিতে তাই বোঝাবার চেষ্টা করত। সমর সব শুনত। দাদাটি এমন আত্মকেন্দ্রিক আর স্বার্থপর হয়ে গেছে ভেবে ক্ষোভ হত তার।

মার তখন এক কথা—কী চাকরী। টাকা দেবে কোত্থেকে! মার দুর্বলতা সমর বুঝতে পারত। কোন বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে থাকে—নিজের বলতে কাছে কেউ নেই। কি-ই বা চাকরি! রেলের ওয়ার্কশপে কাজ। লেখাপড়া তেমন হয়নি, পাশ টাস নেই যে ছেলে তোমার দু-হাতে কামাবে, বাপ তা মচর মচর করে ওড়াবে। দাদার কথা উঠলে মা সবসময় তার পক্ষ নিয়ে কথা বললে, সমর না পেরে বলত, ইচ্ছে থাকলে ও থেকেই বাবাকে কিছু দিতে পারে। ভাই-বোনেরা খেল কি খেল না মাথায় নেই। বেঁচে থাকতে গেলে কিছুটা ছাড়তে শিখতে হয় মা।

রিকশাটা পঞ্চাননতলা পার হয়ে যাচ্ছে। দু-পাশে মাঠ, অসময়ের আবাদ, স্যালোর নীলবাতি চোখে পড়ছে। বড় বড় আমবাগানগুলি নেই, কাঠ চেরাই-এর কল বসেছে। তার আওয়াজ পাচ্ছিল সমর। কিছু পাখি উড়ে গেল। জোনাকি পোকা ঝোপে জঙ্গলে উড়ছে। জমি ভাগ সে না গেলে হবে না। কেন হবে না, তাও সে জানে। সে তার চাকরি এবং মেধা বিক্রির টাকায় সবচেয়ে সচ্ছল। অসময়ে সে সবার ভরসা। দু-বোনের বিয়ে, ছোট দু-ভাইকে থিতু করার জন্য প্রাণপণ খেটে একটা জায়গায় হেরে গেছে। ছোট ভাইটি বড় বিপাকে পড়ে গেছে। পড়াশোনা করল না, করানো গেল না—তার বৌদি কত বুঝিয়েছে! সমর এবং তার স্ত্রী স্কুলে শিক্ষকতা করে নিজের কাছে রেখে পড়িয়েছে। তবু পারেনি। বোনের জন্য মাস্টার রেখেছে। তখন সমরের আলাদা সংসার। দু'জনের আয় থেকে অতি কষ্টে বাঁচিয়ে বাবাকে মাসোহারা দিয়ে গেছে।

স্ত্রী তার চাপা স্বভাবের। সহজে ক্ষোভ প্রকাশ করত না। ভাই-বোনেদের নিজের কাছে রেখে পড়িয়ে, দু'জনের উপার্জিত টাকায় এমন উদ্বৃত্ত থাকে না, বাবার সংসারে আলাদা কিছু দেওয়া যায়। এক পয়সা সঞ্চয় নেই। স্ত্রীও তখন সন্তানসম্ভবা। চিন্তা হবারই কথা। দাদা ইতিমধ্যে তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হলে বাবার সংসারে পাঠিয়ে দিয়েছে। একটি কন্যা হয়েছে দাদার। বৌদিকে নিয়ে গেছে, কন্যাটি মার কাছে রেখে গেছে। যজনযাজনে কিছু আয় করেন বাবা। শাকসব্জি জমিতেই হয়—সমর যে টাকা পাঠায় তাতে করে বাবার গাঁয়ের বাড়িতে অভাব আর সে-ভাবে জাঁকিয়ে বসে নেই। দাদা তার স্ত্রীর প্রসূতিকেন্দ্রটি বাড়িতেই রেখেছিল। তার দায় ছিল একটাই, কোনোরকমে বাড়িতে মার কাছে ফেলে রেখে যাওয়া। টাকার কথা বাবা

লিখলেই পেটের পীড়ায় কষ্ট পাচ্ছে এমন খবর আসত দাদার। বাবা গুম মেরে যেত। এবং পর পর তিনটি কন্যার জন্ম হলে সমর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছিল, তুই কীরে দাদা! পর পর মেয়ে হচ্ছে, ভাবছিস না! আবার বৌদিকে নিয়ে এয়েছিস! এদের বড় করবি কী করে! খাওয়াবি কি! লেখাপড়া আছে। দিনকালের কথা ভাবছিস না। এত অবিবেচক তুই! দাদার তখন এক কথা, আমার সন্তান না হলে বংশ রক্ষা করবে কে? পুত্র সন্তান লাভে দাদা প্রায় মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত পাঁচটি কন্যা এবং দুটি পুত্রের পিতা।

সমর বাড়ির মুখে এসে গেছে। এখান থেকে নেমে কিছুটা রাস্তা তাকে হেঁটে যেতে হবে। কাঁচা রাস্তা। রিকশাওয়ালা ভিতরে ঢুকতে কিছুতেই রাজি না। মাসখানেক আগে দাদা এক বিকেলে তার বাড়িতে হাজির। দাদাকে দেখলে এখন তার কষ্ট হয়। কেমন নিস্তেজ গলায় কথা বলার স্বভাব। মুখে চোখে কোনো গোপন অপরাধ যেন ভেসে ওঠে কথা বলার সময়। দাদা তাকে জানিয়েছিল, জুন মাসে রিটায়ার করছে। বাড়ির কোনদিকটা সে নেবে, বাড়ি ঘর বানাবে, তারই প্রায় বলতে গেলে অনুমতি নিতে গিয়েছিল।

সে বলেছিল, বাঁশঝাড়ের দিকটায় আপাতত বাড়ি ঘর বানিয়ে থাক।

দাদা বলেছিল, রাস্তার সামনের জমির একটা অংশ আমাকে দিবি। একটা দোকান টোকান না করতে পারলে খাব কি! পেনসনের কটাই বা টাকা!

সমর বুঝতে পেরেছিল, গর্ত থেকে তাহলে সাপ এবার সত্যি বের হয়ে পড়েছে।

ফাল্গুনের এটা মাঝামাঝি সময়। অথচ কী কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। সে জানে, এ-সময়টায় কলকাতার শীত না থাকলেও এখানটায় শীত জাঁকিয়ে বসে থাকে। স্টেশনে নেমেই কোট গায়ে দিয়েছিল। রিকশায় উঠে গরম চাদর বের করে কান মুখ মাথা ঢেকে নিয়েছে। শীতে বড় কাবু সে। একটু এদিকে ওদিক হলেই সর্দি কাশি।

এখন এটাচিটা নিয়ে হাঁটায় শরীর আর টাল মেরে যাচ্ছে না। টর্চ সঙ্গে এনেছে, কিন্তু সাদা জ্যোৎস্নায় টর্চ জ্বালার দরকার হয় না। সে নির্বিঘ্নে হেঁটে যাচ্ছিল—আর চারপাশটা দেখছিল। মানুষজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। লাইট আসায় দূরের ঝোপজঙ্গলে আর এখন অন্ধকার গুঁড়ি মেরে থাকে না। নির্জন মাঠে দাঁড়িয়ে গাছ-গাছালির মধ্যে বাড়িঘরের আলাদা এক মাধুর্য টের পায় সে।

জায়গাটা কী ছিল, কী হয়ে গেল! জমির দর চড় চড় করে বাড়ছে। এক কাঠা জমি হাজার তিন টাকার কমে হয় না। কত পরিবর্তন! অথচ তার বাড়িতে সে পরিবর্তনের কোনো ছাপই পড়েনি। লাইট নেবার ক্ষমতা অমরের হয়নি। সেজ ভাই মনোজ মার সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বৌকে নিয়ে আলাদা বাড়ি করে পাশেই উঠে গেছে। কী-রকম লাগে ভাবতে! এরা সবাই একই গাছের ডালপালা আর মনেই হয় না। এখন এক একজন আলাদা গাছ হয়ে গেছে। সম্পর্ক শূন্য।

তার কেমন দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। মা বাবা ভাই-বোন ছিল তার কাছে চন্দ্রকিরণের মতো। সাহস যোগাত, স্বপ্ন দেখাতো, দূরের মাঠে যেতে বলত, কোথাও কেউ অপেক্ষা করে আছে একসঙ্গে হেঁটে যাবে বলে, এবং বিয়েটা শেষ পর্যন্ত সে করেছিল একজন চাকুরিজীবী মেয়েকে। দু'জনের উপার্জনে সে এবং সবাই ভালভাবে বেঁচেবর্তে থাকবে ভেবে। তার পরের বোন দশ বছরের ছোট, মনোজ বার বছরের, অমর আর কণা যমজ, তার সঙ্গে তাদের বয়সের ফারাক অনেক। নিরুপায় বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সব দায়িত্ব কাঁধে নেবার সময় একটা ক্ষেত্রেই তাকে পীড়া দিয়েছে। দাদা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। বয়স যত বেড়েছে, জীবনে যত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তত এই ক্ষোভ জমতে জমতে এক সময় পাহাড় প্রমাণ হয়ে গেছে। প্রমীলাও মাঝে মাঝে মাথা ঠিক রাখতে না পারলে বলত, তাঁরা কেবল তোমারই মা বাবা, তোমার দাদার নয়! সারা জীবন মাথার উপর এত বড় বোঝা নিয়ে হাঁটছ কখন একদিন মুখ থুবড়ে পড়বে দেখবে! তখন আমাদের একটা কানাকড়ি দিয়ে কেউ সাহায্য করবে না।

সমর হেসে বলত, বোঝা নিয়ে হাঁটতে শিখতে হয় প্রমা। না হলে মানুষ বড় একা হয়ে যায়।

এ-সব দার্শনিক কথাবার্তা স্ত্রী একদম পছন্দ করত না। বলত, অপমান তোমার নেই। নিজের ছেলেদের পৈতে দিতে পারলে না, দাদাটি তো বেশ দু-ছেলের ঘটা করে পৈতে দিল। বাবার কাজের সময় কেউ হাত

উপুড় করেছে! ঘটা করে কাজ করেছ, ছেলের কাজই করেছ। কিন্তু উচিত অনুচিত বুঝবে না! সবারই দায়িত্ব আছে।

সমর বোঝাবার চেষ্টা করত, প্রমা, আমার তো ভালই লাগে। আমি করছি।

প্রমার ঝাঁঝ বোঝা যেত তখন। বলত, আসলে তোমার অহংবোধ থেকে এ-সব করছ। কত লায়েক তুমি, ভাইয়েরা রাঙাদা বলতে অজ্ঞান, ঠুনকো মান অপমান থেকে করছ। নিজে খালি হয়ে যাচ্ছ বুঝতে পারছ না। একদণ্ড বিশ্রাম নাও না। কোথাও বেড়াতে বের হয়েছ! একবার পুরী নিয়ে গিয়ে উদ্ধার করেছ।

আসলে সমর বোঝে সে অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীর দিকটা ভাল করে বুঝে দেখেনি। কলকাতায় একটা কারখানায় কাজ নিয়ে আসার পরই মনে হয়েছিল, সে জলে পড়ে গেছে। সে নির্বান্ধব। বাবার মাসোহারা পাঠাতে দেরি হলেই চিঠি আসত। বাবা লিখতেন, দোকান বাকি থেকে, ভাই বোনদের স্কুলের মাইনে অসুখ বিসুখে কত ধার হয়েছে এ-সব। একবার লিখেছিলেন, মাসোহারা তোমার তেষট্টি সালে যা ছিল সাতষট্টি সালেও তাই-বলে দুটি ফর্দ পাঠিয়ে ছিলেন, একটি তেষট্টি সালের জিনিসপত্রের দরদাম দিয়ে, আর একটি সাতষট্টি সালের। প্রথম এবং শেষবারের মতো সেবারেই মাথা ঠিক রাখতে পারেনি সমর। সেও একটা তালিকা পাঠিয়ে দিয়ে লিখেছিল, কলকাতায় জিনিসপত্র জলের দরে বিক্রি হচ্ছে বাবা, আপনারা সবাই আপাতত এখানেই চলে আসুন। আমরা সুখে থাকব, আপনারা কষ্ট করবেন সে হয় না। চিঠি পাবার পর বাবা বছরখানেক আর চিঠি দেননি। সমর বাবার মাসোহারা ঠিক পয়লা তারিখে পাঠিয়ে দিয়েছে। বাসাভাড়া, দুই পুত্রের স্কুলের খরচ একজন কাজের লোকসহ সব সামলাতে গিয়ে দু-হাতে মেধা বিক্রি করেছে। স্বামী-স্ত্রীর রোজগারে কলকাতার খরচই চলে না। প্রমা রাত জেগে লিখতে দেখলেই ক্ষেপে যেত—কী দায় পড়েছে। কোনদিন মাথা ঘুরে পড়ে মরে থাকবে—বলে সব টেনে নিয়ে যেত। বলত, যাও শুয়ে পড়। তোমার বাড়ির টাকা পাঠিয়ে দরকার হয়, শুধু না হয় ডাল ভাতই খাব। আর একটা অক্ষর লিখেছ তো আমার মাথা খাও।

সে কেমন বুঁদ হয়ে গেছিল ভাবনার মধ্যে। কখন বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পায়নি। বাবার লাগানো সার সার আম গাছ সব বিশাল ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার সামনে গাছের ছায়া পার হলে অমরের কুঁড়ে ঘর। দু'দুবার দোকান বসে গেলে থোক টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে—বছরখানেক আগে আতপ চাল রাখার দায়ে পুলিশের হামলা—প্রায় দশ কুইন্টাল চাল আটক করে পুলিশ মামলা দায়ের করেছে। মামলার খরচ সহ যতটা সম্ভব সাহায্য করার সে করছে। সবই এখন গোপনে। ঘরে আলোও জ্বলছে না। গাঁয়ে রাত একটু বেশি তাড়াতাড়ি হয়। পাশে গোয়ালঘর, গরুটা শুয়ে জাবর কাটছে। এখন সম্বল বলতে শুধু এই গরুর দুধ, আর তার পাঠানো মাসিক বরাদ্দ। আম গাছের ছায়ায় সে এসে দাঁড়াল। আশেপাশের বাড়িতে লাইট আসায় তার কিছুটা আলো এ-বাড়ির অন্ধকার কিছুটা পাতলা দুধের মতো আবছা। কেমন নিজীব ভিতরে আতঙ্কের সামিল গোটা বাড়িটার অস্তিত্ব। তার ভয় ধরে গেল। আর কিছুটা ভিতরে ঢুকলে মাটির দেয়াল, টিনের চৌচাল ঘরটা। সামনে তুলসী মঞ্চ। ঘরটায় মা আর বড় ভাইঝি থাকে। সে বারান্দায় উঠে ডাকল, মা আমি সমর। দরজা খোলো।

কোনো সাড়া শব্দ নেই। বয়েস হয়ে যাওয়ায় কানে কম শোনে। বাবার মৃত্যুর পর দশ বছর কেটে গেছে। মা এখনও সক্ষম। ইদানিং জরায়ুর অসুখ। মাঝে মাঝে রক্তপাত হয়। সমর তার ছোট ছেলেকে বলেছিল, কী করবি, একবার তোর কলেজে ভর্তি করে দিলে হয়। ছোট ছেলের এক কথা, এ-বয়সে বাবা খোঁচাখুঁচি করবে! ভেবে দেখ। তা ঠিক। মার তো আশি পার হয়ে গেছে। অথচ কী সক্ষম—নিজে স্বপাকে খান। উঠোন নিয়মিত ঝাঁট দেন। শুকনো পাতা ডাল সংগ্রহ করে রাখেন জ্বালানির জন্য। বাড়ি ছেড়ে একদণ্ড কোথাও গিয়ে স্বস্তি পান না।

সে আবার ডাকল, মা আমি সমর। মা মা !

কোনো সাড়াশব্দ নেই। মা কানে কম শুনতে পারে, কিন্তু প্রীতি! সে তো সাড়া দেবে।

সহসা মনে হল, অমরের ঘরে আলো জ্বালছে কেউ বলছে, এই ওঠো, রাঙাদা এসেছে। দরজা খুলে অমর বৌমা আর বাচ্চা তিনটেও বের হয়ে এসেছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে বলছে, কটার ট্রেনে এলি! অমর বারান্দায় উঠে দরজায় ধাক্কা মারল। ডাকল, মা মা রাঙাদা এয়েছে। ওঠো।

মা এবার ভিতর থেকেই সাড়া দিল, প্রীতি যাত্রা দেখতে গেছে।

অমর বলল, তুমি ওঠো না। রাঙাদা এসেছে।

—কে এসেছে?

—রাঙাদা।

—এত রাতে কে এল?

—রাঙাদা। কী বলছি শুনতে পাচ্ছো না। অমর চিৎকার করে কথা বলছে।

—অ সমু এয়েছে। সমু। বলে মা বোধ হয় কিছু হাতড়াচ্ছে। আর বিড় বিড় করে বকছে, এত করে বললাম যাস না। শোনে। কেউ শোনে। দেশলাইটা মরা যে কোথায় রেখে গেল।

—বৌমা এবার এগিয়ে গেল। —দরজাটা খুলুন।

মা অন্ধকারেই দরজা খুলে দাঁড়ালে সমু গড় হল। বলল, কোথায় যাত্রা দেখতে গেছে?

—মিলে।

সমর জোরে কথা বলছে। প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে। মা কেমন অসার চোখে তাকিয়ে বলছে, কিছু দেখতে পাই না। কী যে ছানি কাটালি। সব আবছা দেখি বাবা। আয়। ভিতরে আয়। কী খাবি! চোখে মুখে জল দে। প্রিয় তোকে চিঠি দিয়েছিল! পেয়েছিস বাবা।

প্রিয় মানে প্রিয়ব্রত। বীণার বর। এক হাজার টাকা নগদ, হাতে কানে গলার গহনা, মেধা বিক্রি করে তখন এত টাকা হত না। কী লড়ালড়িটাই না গেছে। বাবার এক কথা, বিয়েতে খাট ড্রেসিংটেবিল দিতে হবে। বীণা স্কুলে মাস্টারি করে। দেখতে খুব সুন্দর না। প্রিয়ব্রতর বাবা বীণার চাকরির লোভে সম্বন্ধ ঠিক করে বলে গেছিল, এ-সব না দিলে মান সম্মান থাকবে না।

ভগ্নিপতিদের নাম শুনলেই তার কেন যে নগদের টাকাটার কথা মনে হয়। কোথায় যেন এতে মানুষের নীচতা সে টের পায়। ছোট বোনের বেলায়, নগদের আড়াইশ টাকা যোগাড় করতে পারেনি বলে বর আটকে রেখেছিল তার মামারা। সে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে এসেছে। কম্পাউণ্ডার বরের মামারা তাঁত চালায় মিলে। মা বাবা নেই। মামারাই অভিভাবক। সে ক্ষমা চেয়ে বলেছিল, আমি কথা দিচ্ছি, কলকাতায় গিয়ে খাই না খাই বাকি টাকাটা পাঠিয়ে দেব। মাত্র আড়াইশ টাকার জন্য আমার বোনের এত বড় সর্বনাশ করবেন না। এ-সংসারের জন্য তার হেনস্থা দেখে প্রমার চোখে সে কী জ্বালা ফুটে উঠেছিল সেদিন। সবাই নির্বিকার। সমরই সব।

এই অপমান, তাকে যতটা না কাবু করেছিল, প্রমাকে করেছিল তার চেয়ে বেশি। বাড়ির চিঠি এলে মুখ গোমড়া করে রেখেছে। প্রমার কাছে একমাত্র বাবা বাদে মনে হয়েছে সব অমানুষ। তার অভিযোগ, কোথাকার কী সব অশিক্ষিত মানুষ, তাদের কাছে গিয়ে তোমাকে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে হল! বাড়ির বড় ছেলের কোনো দায় নেই!

সমর বুঝেছিল প্রমার সঙ্গে বাড়ির সবার তিক্ততা ক্রমে বাড়ছে। নিষ্ক্রিয় স্বভাবের মানুষ সব। তা দোকান বাকি, ভেব না, সমরকে চিঠি লিখছি। সে ঠিক পাঠিয়ে দেবে। নগদ হাজার টাকা, ভেব না, সমর যখন আছে সব হয়ে যায়। পাত্র হাতছাড়া করা যাবে না। চিঠির পর চিঠি। একটা চিঠিও সমর পায়নি যাতে বাবার অভাব অভিযোগের কথা লেখা থাকত না। চিঠি এলেই প্রমার মুখ গোমড়া হয়ে যেত। লোকটার সঙ্গে বাড়ির সবার শুধুই টাকার সম্পর্ক। শুধু বাড়ি কেন, আত্মীয় স্বজনরাও এসেছে একই কারণে। তার সংসারের ভাল মন্দের খবর কেউ নেয়নি। তার সংসারেও যে পোকামাকড়ের উপদ্রব আছে, অসুখ-বিসুখ আছে, মানুষটার ভবিষ্যৎ আছে, তার নিজের ছেলেদের ভবিষ্যৎ আছে, একবার বোধ হয় কেউ এটা ভেবে দেখে না! না হলে

কলকাতার কাছে শহরতলিতে চার কাঠা জমি জলের দরে কেনার পর বাবার চিঠি আসত না, তোমার শেকড় আলগা হয়ে গেছে।

মা প্রতিবেশীদের বলত, সমু আমার আর নিজের নেই। বৌমার কথায় চলে। বৌমা সমুকে নিয়ে আলাদা থাকবে বলেই জমি কেনা। সমর বাড়ি গেলে, বাবা গম্ভীর গলায় বলেছেন, তোমার এটা খুবই অনুচিত কাজ হয়েছে। টাকাটা দিয়ে এখানে তুমি পাকা ঘর তুলতে পারতে। শেষ বয়সে তোমার মার অন্তত একটা বাসনা পূরণ হত। বাবার পাশে বসে থাকলে তখন সমর কেন যে সত্যি ভাবত, এটা তার অনুচিত কাজ, সেও কম স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক নয়! প্রমাকেও মনে হত বড় বেশি আত্মপর। কাকারা বলতেন, তুই নাকি কলকাতায় বাড়ি করছিস!

সমুর তখন বলতে ইচ্ছে হত, বাড়ি; হ্যাঁ তা বাড়িই বটে। ভণ্ডুল মামার বাড়ি হবে। একদিন তুলতে তুলতে আর একটা দিক ভেঙ্গে পড়বে। প্রমার জেদে পড়েই জমি কেনা। বাড়ি করার সামর্থ্য হবে সে স্বপ্নেও ভাবে না।

প্রমার একটাই কথা, আমি আমার ছেলেদের নিয়ে ভেসে যেতে রাজি না। আর আশ্চর্য, জমিটা কেনার পরই তার ভাগ্য যেন কিছুটা সুপ্রসন্ন হয়ে উঠল। না হলে একসঙ্গে হাজার টাকা অগ্রিম কেউ দেয় সে কল্পনাই করতে পারে না। টাকাটা হাতে আসতেই সে ভাবল বাড়ির ভিতটা করে ফেললে হয়। হাতে থাকলে খরচ হয়ে যাবে। বাড়িতে বাবা মা ভাই বোনদের জন্য একটু বেশি বেশি পুজার কেনাকাটা এবারে আর নাই হল। তের টাকা বস্তা সিমেন্ট, একশ পাঁচ টাকা হাজার ইট—দরদাম করে বুঝেছিল, যতটুকু এগিয়ে থাকা যায়। নিজের বাড়ি। ভাবতেই আনন্দে তার সারা শরীর কেমন মাতাল হয়ে পড়েছিল। নিজের বাড়ি, নিজের বাড়ি—চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হত—আমার নিজের বাড়ি!

বাড়ি যখন উঠতে শুরু করেছে, তখনই বাবার চিঠি এসেছিল, তোমার ছোট বোনের সম্বন্ধের কথা চলছে। পাত্রপক্ষ পলাশ চক্রবর্তীর ভাগ্নে। তুমি তাকে চেন। পত্রপাঠ বাড়ি আসবে। তোমার সঙ্গে তারা কথা বলতে চায়। মনে হয় এ-সম্বন্ধ হাতছাড়া হলে তুমি সারা জীবন পস্তাবে। সমর পত্রপাঠই বাড়ি চলে গেছে। বাড়ি উঠছে তার। পাকা বাড়ি। তাও আবার কলকাতায়। যে বাড়িটায় সে বড় হয়েছে, কৈশোর যৌবন কেটেছে, তার কোনো পরিবর্তন নেই। দুটো মাটির ঘর, দুটো পাটকাঠির ঘর—রান্না ঘরে তালপাতার ছাউনি। ঠাকুরঘর একদিকে, কলপাড়ে কাদা জমে থাকে। বাড়ি গিয়ে নিজেরই ভারি সংকোচ হচ্ছিল। দাদাকে আত্মপর ভেবেছে, সে কী! এই অপরাধবোধই শেষ পর্যন্ত পাত্রপক্ষের সব দাবিদাওয়া মানতে বাধ্য করিয়েছিল তাকে। এমন কী নগদ হাজার টাকা। তার এতদিনকার একগুঁয়েমি নগদ এক পয়সা দেব না জেদ সব নিমেষে উধাও হয়ে গিয়েছিল। মেধা বিক্রির টাকা, কার কাছে কীভাবে অগ্রিম বাবদ নেবে, এই সব ভাবতে ভাবতে মাথা খারাপ হবার যোগাড়। বাড়ির কাজ বছর তিন পিছিয়ে গেছিল। প্রমার আচরণ আরও তিক্ত হয়ে উঠেছিল। সংসারে শান্তি নষ্ট হচ্ছে। সে কিছুই ভ্রূক্ষেপ করেনি।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল, যে সাপটা গর্ত থেকে মুখ বার করেছে, সেটা এখন তার গায়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। মা হারিকেন হাতে ভিতরে ঢুকে বলল, আয়। সে ভিতরে ঢুকে তক্তপোশে বসল।

মা বলল, কী খাবি।

সমর বলল, সেদ্ধ ভাত কর। ওতেই হয়ে যাবে।

ছোট বৌমা ঘরে ঢুকছে না। ছেলে মেয়েদেরও ঢুকতে দিচ্ছে না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শুধু জামা গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবকটা প্রায় যেন উলঙ্গ। বড়টি সাত বছরের, মেজটি বছর পাঁচেক। ছোটটি মেয়ে। বছর তিন বয়স হবে। সমর বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত চিঠি না লিখে, থাকতে পারেনি—আর যদি কোনো সন্তান-সন্ততি হয়, আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক ছেদ ঘটবে। এ-সব কী হচ্ছে! কী খাওয়াবে পরাবে ভাবছ! শুধু জন্ম দিয়ে খালাস। এ-সব চিঠি লেখার সময় নিজেরই খারাপ লেগেছে। বাবা বেঁচে থাকলে এমন চিঠি সে লিখতে পারত না। বড়দার বেলাতেই দেখেছে—বাবার কী রাগ! তুমি কে বলার! পৃথিবীতে কে আসবে না আসবে

তার দায় তেনার। খোদার উপর খোদগিরি করছ বলেই তোমাদের এত অসুখ বিসুখ লেগে থাকে। বাবার আস্কারাতেই দাদা মহা আনন্দে সংসারের এ-দিকটায় বিন্দুমাত্র গাফিলতি দেখায়নি।

অমর ডাকল, মা তোমার কিছু করতে হবে না। ছোট বৌমাও সঙ্গে সঙ্গে বলল, ডিমের ঝোল ভাত করে দিচ্ছি রাঙাদা। বলে ছুটে কলপাড়ে চলে গেল। বারান্দায় হাতমুখ ধোয়ার জন্য এক বালতি জল রেখে গেল। সাবান সব। মা শুনতে পায়নি বোধ হয়, ওদিকের বারান্দায় মার হেঁসেল। পাঠকাঠি ভেঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে দেখে সমর বলল, তোমায় কিছু করতে হবে না। বৌমা করে দিচ্ছে।

অমরের বড় ছেলেটা বলল, জেঠু কাল থাকছ তো! একটু বেশি পাকা পাকা কথা বলার স্বভাব। সমরের হাসি পেল। বলল, প্যান্ট পরে আয়। বড় হয়েছিস। তিনজনই দৌড়ে চলে গেল। প্যান্ট পরে এসে আবার বারান্দায় দাঁড়াল। সমর বলল, ভিতরে আয়।

মেজ ছেলেটা বলল, না। মা বকবে।

—বকবে কেন! আয় বলছি! আমার পাশে বোস।

আসলে সমর বোঝে মার আদরের নাতনি প্রীতিকে নিয়ে ছোট বৌমার সঙ্গে লড়ালড়ি চলছে। কিছুদিন আগে মার চিঠিতেই সে তা টের পেয়েছে। মা লিখেছে, অমরের দুধ খাওয়া যায় না বাবা। বৌমা জল মিশিয়ে দেয়। অমরকে আমিই লিখেছিলাম, বিকেলের দুধ থেকে মাকে আধসের দুধ দেবে। শত হলেও তিনি আমাদের মা। সে কথা রেখেছিল। কিন্তু মাস দুই যেতে না যেতেই চিঠি, শেষ বয়সে একটু দুধ পর্যন্ত খেতে পাই না। অমর দুধ দেয় না। বাধ্য হয়ে সমর লিখেছিল, ঠিক আছে আলাদা দুধের টাকা পাঠাচ্ছি। তুমি ভাববে না। মাসোহারার সঙ্গে দুধের বাবদ সে আরও পঞ্চাশ টাকা বাড়তি পাঠিয়ে যাচ্ছে।

মাটিতে আসন পিঁড়ি হয়ে খাওয়ার অভ্যাস সমরের নেই। শরীরে তার অন্য অভ্যাস গড়ে উঠেছে। শীতকাল ছাড়া সে বাড়িও আসতে সাহস পায় না আজকাল। ঘরের দুটি জানলা বড় ছোট। আলো হাওয়া ঢোকে না। পাখা নেই। গরমে এলে তার বড় কষ্ট হয়। সে হাঁসফাঁস করে। সাপখোপেরও ভয় থাকে। এলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। মার তখন অভিযোগ—সবই করলি, বাড়িটার দিকে তাকালি না। দু-দিন এসে যে থাকবি তাও পারিস না।

ভাতের থালা মা এগিয়ে দেবার সময় বলল, সাপ নিয়ে আমি ঘর করছি বাবা। কিছু একটা কর? আপদ দূর না করলে আমি যে মরেও শান্তি পাব না।

সমর বোঝে মার এই নালিশের হেতু কী। দাদা বড় ভাইঝির কোনো দায়িত্ব নিতেই রাজি না। প্রীতির তো কম বয়স হল না। সম্বন্ধ দেখতে সে সাহস পায় না। পরে কিছু হলে দোষের ভাগী সে হবে।

সময় ভাত ভাঙ্গার সময় বলল, বলেছি তো সম্বন্ধ দেখ। আমার যথাসাধ্য আমি করব।

মার এক কথা।—তুই মাথা না পাতলে হবে না। তোর নিজের একটা মেয়ে থাকলে কী করতিস। বিয়ে দিতিস না। ফেলে রাখতে পারতিস! তোর কোনো সম্বন্ধই পছন্দ হয় না।

সমর কথা বলছে না। আস্তে আস্তে ভাত ভাঙছে। কী বলবে। বিচিত্র সব বায়নাক্কা পাত্রপক্ষের। প্রীতি যদি লেখাপড়াটাও করত। অন্তত স্কুল ফাইনাল পাসও হত। ঠাকুরদা ঠাকুরমার আদরে লোক দেখানো স্কুলে যাওয়া আসা সার করে লাউডগার মতো বেড়ে উঠেছে। পাত্রপক্ষ হয় ট্যাকসি ড্রাইভার, নয় স্যালো চালায়, অথবা রেলে কাজ করে—কখনও পুলিশ পাত্রপক্ষ, দাবির কথা শুনলে মাথা ঘুরে যাবার যোগাড়। দশ পনের হাজার টাকা নগদই চায়-সেই মত দান সামগ্রী। এত দেবে কোত্থেকে সে! অথচ মার চোখের দিকে তাকাতে সে সাহস পায় না। গলায় কাঁটা ঠেকে আছে।—আমার এটাই শেষ আবদার তোর কাছে বাবা। তুই রাজি হ। সে রাজি হয় কী করে। এবারের সম্বন্ধটি খারাপ না। মধ্য বয়সী। পাত্র কলকাতায় ল পড়ার সময় পাগল হয়ে যায়। হাতের সামনে কাগজ পেলেই কুটি কুটি করে ছেঁড়ার অভ্যাস ছিল। এখন ভাল হয়ে গেছে। পাত্রের মার দাবি ছেলে আমার এখন ভাল হয়ে গেছে। তার আইন পড়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ল পাস করলে বিয়ে। পাত্রের শহরে বাড়ি আছে। কেবল ল পাস করলেই প্রীতির সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা হতে পারে।

ভগ্নিপতি প্রিয়ব্রতও চিঠি লিখে জানিয়েছিল, দাদা এটাই একমাত্র উপায়। আপনি এসে পাত্রটিকে দেখুন। পছন্দ হবে। আপনার বাড়িতে রেখে কলকাতায় পড়ার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। দাবিদাওয়া এই একটাই। আপনি রাজি হলে মা এ-যাত্রা রক্ষা পায়।

তারও মনে হয়েছিল, মন্দ না। সে প্রমীলাকে প্রস্তাবটা দিতেই ক্ষেপে গিয়েছিল—কী বললে! একটা অচেনা মানুষ আমার বাড়িতে এসে উঠবে।

ওর মুখ তিক্ততায় কালো হয়ে গিয়েছিল। তবু সমর হেসে বলেছিল, হবু জামাইকে না হয় দু-বছর বাড়িতে রাখলেই।

প্রমীলা তখন চাপা ক্ষোভে ভেঙ্গে পড়েছিল। বলেছিল, আসতে পারে। তুমি হবু জামাইটিকে নিয়ে থাকবে। দুচোখ যেদিকে যায় আমি চলে যাব। তারপরই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল, তোমার বাড়ির লোকেরা ভাবে কী! আমি মানুষ না। আমরা মানুষ না। তুমি অফিসে চলে যাও বিকেলে, কত রাত হয় ফিরতে তোমার। তার কলেজের ভাত করে দেওয়া, তার যত্ন আত্তি করা, তাছাড়া একটা অচেনা লোক সারাদিন বাড়িতে থাকবে, তার পাগলামি যদি দেখা দেয় কে সামলাবে! তুমি না আমি! বল! বল! চুপ করে থাকলে কেন?

সমর খেতে খেতে বলল, আমি কিছু ভাবতে পারছি না মা। প্রমীলা রাজি না। আমি কী করব।

মাও কেমন উত্তপ্ত, সংসারে এত টাকা কে কামায়। তুই না বৌমা। আমি তোকে পেটে ধরিনি। আমার আবদার থাকতে পারে না! কিছুই তো করলি না। সারাজীবন বৌ-এর কথায় চললি! বৌ ছেলেরাই তোর সব। আমি তোর কেউ না!

সমর জবাব দেয়নি। কারণ কৈশোরের রাস্তার সে এখনও হেঁটে যাবার স্বপ্ন দেখে। মা বাবা ভাই বোনেরা সেই রাস্তার শেষ প্রান্তে জেগে বসে আছে যেন—সবারই আশা সমু আসছে। তাকে দূর থেকে দেখলেই মনোজ ছুটে যেত চিৎকার করে, মা দাদা আসছে। দাদা সারাদিন পর সবার জন্য দু মুঠো অন্ন সংস্থান করে ফিরছে। এই দৃশ্যটা সে এখনও ভুলতে পারে না।

প্রীতি এসে বলল, কাকা কখন এলেন!

সমর শুয়ে থেকেই জবাব দিল, রাত বিরেতে কোথায় যাস। মা একা থাকে।

প্রীতি বলল, আমি কী করে জানব আপনি আসবেন। রবিদার বৌরা গিয়েছিল। ওদের সঙ্গে গেছি। সমরের ঘুম পাচ্ছিল। মনোজ এল দেখা করতে । সে মশারির নিচ থেকেই বলল, সবাইকে খবর দিস আমি এসেছি।

সকালে উঠে বাড়িটার চারপাশে ঘুরে বেড়াল সমর। বাড়ি এলেই এটা তার বিলাস। বাবা বাড়িটা জুড়ে কতরকমের ফুল ফলের গাছ লাগিয়ে গেছেন। পঁচিশ ত্রিশ বছরে গাছগুলি আর গাছ নেই, বৃক্ষ হয়ে গেছে। আম জাম কাঁঠাল নারকেল হেন ফলের গাছ নেই বাবা লাগিয়ে যাননি। তাঁর উত্তরপুরুষদের জন্য এসবই স্মৃতি রেখে গেছেন। বাঁশঝাড়ের দিকটায় এসে মনে হল খালি খালি লাগছে। এই সব গাছপালার ছায়ায় ঘুরে বেড়ালে সে এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করে। সে তার অতীতকে খুঁজে পায়। ভাল করে লক্ষ্য করতেই দেখল, আবার মা একটা গাছ বিক্রি করে দিয়েছে। পাঁচ সাত বছর ধরে দু চারটা গাছ যে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সে সেটা জানে। তার এখানটায় এসে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবা গাছের ডালপালা ভাঙ্গলে পর্যন্ত রেগে যেতেন। বলতেন, দিই তোমার কান ছিঁড়ে, হাত ভেঙ্গে, কী রকম লাগবে টের পাবে। বাবার সঙ্গে গাছগুলির এমনই সম্পর্ক ছিল।

এ সময় দেখল, অমর চুপি চুপি তার কাছে হাজির। কিছু বলতে চায়। সে মুখ তুলে তাকাতেই বলল, দাদা ওরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

সমর অবাক হয়ে বলল, ষড়যন্ত্র!

হ্যাঁ দাদা। বলছে সামনের প্লটটা দুভাগ করবে। একটা অংশ বড়দাকে দেবে। আমি কিন্তু বলে রাখছি ওটা আমি ছাড়ব না।

অমরের রোগা শরীর—ধূসর এবং ফ্যাকাসে। কতই বা বয়েস! এরই মধ্যে চুলে পাক ধরেছে। শরীর ভেঙ্গে গেছে। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় মাথা ঠিক না থাকারই কথা। সমর বলল, ঠিক আছে, সামনের সব জমিটা তোরই থাকবে। শত হলেও সবার ছোট। সে ভেবেছে, কেউ তার কথায় আপত্তি করবে না।

বাড়ি ফিরে এলে দেখল, প্রিয়ব্রত হাজির। সে জলচৌকিতে বসে। এদিক ওদিক কিছু কথার পর বলল, রেকর্ডে ওয়ারিশানদের নাম দিতে হবে। আমি বলেছিলাম, মার নামেও একটা অংশ রেকর্ড করানো হোক। তাছাড়া আপনারা চার ভাই...বলেই থেমে গেল প্রিয়ব্রত।

সমর বলল, পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগ তো শুনেছি মেয়েরাও পায়।

প্রিয়ব্রত বলল, তা পায়।

সমর কেমন দ্বিধায় পড়ে বলল, তাহলে বোনেদের সম্পত্তির দরকার।

প্রিয়ব্রত মানুষটি ঠাণ্ডা মেজাজের এবং বিবেচক। সে বলল, সাধারণত মেয়েদের এসব ক্ষেত্রে দাবি না তোলাই ভাল। প্রিয়ব্রত তার নিজের স্ত্রী অর্থাৎ বীণার নাম করে বলল, ওর একটাই দাবি, মার নামে সমান অংশ লিখে দিতে হবে। সামনের জমিটাতে দুটো প্লট করে একটা অংশ বড়দাকে দিতে হবে।

সমর ছোট বোনকে ডেকে পাঠাল। বলল, জমি নামে নামে রেকর্ড হচ্ছে। আইনত তুইও অংশীদার। তোর কী মত।

ছোট বোন এতটুকু দ্বিধা না রেখে বলল, আমার দুটো মেয়ে বড় হচ্ছে দাদা। ওদের বিয়েথা আছে। দরকারে বিক্রি করতে পারব। দিদি ছাড়লেও আমি ছাড়তে রাজি না।

সমর বলল, তাহলে আর বীণাকে বাদ দিয়ে কী লাভ। তার নামেও রেকর্ড হবে। শুধু মার নামে কোনো রেকর্ড হবে না। মা যতদিন আছেন, আমার অংশে থাকবেন।

এতক্ষণে বীণা মনোজ হাজির। অমর তার ঘরে বসে আছে। মা যাতে শুনতে পায় সেজন্য সব ভাই বেশ জোরে জোরে কথা বলছে। অমর ঘরে বসে সব শুনতে পাচ্ছে।

সমর বলল, আমি কাল সকালের ট্রেনে চলে যাব। ফর্ম এনে সই করিয়ে নাও। সামনের অংশটা অমরকেই দাও। পাশ দিয়ে আটফুটের একটা রাস্তা বের করে নেবে ভেতরে ঢোকার।

বীণা বলল, তা হবে কেন। রাস্তার সামনের জমি, ভেতরের জমির দাম এক নাকি—তোর এটা কেমন বিচার। বড়দাকে নাকি বলেছিস, বাঁশঝাড়ের দিকে বাড়ি তুলতে? পাঁচ-সাতটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে খাবে কী। মারও অংশ রাখতে হবে। জমি সাত ভাগ হবে।

সমর না বলে পারল না, মাকে নিয়ে তোদের এত ভাবনা কেন বুঝি না। মাকে তোরা দেখিস?

আর তখুনি সমর দেখল, ঝড়ের বেগে লাফাতে লাফাতে অমর উঠোনে হাজির। ওর চোখে জ্বলছে। গায়ে ফতুয়া। কেমন উন্মত্তের মতো চেহারা। সমর ভয় পেয়ে গেল। অভাবে অনটনে মাথার ঠিক নেই। সে এসে উঠোনে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিয়েছে। হবে না। কিচ্ছুতেই হতে দেব না। আমার জমিতে যে আসবে লাস নামিয়ে দেব। মার নামে রেকর্ড হবে। কেন হবে! আদরের নাতনিকে মা দিয়ে যেতে পারবে তবে। এদের সব ষড়যন্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে বৌমাও হাজির। সেও চিৎকার করে বলছে, আমরা বুঝি না কিছু, কচি খুকি? দাদা, আপনি যে এত টাকা পাঠান মার নামে, কী হয় জিজ্ঞেস করুন। বাঁশঝাড়ের বাঁশ বিক্রি, গাছের ফল বিক্রির টাকা কী হয়। ঘরে একটা বাসন আছে! সব বড়দির বাসায় নিয়ে তুলেছে। আপনি এলে কলাই করা থালায় ভাত বেড়ে দেয়। আপনার চোখ নেই—দেখতে পাননা। মিথ্যে মিথ্যে চিঠি লিখে আপনার কাছ থেকে টাকা আনায়। সব জমা পড়ছে। মার দরদ সবার উথলে পড়ছে। একটা সিনেমা বাদ যায়। আপনার টাকায় মচ্ছব।

সমর বিরক্ত হয়ে বলল, বৌমা ঘরে যাও বলছি। যাও। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন।

সে সব বোঝে। মার আদরের নাতনিকে নিয়ে অশান্তি কেন বোঝে। মা ছোট থেকে বড় করে এখন ফাঁপরে পড়ে গেছে।

বৌমা আবার চেঁচাতে থাকল। মান সম্ভ্রমের বালাই এতটুকু নেই।—কার টাকায় সেলাই মেসিন কেনা হয়েছে! আপনার টাকায়! আপনাকে চুষে নিচ্ছে।

অমর ফের চিৎকার করছে, আজ থেকে না। বাবা বেঁচে থাকতেই, সব দিদির বুদ্ধিতে হয়েছে। দিদি সেজদা চাকরি করত। দিদি বাবাকে কি পয়সা দিয়েছে! থাকতিস সাজাপুরে। খেতে লাগে না পরতে লাগে না। কথায় কথায় শোনাবে, দাদা করছে, আমরা করিনি। তুই কী করেছিস, কত মাইনে পেতিস। করতিস মাদার টিচারের কাজ। কী মাইনে, গোপনে তুই টাকা জমিয়ে সোনার জিনিস করেছিস। বিয়ের সময় হাত ভর্তি গয়না এসব তোর কোত্থেকে!

সমর কেমন হতবাক হয়ে গেছে। সে বিশ্বাসই করতে পারছে না, একই গাছের ডালপালা ছিল তারা। এখন সবাই গাছ হয়ে গেছে ঠিক, দূরত্বও তৈরি হয়েছে অনেক। তাই বলে এতটা দূরত্ব, সে কেমন নির্বোধের মতো তাকিয়ে থাকল। এ কী দেখছে! সব ফাঁকা। একটা মৃত গাছ—তার ডালপালায় কটা শকুন বসে আছে। ঘাড় বাঁকিয়ে ভাগাড় খুঁজছে। সে অসহায় বোধ করতে থাকল। এটা কেন দেখল! এমন অশুভ দৃশ্য যেন জীবনেও তার চোখের সামনে ভেসে ওঠেনি।

অমরের সঙ্গে বীণার কথা কাটাকাটি চলছে। কিছুই কানে আসছে না! এরা কারা! বীণা বড়দার পক্ষ হয়ে লড়ছে কেন সমর তাও বোঝে। বীণার পরামর্শেই বাবা মা শেষ পর্যন্ত প্রীতিকে তার মা-বাবার কাছে পাঠায়নি। ভাইঝিকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। ছোট থেকে মা-বাবার সঙ্গে সেও তাকে বড় করেছে। কারও চেয়ে কম টান না তার।

সমর বার বার সতর্ক করে দিত।

বীণার এক কথা, আমিও চাকরি করি। বড়দা বড়বৌদি ওকে দেখতে পারে না। গেলে দূর দূর ছাড় ছাড় করে। ভাইবোনেরা ভাবে ভাগ বসাতে এয়েছে। বড়দার সংসারে সব হয়—শুধু প্রীতির বেলায় যত অভাব।

বীণা এখনও চাকরি করে। প্রীতির বিয়ের কিছুটা নৈতিক দায়িত্ব তার উপর বর্তে গেছে। বীণার নিজেরও দুটো মেয়ে আছে। মার অংশ বীণার অংশ বড়দার অংশ আর তার অংশ মিলে প্রায় বেশির ভাগটাই বীণার কব্জায় চলে যাবে। বাবার মৃত্যুর পর সমরই দু-ভাইকে ডেকে বলেছিল, তোমরা মাকে কিছু দিতে পার না। মা যতদিন আছে সব তিনি ভোগ করবেন। তিনি হাতে ধরে দিলে খাবে, না দিলে খাবে না। মার এই অধিকার প্রীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। মার ধকল প্রীতিই সব ভোগ করেছে। অমর মনোজ কথা রেখেছে—তারা বাদ সাধেনি।

অমর চিৎকার করছে, আমরা সব বানের জলে ভেসে এসেছি। আমরা ছেলেরা গাছতলায় গেলে হই হই করে তেড়ে যায়। আমরা চোর। আমার ছেলেরা চোর! আর তুই সতী! ভরিখানেক সোনা নিয়ে তুই বাবাকে বিশ্বাসঘাতক বলেছিস! বিশ্বাসঘাতকের সম্পত্তির অংশ নিতে লজ্জা করে না!

প্রিয়ব্রত তার স্ত্রীকে সামলাচ্ছে, কী হচ্ছে! তোমরা কী আরম্ভ করলে!

মনোজ মাথা নিচু করে বসে আছে। মা দেয়ালে হেলান দিয়ে কিছু শুনতে না পেলে বলছে, কী বলছে রে!

মনোজ বলছে, মা তুমি চুপ কর!

চুপ করব কেন! আমার নাতিন চোর! তোর বৌর নোলা তুই দেখিস না! চুরি করে গাছের সব সাবাড় করে দেখিস না।

মনোজ আর পারল না।—মা তোমার নাতিনকে চোর বলেনি। তুমি চুপ কর বলছি। শেষে অত্যন্ত ধীর গলায় বলল, সংসারে আগুন মা তুমি নিজেই লাগিয়েছ। সমরের দিকে তাকিয়ে বলল, বড় ছেলে মার সব কব্জা করতে চায় দাদা। প্রীতির এখন কী আদর! প্রীতি রানাঘাটে গেলে আর আসতেই চায় না। প্রীতির জন্য নতুন শাড়ি, ভালমন্দ সব হাতে করে নিয়ে আসে। প্রীতিকে হাত করতে পারলে সব হবে। সামনের প্লটের জমিটাও। দাদা এই ঘরে এসে উঠতে চায়। রিটায়ার করার পর শুনেছি আশি নব্বই হাজার টাকা পাবে।

পেনসন আছে। তার তবু অভাব। অমর কাল কী খাবে জানে না। মার নাতিনকে নিয়ে আমার সঙ্গে কম অশান্তি হয়নি। সাধে বাড়ি ছেড়ে গেছি!

সমরের মনে হচ্ছে একটা পেরেক কেউ তার ঘিলুতে পুঁতে দিচ্ছে। সাপটা তার গা বেয়ে উঠছে। জমি জমার এত ঝামেলা। অধিকার কেউ হারাতে রাজি না। সে এবার না পেরে উঠে দাঁড়াল। বলল, না, মার নামে জমির রেকর্ড হবে না। সামনের জমি অমরকে দেবে। এ-ঘরে এসে কেউ উঠতে পারবে না।

মা তাকিয়ে আছে সমরের দিকে। কিছুই বুঝতে পারছে না। কেবল বলছে, কী বলছে ছাই বুঝতে পারছি না।

মনোজ বলল, বলছে তোমার মাথা। তোমার কিসের অভাব! তুমি সব শুনতে চাও।

সমরই চিৎকার করে বলল, তোমার কোনো অংশ থাকবে না। তোমার অংশ নিয়ে পরে আবার লাঠালাঠি শুরু হবে। সম্পত্তি তোমার ছেলেমেয়েদের নামে রেকর্ড হবে।

—আমার নামে হবে না! মা ভারি আর্তগলায় কথাটা বলল।

সমর ফের চিৎকার করে বলল, না না না।

আর তখনই মা কেমন ভেঙে পড়ল বলতে বলতে, তুই যদি আমার আগে চলে যাস বাবা! আমাকে কে দেখবে! জমিটুকু থাকলে, সম্পত্তির লোভে আমি অন্তত খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারব বাবা। সম্পত্তির লোভে সবাই মা মা করে।

সমরের ভেতরটা সহসা একেবারে নড়বড়ে হয়ে গেল। শরীর গোলাচ্ছে। সে তো ভাবেনি, সে মরে যেতে পারে। সে তো একবার ভাবেনি, মরে যাবার পর মার কী হবে! মা তাও ভেবে রেখেছে। সে ভারি অসহায় বোধ করতে থাকল। সে কিছু আর বলতে পারল না। চেয়ারের হাতল ধরে বসে পড়ল। প্রীতির কোনো সাড়া শব্দ নেই। প্রীতি আবার কোথাও চলে যায়নি তো। চিরদিন সে মেয়েটিকে অনাথ ভেবেছে। প্রীতির প্রতি তারও ভেতরে কম টান ছিল না।

শেষবারের মতো শক্ত হবার চেষ্টা করল। বলল, দাদা সামনের জমি পাবে না। বাঁশঝাড়ের ওদিকটাতে বাড়ি করতে হয় করবে, না হয় করবে না। তার মেয়ের বিয়ের দায় তার। আমি আর কারো দায়িত্ব নিতে পারব না।

আর তখনই প্রীতি উঠোনে কোথা থেকে ছুটে এসে পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকল, আমার বাবা ত্যাজ্য পুত্র। আমার বাবার কিছু লাগবে না। ত্যাজ্য পুত্র। ত্যাজ্য পুত্র।

প্রীতির এই রুদ্রমূর্তি সমর কখনও দেখেনি। তাকে প্রীতি সমীহ করে, ভয় পায়। কিন্তু এটা কী দেখছে! সে না পেরে বলল, ত্যাজ্য পুত্র হয় তো কী করা। তাই হবে। তবু তাকে সামনের প্লট দেওয়া যাবে না। তার ছেলেমেয়ের কী হবে সে ভাববে। কে বলেছিল, মহাআনন্দে এতগুলি সন্তানের পর পর জন্ম দিয়ে যেতে। কাউকে জিজ্ঞেস করেছিল। বলেই সে কেমন হতবাক হয়ে গেল। সেও কী আর এক অমানুষ। বাবা বেঁচে থাকলে তাই বলতেন। যারা এসে গেছে এতে যে তাদের খাটো করা হয়।

সাঁজবেলায় মা সহসা হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকল—প্রীতিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে সমর রক্তের মধ্যে বরফের কুচি ঢুকে যাচ্ছে টের পেল। সে ছুটে গেল মনোজের কাছে, শিগগির আয়। প্রীতি কোথায় চলে গেছে।

প্রিয়ব্রত এসে খবর দিয়ে গেল, প্রীতি তার বাড়িতে চলে গেছে। গিয়েই শুয়ে পড়েছে। কারো সঙ্গে কথা বলছে না। কিছু খাচ্ছে না।

সমর নিজেও খেতে বসে খেতে পারল না। তার ওক উঠে আসছে। রাতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করল। কেমন হাসফাঁস করছে। সাপটা যেন এবার সত্যি তাকে পেঁচিয়ে ধরেছে। কপালে ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছে। প্রীতি যদি কিছু একটা করে বসে তবে কৈশোরের রাস্তাটাই সে হারিয়ে ফেলবে। ফেলবে, না হারিয়ে ফেলেছে—আবার সেই মৃত বৃক্ষ, এক পাল শকুন গাছের ডালে বসে আছে দেখতে পেল। একধারে মৃত

বৃক্ষ, একধারে শকুন, কখনও বাবার চাদরে ঢাকা শেষ বিদায়ের ছবি—এমন সব দেখতে দেখতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল। আর দেখল, একদল শববাহক কাঁধে করে কাকে নিয়ে যাচ্ছে। আরে এ যে সেই মানুষটা, সমর যার নাম! সে শুয়ে আছে। অন্ধকার রাতে বাবার হাতে লণ্ঠন—ছুটে ছুটে আগে যাচ্ছে। সারা রাস্তায় একটাও গাছ নেই, সব মরা গাছ, ডালে ডালে শকুন। দূরবর্তী কোনো গভীর অতীত থেকে কে যেন বলছে, কোথায় যান কর্তা এত রাতে! লণ্ঠন নিয়ে কোথায় যান! বাবা হেঁকে বলছেন, ইস্টিশনে সমুকে তুলে দিতে যাচ্ছি। একা ইস্টিশনে যাবে। যদি ভয় পায়। আর তখনই সহসা সমর এটা কী দেখছে, কী এটা, লাস? কার লাস! গলায় দড়ি। কার লাস! প্রীতি প্রীতি বলে সে চিৎকার করে উঠতেই মা জেগে গেল, কী হয়েছে সমু, এত ঘামছিস কেন। মা হ্যারিকেনটা উসকে মুখের কাছে তুলে ধরে বলল, চিৎকার করছিলি কেন? কী হয়েছে।

কিছু হয়নি মা। সে রুগণ বালকের মতো বলল, মা আমার পাশে এসে শোও। আমার কেমন ভয় করছে। সে মরে যাবে এ-কথা কখনও মনে হয়নি। মা আজ মনে করিয়ে দিল, কে কার আগু পিছু কেউ বলতে পারে না তারা।

মা বলল, ঠিক আছে, তুই ঘুমো। আমি জেগে থাকছি। কী দেখে এত ভয় পেলি বুঝি না বাবা!

সকালে উঠে সমর সবাইকে ডেকে পাঠাল। বলল, জমি নামে নামে রেকর্ডভুক্ত হবে। মার নামেও। সামনের জমি অমর পাবে। জমির প্লট ভাগ হবে না। জমি বিক্রি করে প্রীতির বিয়ে হবে। অবশিষ্ট জমির অংশ বিক্রি করে মার কাজ হবে। কেউ যদি এখুনি পার্টিশন সুট করতে চায় করতে পারে। আদালতে লড়ব। হারলে হাইকোর্ট। আবার হারলে সুপ্রিম কোর্ট। সেখানে হারলে কী করবে, সে আর একটা কথাও বলতে পারল না।

কারণ সে জানে না, তারপর কার কাছে আপিল করতে হয়। জীবনের কাছে না মৃত্যুর কাছে।

ঊনআশি নম্বর বাড়ি

—কত নম্বর বললেন?

—সেভেনটি নাইন। মানে ঊনআশি নম্বর।

—আপনি এক কাজ করুন, একটু এগিয়ে যান, সামনে চায়ের দোকান পাবেন, বংশী সব জানে। এদিককার সব ও জানে।

সে তবু খুঁজছে। বাড়ির নম্বর দেখছে। কিন্তু ঠিক নম্বরটা পাচ্ছে না। ঠিক বললে ভুল হবে, প্রায় একশ অঙ্কের তফাত। সে খুঁজছে ঊনআশি, একশ আটাত্তর, একশ সাতাত্তর। শুধু ঊনআশি নেই। মনে মনে পার্থর উপর চটে যাচ্ছে। ট্যাংকের ঠিক পেছনেই আমার বাড়ি।

সে মহাফাঁপড়ে পড়ে গেল। স্মৃতির গণ্ডগোল সহজে সে মেনে নিতে পারে না। স্মৃতির বিষয়েই সে নিজেকে গুরুত্ব দিতে ভালবাসে। এমন কি শরীর নিয়েও বড়াই। এই তো এত বয়েস হল, একবারও কোনো বড় অসুখে ভোগেনি। হাসপাতাল যায়নি। ডাক্তার ডাকার দরকার হয়নি। তার বন্ধুদের কেউ ব্লাডসুগারে ভুগছে, কেউ বেঢপ মোটা হয়ে গেছে বলে খাওয়াদাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। দু'একজনতো কেটেই পড়ল। কথা নেই বার্তা নেই, ফোন, হাসপাতালে চলে এস। অবিনাশ হাসপাতালে সাদা চাদরের নিচে শুয়ে আছে।

ফুটব্রিজ পার হয়ে ডানদিকের রাস্তার প্রথম বাঁ দিকের গলি, সামনে জলের ট্যাংক। তার পেছনে বাড়ি। পার্থ নতুন বাড়ি করে উঠে এসেছে। বাড়ির নম্বর ঊনআশি। আরও দুটো বাড়ি পার হয়ে দেখল, না মিলছে না। গলিটা পার হয়ে দেখা যাক। বাড়িগুলি হাল ফ্যাশনের লোহার কারুকাজ করা গেট, বাগান, ফুল-ফলের গাছ। ছিম ছাম সাজানো ছবির প্রদর্শনীর মতো। সব আছে, কেবল ঊনআশি নম্বরের বাড়িটা নেই। লোকজন বড় একটা রাস্তায় নেই—ঘড়িতে দেখল এগারোটা বেজে দশ। ভাদ্রমাস, কড়া রোদ্দুর। ছাতা মাথায় সে হেঁটে যাচ্ছে। খুঁজছে—ঊনআশি নম্বরের বাড়িটা। কোথায়! জলের ট্যাংকের ও পাশের বাড়িগুলির নম্বর যদি কমে গিয়ে একশর নিচে নেমে যায়! সে হাঁটতে থাকল। ঘাম হচ্ছে।—না নেই।

—তুমি একদিন এস। পার্থ গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলেছিল। সে বলেছিল যাব। পার্থ বলেছিল, আমার বাড়ি চেনা খুব সহজ। জলের ট্যাংকের ঠিক পেছনে পার্থ পেছন বলতে কি মিন করেছে। একশ নম্বরের ফারাক। তার ধন্দ লেগে গেল পেছনে মানে ট্যাংকের উত্তরে হতে পারে, পূর্বে হতে পারে, দক্ষিণেও হতে পারে। আসলে পেছন ফিরে তাকানোর মতো। সেটা কি! বাড়ির নম্বর সে খুঁজে বের করবেই। জীবনের ক্ষেত্রে অনেক অঙ্কই মেলে না, কিন্তু এ-তো জীবন নয়, বাড়ি। এক একটা বাড়ির পেছনেই অনেক ঝড়-জলের ইতিহাস থাকে। বাড়ির পেছনে মানুষ ছুটছে। মানুষের ঘরবাড়ি বিষয়টাই খুব এলোমেলো। এই সব বাড়ি বাড়িতো নয়, প্রায় যেন এক এক জন গাছে এক একটা স্বপ্নের ডুম জ্বালিয়ে রেখেছে। জীবনের কৃতিত্ব । বাড়ি দেখে মানুষটার ইতিহাস বোঝা যায়—এমন অহঙ্কারের বীজ বপন করে যাওয়া।

—এই ভাই? সেভেনটি নাইন কোন বাড়িটা হবে?

চায়ের কেতলিতে জল ফুটছে। বাসযাত্রীর ভিড় আছে জায়গাটায়। লোকটা ব্যস্ত খুব।

—এই ভাই সেভেনটি নাইন বাড়িটা জান কোথায়!

বিরক্ত মুখে তাকে দেখল। তারপর বলল, সোজা চলে যান। অনেকটা যেতে হবে। সামনে পাখির খাঁচা পাবেন। ওদিকটায় পড়বে মনে হয়।

তা ওটাও ট্যাংকের পেছন। সোজা অনেকটা চলে যেতে হবে। সে আহাম্মকের মতো তবে আধঘণ্টা ধরে এখানটায় পার্থর বাড়ি খুঁজেছে। সে দু একজনকে নামও বলেছে, কি করে বলেছে, কাগজের লোক, চিনতে

পারে ভেবে বলা। কিন্তু এখানটায় এসে সে হিসেবও গণ্ডগোল হয়ে গেল। আসলে কেউ কাউকে চেনে না। চেনার ভান করে বেঁচে থাকা।

সে ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারত। এই ঠা ঠা রোদ্দুরে একটা বাড়ির নম্বর খুঁজে বের করতে পারবে না—সে এতটা পথ হেঁটে এসে ফিরে যাবে, তা-ছাড়া পার্থ অসুস্থ, খুবই কঠিন অসুখ, বন্ধু বান্ধবরা হুট হাট দু'একজন বিনা নোটিশে চলে যাবার পরই অসুখের খবর পেয়ে আজ সকালেই বের হয়ে পড়েছে। নার্সিংহোমে ভর্তি হবার কথা। ব্লাড কাউন্ট ভাল না। প্রচণ্ড অ্যানিমিয়া। অফিসে মাথা ঘুরে বিপদ সংকেত। লিউকোমিয়া কি! কেমন একটা অনড় আতঙ্ক তাকে তাড়া করছিল! পার্থর নতুন বাড়ি যাব যাব করেও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বেঁচে থাকতে হলে জড়িয়ে থাকতে হয়, সেটাই আজকাল কেমন তার শেষ হয়ে যাচ্ছে। বয়েস হয়েছে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যাওয়ায়, তার নিজের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন সবার আলগা হয়ে গেছে টের পায়।

তবু ক্ষোভ দুঃখ অভিমান নিয়ত তাড়া করে মানুষকে। অহংকার আর এক গেরো তার। গাড়ি বাড়ি, সব আতরের গন্ধের মতো উবে যায় একদিন, মানুষ টের পায় না। এত সব সত্বেও সে আজ বাজি লড়ছে নিজের সঙ্গে—বাড়িটা খুঁজে বের করবেই।

রোদে হাঁটছিল।

নম্বর দেখছে।

পাখির খাঁচা কতদূর?

—ও ভাই পাখির খাঁচা কতদূর জানেন?

—যান, হেঁটে যান পেয়ে যাবেন।

—কোনদিকে হেঁটে যাব?

—সামনে।

—সামনেই তো হাঁটছি।

—সামনে না হাঁটলে পাবেন কি করে!

সত্যিতো লোকটা বড় আশ্চর্য খবর দিয়ে গেল।

সামনেই হাঁটতে হয়। পেছনে কেউ হাঁটে না। সে কি এই বয়সে এসে পেছনে হাঁটার কথা ভাবছে। তা না হলে, কেন মাঝে মাঝে নিজেকে একা মনে হয়, নিঃস্ব মনে হয়। তারতো কিছুর অভাব নেই। জীবনে সফল মানুষ, তবু কেন মনে হয়, সে আসলে খড়কুটো দিয়ে পাখির বাসাটি বানিয়ে এমন উড়ে অন্য কোথাও যেতে চায়। সেটা কোথায়? সেটা কি পেছনের দিকে, এক বয়সে সামনে হেঁটে যায় মানুষ, এক বয়সে মানুষকে পিছনে হাঁটতে হয়। এক বয়সে সব থাকে, এক সময় সব হারাতে হয়।

তার এখন পিছু হাঁটার পালা।

পার্থটা কি আহম্মক। পাইলস। রক্তপাতে একেবারে সাদা হয়ে গেছে শুনেছে। তার পাইপ মুখে। হেরে যাবার কথা স্বীকার করতেই ভয় পায়। পার্থ তোমার বুজরুকিতে আমি ঠ্যালা খাব ভাবছ! কিছুতেই না। অনেক দিন থেকেই, যৌবনকাল থেকেই পার্থ আর পাইলস সহ-অবস্থান করে আসছিল। এখন পাইলস আর পার্থ। পিছু হাঁটতে হয় এক বয়সে, টের পেয়ে ব্যাটা ঘরে শুয়ে আছে।

—ও ভাই পাখির খাঁচা আর কতদূর?

সামনে হেঁটে যান পেয়ে যাবেন।

—সামনে কতটা?

—সামনে যতটা পারেন, পেয়ে যাবেন।

—তো পেতেই হবে। এই রোদ্দুরে হাঁটার অভ্যাস নেই। একটা রিকসা নিলে ভাল হত। কিন্তু বাড়ির নম্বরগুলো এদিকটায় কমে আসছে। এই ভরসা। আর বাজি যখন লড়েছে, বাড়িটা সে আবিষ্কার করবেই

তখন আর অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটা কেন। পাইলস আর পার্থর মতো রোদ্দুর আর সে। ভ্যাপসা গরমে ঘাম, প্যাচ প্যাচে ঘামে শরীর কুট কুট করছে। এটাও এক মজা। নিজের শরীর আর জীবনের কুটকামড়। মন্দ লাগছে না।

সে খুঁজছে। একশ দুই।

একশ এক।

একশ।

একশ মাইনাশ একুশ।

সেতো এসে গেল।

কলম্বাস আপনি কি সমুদ্রে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে বসে আছেন!

আপনি কি মার্কোপলো?

সে নিজের সঙ্গে কথা বলছে।

লোকটা ঠিক বলেছে তো?

পাখির খাঁচা কোথায়?

রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। সরু হয়ে আসছে ক্রমে।

একটা পাখির খাঁচার পাশে এই নম্বরগুলি—নিরানব্বই। আটানব্বই। শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা শ্রী সুবীর কুমার রায়—আই.এ.এস। নীল পাথরে নেম প্লেট। সবুজ পাথরে লেখা মানুষের ঘরবাড়ি। কিন্তু পাখির খাঁচাটা তো দেখতে পাচ্ছে না!

তার এখন এই নেম প্লেট দেখে হাসি পাচ্ছে। তীর্থঙ্কর রায় চার্টার্ড একাউন্টেন্ট সফল। নীলরঙের বেতের চেয়ার। অ্যালসেসিয়ান কুকুর জিভ বের করে তাকে দেখছে। বাঘের মতো বাড়িটাকে পাহারা দিচ্ছে। সে বলল, এই যে ভাই সারমেয়, তোমার মালিক কোথায়?

কুকুরটা ঘেউ করে উঠল।

—আরে বাবা চটছ কেন? পাখির খাঁচাটা কোথায়?

—হেঁটে যান পাবেন। বিরক্ত করবেন না। শুয়ে আছি।

—না ভাই বিরক্ত করছি না। এইটটি এইট।

অষ্টআশি নম্বর বাড়ির সামনে সে। এক ছোট্ট শিশু ডলপুতুল হাতে জানালায় তাকে দেখছে। কৌতুক চোখে! যেন লোকটা রাজার বাড়ি খুঁজতে বের হয়েছে। শিশুরা সব টের পায়। পার্থর বাড়ি দেখার বাসনা, আসলে পার্থ তার চেয়ে কটা বেশি ইট গেঁথেছে। বেশি না কম। অসুখের খবর পেয়ে, না পার্থ যে বাড়িটা করলো, কারণ সে আর পার্থতো একই গাঁয়ের একই ইস্কুলের একই হাডুডু খেলার সঙ্গী, একই রকম হারিকেনের আলোতে দুজনের পড়া। পার্থ কতটা এগিয়ে, তখন শিশুটি ডাকল, এই।

সে থমকে দাঁড়াল।

জানালায় দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছে। গায়ে পাতলা লেসের ফ্রক। চুল ঘন। হাতে চকলেট ডলপুতুল দুই-ই।

মেয়েটি বলল, খাবে?

তার ইচ্ছে হল দু দণ্ড দাঁড়ায়। বাচ্চাটার সঙ্গে কথা বলে, আদর করে। কিন্তু বেলা হয়ে গেছে—কথা বলাও ঠিক হবে কি না, কারণ মানুষজনের ফারাক দুস্তর হয়ে উঠছে—বিশ্বাস নেই কে কখন কি করে বসবে।

অষ্টআশি নম্বর পার হলেই সাতাশি। সে বাড়িটা খুঁজে বার করার জন্য অস্থির হয়ে উঠছে। দাঁড়ালে চলবে না। এত রোদ্দুরে রিকশা না নিয়ে বোকামি করেছে। আসলে পার্থই নষ্টের মূলে—বাড়িটা জলের ট্যাংকের

পেছনে বলার কি দরকার ছিল, এত নিশ্চিত হয়ে আসার ফলে এখন আর এত কাছে এসে রিকশা নেয় কি করে! একশ নম্বরের ফারাক খুঁজতে তার এমন হাঁপ ধরে যাবে সে অনুমানও করতে পারেনি।

আর মাত্র আটটা বাড়ি। তারপরই পার্থ। পার্থ দি গ্রেট। পার্থ এখন পাইলস নিয়ে রক্তশূন্য হয়ে আছে—তুই এসে গেছিস। বোস। এই যে শুনছ, দেখ কে এসেছে, দেখ দেখ, আমরা এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে...

এই এই আবার শুরু করলি! ইস ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেছে না। তুই কি রে!

আচ্ছা, বল, এর নাম ঠিক ট্যাংকের পেছনে। তুই কি মস্করা করেছিস! কোথায় জলের ট্যাংক আর কোথায় তোর বাড়ি! লোকে নম্বর বাড়িয়ে দেখে আর আমি কমিয়ে কমিয়ে আসছি। অষ্টআশি, সাতাশি, ছিয়াশি। সামনের মোড়ে পাখির খাঁচা। যাক এসে গেছি। ওফ একেবারে ইণ্ডিয়া আবিষ্কার। জল, এক গ্লাস জল।

এত কষ্ট স্বীকার করেও বাড়িটার হদিশ পেয়ে যাচ্ছে ভাবতে গিয়ে তার চোখেও জল আসার উপক্রম।

এর নাম বিজয় লাভ।

সে এগিয়ে যাচ্ছে। না পিছিয়ে যাচ্ছে। কোনটা?

পাখির খাঁচা স্পষ্ট। পাখিগুলি বন্দী, অসহায়, মুক্ত আকাশ থেকে ওরা এসে ঝুপঝাপ আত্মহত্যা করছে যেন।

এইটটি থ্রি।

বিশাল গম্বুজওয়ালা বাড়ি। সামনে কাচের দেয়াল বিশাল। ভিতরে বিশাল হলঘর। নকসা কাটা নীলরঙের কার্পেট, সাদা রঙের বেতের চেয়ার। কোনো প্রদর্শনীর মতো সাজানো। দেয়ালে বড় বড় অয়েল পেন্টিং। সিল্কের ম্যাকসি গায়ে পরী সেজে বসে আছে নারী। স্বপ্ন তৈরি করছে, না দেখছে।

আর তিনটে বাড়ি।

তারপর সেই সেভেনটি নাইন। ও হো ভাবা যায় না। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল। বুক ছাতি শুকিয়ে গেছে। দরদর করে ঘামছে। পার্থ পার্থ! এসে গেছি! তুমি এই শালা জলের ট্যাংকের পেছনে আছ। জলের ট্যাংকের পেছন কি এত দূর! আমি দ্যাখ শালা কেমন লোক, ঠিক খুঁজে বের করেছি তোমার বাড়ি। খড়কুটো এনেছ, বৃষ্টি বাদলায় রোদ্দুরে ঝড়ে খড়কুটো এনে এতদিনে যা বানিয়েছে, তা আবিষ্কার করে ফেলেছি।

এইটটি।

বুক কাঁপছে। পার হলেই সেভেনটি নাইন। সে এবার পারলে নিজে যেন চিতা বাঘ হয়ে যেতে চায়। সে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল, অনিমা পার্থ কেমন আছে? পার্থকে দেখতে এয়েছি। আমরা সবাই এক সঙ্গে দৌড় শুরু করেছিলাম, পার্থটা শেষে পাইলসের গেঁড়াকলে পড়ে গেল! কেমন আছে! আর শোনো জল, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল। ইস এর নাম, জলের ট্যাংকের পেছনে, এর নাম, আমার বাড়ি যাওয়া খুব সোজা।

আজ কলম্বাস না হলে বাড়ি খুঁজে বের করতে পারতাম না। হাঁটার অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে, আয়েসি মানুষ। হাতের কাছে সব এনে না দিলে খাই না। নড়ি না। কুঁড়ে হয়ে গেছি। রোদ্দুরে পাঁচ ক্রোশ মামারবাড়ি গেছি, দু ক্রোশ হেঁটে রোজ ইস্কুল। এক ক্রোশ হেঁটে কাকার সঙ্গে হাট—সব, পার্থ আমাদের এখন গত জন্মের কথা। কেউ বিশ্বাসই করবে না। তোর বাড়ি খুঁজতে এসে পেছনে হেঁটে গেছিলাম, কত সব নিয়ে শুরু, কিন্তু শেষটায় তোর পাইলস, আমি বাড়িটা তোর খুঁজছি। বাড়ির নম্বর তোর ঊনআশি—আশির বাড়িটা পাশে, পার হলেই তুই তোর বউ ছেলে মেয়ে পাইলস।

এ কি! কোথায় ঊনআশি। এ যে ফাঁকা মাঠ রে!

সে সহসা বিচলিত হয়ে পড়লো ঘোরে পড়ে যায়নি তো। কেমন টলছে শরীর। যে আবার পাশের বাড়ির নম্বর দেখল, আশি, আশির পরে ঊনআশি। সে তো ঠিকই এসেছে। ফাঁকা প্লট কেন?

এইটটি তারপরই ফাঁকা প্লট। তারপর সেভেনটি এইট বাড়ির নম্বর। আশি আছে আটাত্তর আছে। ঊনআশি নেই। শুধু ফাঁকা মাঠ। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। জল তেষ্টা—নিশ্বাস নিতে কষ্ট। উন্মাদের

মতো তবু তিন চারবার হেঁটে গেল। কোথায় বাড়ি। ব্লক নম্বর, জলের ট্যাংক সব তার মনে আছে—বাড়িটাই নেই। ঝোপ-জঙ্গল আগাছার ভেতর থেকে শুধু একটা কাক উড়ে গেল।

সেভেনটি নাইন বলে কি কোনো বাড়ি থাকে না। সে পাখির খাঁচার কাছে ছুটে গেল। গাছের ছায়ায় একটা লোক শুয়ে আছে।

—এই

লোকটা ঘুমচ্ছিল। ধড়ফড় করে উঠে বসল। মজুর হবে, বাড়ির কাজ টাজ করে, ইট পাহারা দিচ্ছে।

সে বলল, ওটা ঊনআশি নম্বর তো?

—হ্যাঁ বাবু। বলে লোকটা ফের শুয়ে পড়ল।

বাড়ি কোথায়। ফাঁকা মাঠ, জঙ্গল। সে রাস্তা পার হয়ে গেল। চিৎকার করে উঠল, পার্থ এই তোর বাড়ি শালা! এই তোর ঊনআশি নম্বর। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। মাথা ঘুরছে। বিড় বিড় করে বকছে। সে বসে পড়ল। তারপর, তার কি হয়েছিল, সে আর জানে না। কাকটা উড়ে এসে তার মাথার কাছে বসেছিল।

এক হাত গণ্ডারের ছবি

চার্চের ঠিক সামনে এক পাগল। সে হাঁকছিল, 'দু ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর।' ওর হাতে লাঠি এবং লাঠিতে পাখীর পালক বাঁধা। মাথায় লাল রুমাল। দূরে বেরন হোটেলের পর্দা উড়ছে। পাগল চার্চের সদর দরজা থেকে বেরন হোটেলের দরজা পর্যন্ত ছুটে আসছিল বার বার আর ডিগবাজি খাচ্ছিল। সে কোন যানবাহন দেখছিল না, সে এক পাগলিনীর জন্য যেন প্রতীক্ষা করছিল কারণ পাগলিনী অন্য পারে ঠিক পেচ্ছাবখানার পাশে এবং কিছুদূর হেঁটে গেলে অনেক কাপড়ের দোকান, ছায়া ষ্টোরস অথবা হরলালকা আর গ্রীষ্মের দিন বলে প্রখর উত্তাপে পাগলিনী নগ্ন এবং বধির, পাগলিনী পথের উপর বসে পড়ল।

ঠিক তখন চার্চের দরজার সামনে শবাহী শকট। সোনালী ঝালরের কাজ করা কালো কফিনে মৃত পুরুষ এবং কত ফুল। শোকের পোশাক পরা যুবক যুবতীরা, বৃদ্ধেরা সদর দরজা ধরে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। সকাল হচ্ছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। বড় বড় গাছের মাথায় সূর্য অকারণ কিরণ দিচ্ছে। তখন পাগল হাঁক দিয়ে সকলকে যেন ডেকে বলছিল, 'কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়।' অথবা নানা রকমের অশ্লীল আলাপ—যা শোনা যায় না—যার জন্য পথে হাঁটা দায়। তখন পথ ধরে কোটিপতি পুরুষের স্ত্রী দামী গাড়িতে নিউ মার্কেট যাচ্ছে। পথে দেবদারু গাছ এবং গাছের ছায়া পাগলিনীর মুখে। পাগল ঊর্ধ্ববাহু হয়ে পাখির পালক উড়াচ্ছে আকাশে। পাগলিনী বসেছিল, আর উঠছে না। এই সব দৃশ্য এ অঞ্চলে হামেশাই ঘটছে, পুলিশের প্রহরা এবং তির্যক সব দৃষ্টির জন্য যানবাহন থেমে থাকছে না। বড় নোংরা এই অঞ্চল। দেয়ালে দেয়ালে বিচিত্র সব নগ্ন দৃশ্য চিত্রতারকাদের এবং রাজাবাজার পর্যন্ত অকারণ অশ্লীলতা। হামেশাই পথে ঘাটে নগ্ন যুবতীরা পাগলিনী প্রায় শুয়ে থাকছে। সব অসহ্য।

এবং মনে হয় এরা সকলে রাতে ফুটপাথে নিশিযাপন করেছিল। এখন এরা নিজেদের ছেঁড়া কাঁথার সঞ্চয় ছেড়ে রোজগারের জন্য বের হয়ে পড়বে। পাগল তার সঞ্চয় সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিল। কিছুই ফেলা যায় না। সে নারকেলের মালা এবং সিগারেটের বাক্স দিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরেছিল। পিঠে পুরাতন জামার নিচে পচা ঘামের গন্ধ । সে শুধু এখন হাসছিল। পথে লোকের ভিড় বাড়ছে, ট্রাম বাসের ভিড় বাড়ছে। মানুষের মিছিল সারা দিনমান চলবে। পাগল হেসে হেসে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলছিল, 'দু-ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর।' সে এখন অন্য কোন সংলাপ আর খুঁজে পাচ্ছিল না।

গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ এবং ছায়াবিহীন এই পথ। ফুটপাথে অথবা গাড়ি বারান্দায় যারা রাত যাপন করছে, যারা ঠিকানাবিহীন, যাদের সব তৈজসপত্র ছেঁড়া, নোংরা এবং প্রাচীনকাল থেকে সব সংরক্ষণ করছে—নগরীর সেইসব প্রাচীন রক্ষীরা এখন অন্নের জন্য ফেরেব্বাজের মত ঘোরাফেরা করছে। ছেঁড়া সব তৈজসপত্রের ভিতর এক অতিশয় বৃদ্ধ, মুখে দাড়ি শনপাটের মত এবং সাদা মিহি চুল আর অবয়বে রবীন্দ্রনাথের মত যে, কপাল হাত রেখে গ্রীষ্মের সূর্যকে দেখার চেষ্টা করছে।

অন্য ফুটপাথে পাগল ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আছে। ওর এই পাগলকে যেন কতকাল থেকে চেনা। বড় স্বার্থপর—বৃদ্ধ এই ইচ্ছাকৃত পাগলামির জন্য একদিন রাতে তখন নগরীর সকল মানুষেরা ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন হাসপাতালের বড় আলোটা পর্যন্ত নিভে গিয়েছিল, রাজবাড়ির সদর বন্ধ হচ্ছে এবং যখন শেষ ট্রাম চলে গেল, যানবাহন বলতে পথে কোন কর্পদক পড়ে নেই...সব নিঃশেষ, শুধু কুকুরের মাঝে মাঝে আর্ত চিৎকার তখন পাগল ঐ পাগলিনীর পাশে শুয়ে নোংরা তৈজসপত্রের ভিতর থেকে ছোট ছোট উচ্ছিষ্ট হাড় (আমজাদিয়া অথবা বেরন হোটেল থেকে সংগ্রহ করা) দুজনে চুষছিল; রাতের দ্বিপ্রহরে ওদের উদরে মাংসের রস যাচ্ছে; ওরা সারা দিনমান পাগলামির জন্য ফের প্রস্তুত হতে পারছে—বৃদ্ধ হাঁ করে দেখতে

দেখতে বলেছিল, 'এই সরে বোস, এটা পাগলামির জায়গা নয়। ঘুমোতে দে। রাজ্যের সব নোংরা এনে জড় করেছিস?'

পাগল কিছুক্ষণ ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকল। কথাটা বোধগম্য হয়নি। কিন্তু পাগলিনী সুলভ রমণীর মত কাছে এসে বলল, 'তোর বাপের জায়গা!' ঠিক ভাল মানুষের মত, ঠিক সুলভ রমণীর মত এবং দিনের জন্য অভিনয়টুকু তখন আর ধরা পড়ছে না, পাগলিনী গলাটা খাটো করে বলল, 'তোর মুখে চুনকালি পড়বে।'

পাশে তের বছরের সুমি চীৎকার শুনে উঠে বসেছিল। রাতে এবং পিতামহের হাত ধরে ফুটপাথের অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছিল। ওরা পাগলিনীর ঝোলাঝুলির ভিতর পচা গন্ধ পাচ্ছিল কারণ এই ঝোলাঝুলি বরফ ঘরের মত—সবই দুর্দিনের জন্য সংরক্ষণ করা এবং কত রকমের সব উচ্ছিষ্ট খাবার। পাগলিনী চিৎ হয়ে শুয়েছিল। মাংসের হাড় অনবরত চোষার জন্য গালের দুধারে ঘায়ের মত সাদা দাগ। শরীরে দীর্ঘদিনের ময়লার পলেস্তারা মুখের অবয়ককে নষ্ট করে দিয়েছে। চেনা যাচ্ছিল না ওরা জন্মসূত্রে কোন গ্রাম্য গৃহস্থের ঔরসজাত না অন্য কোনভাবে অথবা কোন অলৌকিক ঘটনার নিমিত্ত এই ফুটপাথ সংলগ্ন ডাকবাক্সের মত পাতলা অস্থায়ী প্লাইউডের বাড়িতে বসবাস করছে।

পাশের বাড়িটা চারতলা এবং নিচে ফুটপাতের উপর ছাদের মত গাড়িবারান্দা। সামনে হাসপাতাল এবং রাজবাড়ি, সদর দরজার উপর একটা এক হাত লম্বা গণ্ডারের ছবি ঝুলছে। সময়ে অসময়ে বৃদ্ধ ছবিটার নিচে কয়েকজনের নাম উচ্চারণ করে পড়ার সময় 'নাট্যকার' এই শব্দটি ভয়ঙ্করভাবে কষ্ট দিতে থাকে। আর হাসপাতালের বাড়িটা দীর্ঘদিন খালি পড়েছিল, শুধু কাক উড়ত ছাদে এবং পাঁচিলের পাশের পেয়ারা গাছটাতে একজোড়া ঘুঘু পাখি আশ্রয় নিয়েছিল। ইদানীং চুনকাম হবার সময় মোষের মত এক ইতর ছোকরা কিছু চুনগোলা জল ছাদ থেকে নালির ফুটোর উপর ফেলে দিয়েছিল। সেই মোষটা হালফিলে সকল খবর নিয়ে গেছে এবং চেটেপুটে রেখে গেছে সুমিকে। চুনগোলা জলের জন্য ঘুঘু পাখিরা উড়ে চলে গেল। তারপর একদিন যেন মনে হল ফের এম্বুলেন্স আসতে শুরু করেছে, ফের এই বাড়িতে আলো জ্বলে উঠল এবং ট্রাম ডিপোতে ফের ঘণ্টি বাজছে।

আর এই বাড়িটার জন্যই ভোরের দিকে সূর্যের উত্তাপ ছাদের নিচে যেন পৌঁছতে পারে না অথবা লম্বা হয়ে যখন সূর্য হাসপাতালের মৃত মানুষের ঘর অতিক্রম করে পেয়ারা গাছের মাথায় এসে পৌঁছায় তখন ছাদের ছায়া বৃদ্ধ ফকিরচাঁদকে রক্ষা করতে থাকে। এই জন্যই অভ্যাসের মত এই স্থান বসবাসের উপযোগী। সুমি পাশে নেই—কোথাও আহারের জন্য অন্নসংস্থান করতে গেছে। সে নিজে একটা শতচ্ছিন্ন চাদর ফুটপাতে বিছিয়ে তার পাশে কিছু গোটা গোটা অক্ষরে—তার জীবনের বিগত ইতিহাস—পরাজিত সৈনিকের মত মাথা হেঁট করে ধিক্কৃত জীবন এবং গ্লানিকর জীবনের জন্য করুণা ভিক্ষা করছিল।

গ্রীষ্মের উত্তাপ প্রচণ্ড। দীর্ঘদিন থেকে অনাবৃষ্টি। সব কিছু রোদের উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে। পথের গলা পিচে করপোরেশনের গাড়ি বালি ছিটিয়ে গেছে। তখন পাগল পিচগলা পথে, মাথায় দুপুরের রোদ, লাঠিতে পাখির পালক বাঁধা—হাঁটছে। ইতস্তত সব ডাষ্টবিনের জংসন এবং সেখানে হয়ত সুমি পোড়া কয়লা কাগজ অথবা লোহার টুকরো খুঁজছে। ফকিরচাঁদ উঠে এক মগ চা সংগ্রহ করল। রাতের আহারের জন্য খড়কুটো অথবা পাতলা কাঠ সংগ্রহ করতে হয়—ফকিরচাঁদ আকাশ দেখল, আকাশ থেকে গনগনে আঁচ ঝরে পড়ছে, সে এই রোদে বের হতে সাহস করল না। সে হাত বাড়াল রোদে—যথার্থই হাত পুড়ে যাচ্ছে যেন, শুধু রাজবাড়ির সদর দেউড়ীতে এক হাত গণ্ডারের ছবিটা এই রোদে চিক চিক করছিল।

বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ এবার পা দিয়ে নিজের সুন্দর হস্তাক্ষর মুছে দিল। পাঁচিল সংলগ্ন ওর ছোট প্লাইউডের সংসার—বসবাসের উপযোগী নয়, শুধু তৈজসপত্র রাখার জন্য পাতলা প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে সব ঢাকা। ফকিরচাঁদ সব টেনে বের করল—মেটে হাঁড়ি পাতিল, ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙা জলের কুঁজো সবই সুমির সংগ্রহ করা, মেয়েটার সারাদিন ঘুরে ঘুরে ঐ এক সংগ্রহের বাতিক এবং সুমিই একদা শেয়ালদা ষ্টেশন থেকে এই

বাড়ি সংলগ্ন গাড়িবারান্দা আবিষ্কার করে ফকিরচাঁদের হাত ধরে চলে এসেছিল। সেই থেকে অবস্থান এবং সেই থেকে দিনগত পাপক্ষয়। সে এ-সময় ভাল করে চারিদিকটা দেখল। মগের চা কিছু খেয়ে কিছু রেখে দিল, পাশে পাগল পাগলিনীর আস্তানা। দুজনই সারাপথে অভিনয়ের জন্য বের হয়ে গেছে। দুজনই হোটেলের উচ্ছিষ্ট খাবার রাতের জন্য সংগ্রহ করছে।

প্রখর উত্তাপের জন্য পথ জনবিরল। দোতলায় মসজিদ এবং সেখানে মোল্লার আজান। ফকিরচাঁদ এবার চিৎকার করে ডাকল—সু...উ...মি। ফকিরচাঁদ কপালে হাত রেখে দেখল ট্রামডিপোর সামনে ডাষ্টবিন এবং সেখানে সুমি উপুড় হয়ে কি খুঁজছে। সে কোথাও আজ বের হল না ভিক্ষার জন্য, ফকিরচাঁদ মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ক্ষোভে দুঃখে ফের বড় বড় সুন্দর হস্তাক্ষরে ফকিরচাঁদ ফুটপাথ ভরিয়ে তুলল। সামনের বড় বড় বাড়িগুলোর দরজা জানালা বন্ধ। ট্রাম ফাঁকা এবং বাসযাত্রী উত্তাপের জন্য কম। সে সুন্দর হস্তাক্ষরের উপর থুথু ফেলল তারপর রাগে দুঃখে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সুমি আসছে না, ওর গলার আওয়াজ প্রখর নয়, সুতরাং সুমি ফকিরচাঁদের কথা শুনতে পাচ্ছে না। ফকিরচাঁদ নিজেকে বড় অসহায় ভাবল—এই দুর্দিনে সে যেন আরও স্থবির হয়ে যাচ্ছে, চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলছে, ক্রমশ জীবন থেকে সোনার আপেলের স্বপ্ন ফুরিয়ে যাচ্ছে। এত বেলা হল, এখনও পেট নিরন্ন, সামনের হোটেলটাতে এখন গিয়ে দাঁড়ালে সুমি নিশ্চয়ই কিছু পেত, কারণ শেষ খদ্দের ওদের চলে যাচ্ছে। ফকিরচাঁদ অভিমানে নিজেই উঠে যাবার জন্য দাঁড়াতে গিয়ে প্রথম পড়ে গেল, পরে হেঁটে হেঁটে রেস্তোরাঁর সামনে যখন উপাসনার ভঙ্গিতে মাথা হেঁট করে দাঁড়াল, যখন করুণাই একমাত্র জীবন ধারণের পাহাড় সম্বল এবং আর কিছু করণীয় নেই এই ভাব—তখন সে দেখল সব সোনা রুপোর পাহাড় আকাশে। আকাশ গুড় গুড় করে উঠল, মেঘে মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আর বাতাস পড়ে গেল, দরজা জানালা খুলে গেল এবং বৃষ্টির জন্য সর্বত্র কোলাহল উঠছে।

আর তখনই চার্চের দরজাতে শববাহী শকট মাঠের মসৃণ ঘাস পার হয়ে অন্য এক ইচ্ছার জগতে উঠে যাচ্ছে। ফুটপাথ ধরে অজস্র যাত্রী—গুণে শেষ করা যায় না, ফকিরচাঁদ অন্তত সময়ের প্রহরী হিসাবে গুণে শেষ করতে পারছে না। বাস ষ্ট্যাণ্ডে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা পর্যন্ত কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করল কারণ দীর্ঘ সময় এই অনাবৃষ্টি....ফলে এই নগরীর দূরতম প্রান্ত আর দূরের মাঠ ঘাস সবাই ক্লিষ্ট—সকলে জানালা খুলে বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল। ফকিরচাঁদ একটু বৃষ্টিতে ভেজার জন্য পথে গিয়ে বসল। আজ অফিস পাড়ায় এই বৃষ্টি উৎসবের মত। সকলে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য মাঠে এবং ফুলের ভেতর ছুটোছুটি করছিল।

এবং পাগল যে শুধু হাঁকছিল, 'দুঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর', যে শুধু হাঁকছিল,'কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়'—সে এখন কিছু না হেঁকে শান্ত নিরীহ বালকের মত অথবা কোন কৈশোর জীবনের স্মৃতিকে স্মরণ করে আকাশে মেঘের খেলা দেখছিল। আর পাগলের পাখির পালক তখন লাঠি থেকে উড়ে গেল—পাগল পালকের জন্য ঝড়ের সঙ্গে ছুটছে।

পাগলিনী নিভৃতে ট্রাম ডিপোর বাইরে লোহার পাইপের ভিতর শুয়ে বৃষ্টির খেলা দেখছিল। সে নখে দাঁত খুঁটছে। পাগলকে ছুটতে দেখে খপ করে পাগলের পা চেপে ধরল এবং বলল, 'দ্যাখ কেমন বৃষ্টি আসছে।'

'হায় আমার পাখি উড়ে গেল, বৃষ্টি দেখে পাখি উড়ে গেল...' পাগল হাউ হাউ করে কাঁদছে।

দীর্ঘদিনের উত্তাপ, অনাবৃষ্টি বৃষ্টির জলে ভেসে গেল। পাগল বৃষ্টি দেখে পালকের কথা ভুলে গেছে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টির জল ওদের শরীরে মুখে পড়ল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি হচ্ছিল। সুমি ওর ক্লিষ্ট চেহারা নিয়ে কোন রকমে দৌড়ে ফকিরচাঁদের কাছে চলে এল। বৃষ্টির ফোঁটা হীরের কুচির মত ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। পথের যাত্রীরা যে যার মত গাড়িবারান্দায়, বাস ষ্টপের শেডে এবং দোকানে দোকানে সাময়িক আশ্রয়ের জন্য ঢুকে গেল—ওরা সকলেই যেন প্রাচীন কাল থেকে কোন বিস্তীর্ণ কবরভূমি হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত—ওরা সবুজ শস্যকণা এই বৃষ্টির জলে এখন ভাসতে দেখল।

পরদিন ভোরে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে 'কলকাতায় বছরের প্রথম বর্ষণ' এই শীর্ষকে প্রবন্ধ এবং ঠিক প্রথম পাতার উপরে বড় এক ছবি, আর যুবতী নারী জলের ফোঁটা মুখে চন্দনের মত মেখে নিচ্ছে। অথবা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ছবি, দুর্গের বুরুজে জালালী কবুতর উড়ছে।

বৃষ্টি সারারাত ধরে হয়েছে। কখনও টিপ টিপ কখনও ঘোর বর্ষণ এবং জোরে হাওয়া বইছিল। ভোরের দিকে যখন কর্পোরেশনের গাড়ি গলা জলে নেমে ম্যানহোল খুলে দিচ্ছিল, যখন ট্রাম-বাস বন্ধ, যখন বৃষ্টির জন্য ছাতার পাখিরা কলকাতার মাঠ পার হয়ে গঙ্গার পাড়ে, অথবা হুগলি নদীর পাড়ে পাড়ে সব চটকলের বাবুরা বাগানে ফুলের চারা পুঁতে দিচ্ছিল তখন বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ কলকাতার বুক জল থেকে আকাশ দেখল। পাশে সুমি। সে পেটের নিচে হাত দিয়ে রেখেছে—ভয়, নিচে যে সন্তান জন্মলাভ করছে, ঠাণ্ডায় ওর কষ্ট না হয়।

পাতলা প্লাইউডের ঘর এখন জলের তলায়। মরা ইঁদুর ভেসে যাচ্ছিল জলে। জানালায় যুবক যুবতীর মুখ—ওরা বৃষ্টির জলে হাত রেখে বড় বড় হাই তুলছিল। কিছু টানা রিক্স চলছে, ট্রাম রাস্তার উপরে যেখানে জল কম, যেখানে একটা মরা কুকুর পড়ে আছে, টানা রিক্সগুলো সেই সব পথ ধরে প্রায় হিক্কা তোলার মত এগুচ্ছে। এই বর্ষায় পীচের পথ সব ভগ্নপ্রায়, মাঝে মাঝে ভয়ানক ক্ষতের মত দাগ, সুতরাং রিক্স চলতে গিয়ে ভয়ঙ্কর টাল খাচ্ছে। বর্ষার জলে পথ ভেসে গেছে বলে সুখী লোকেরা কাগজের সব নৌকা জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। সুমি এবং বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ সারা রাত জলে ভিজে ভিজে শীতে কাঁপছিল। অন্য ডাঙার সন্ধানে যাওয়ার জন্য ওরা জলে নেড়ী কুকুরের মত সাঁতরাচ্ছিল। ওরা আর পারছে না। গভীর রাতে যখন বর্ষণ ঘন ছিল, যখন কেউ জেগে নেই, যখন পথের সব আলো মৃত জোনাকীর মত আলো দিচ্ছে...সুমি অসীম সাহস বুকে নিয়ে ডাঙা জমির জন্য সর্বত্র বিচরণ করতে করতে সামনের চার্চ এবং রাজাবাজারের ডিপোতে অথবা জলের পাইপগুলো অতিক্রম করে অন্য কোথাও ...সুমি পরিচিত সব স্থান খুঁজে এসেছে, ডাঙা জমির কোথাও একটু সে ছাদ খুঁজে পায়নি।

ওরা জল ভেঙ্গে ওপারে এসে উঠতেই দেখল বৃষ্টি ধরে আসছে। আকাশের গুমোট অন্ধকারটা নেই এবং কিছু হাল্কা মেঘ দেখা যাচ্ছে। এ-সময়ে সেই পাগল পুরোপুরি নগ্ন। ভিজে জামাকাপড়। গায়ে রাখতে সাহস করছে না। সুমি পাঁচিলের সামনে শরীর আড়াল করে কাপড় চিপে নিল এবং ফকিরচাঁদের কাপড় চিপে দিল। ফকিরচাঁদ শীতে ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পাগলিনী জলের পাইপের ভেতর শুয়ে থেকে শুকনো হাড় চুষে চুষে শীতের কষ্ট থেকে রেহাই পাচ্ছে। ওর সব বসনভূষণ পাইপের ভিতর যত্ন করে রাখা। কিছু কাগজ সংগ্রহ করে মুণ্ডমালার মত কোমরের ধারে ধারণ করে যেন কত কষ্টে লজ্জা নিবারণ করছিল। আকাশে হাল্কা মেঘ দেখে এবং আর বৃষ্টি হবে না ভেবে ঠিক টাকী হাউসের সামনে বাঁ হাত কোমরে অথবা সামনে... তেরে কেটে ধিন এই সব বোলে পাগল হামেশাই নাচছে—কলকাতা বৃষ্টির জলে ডুবে গেল, আমার পাখি উড়ে গেল বাতাসে। পাগল এই সব গান গাইছিল।

সুমি পাগলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল এবং একটু ঠেলে দিয়ে বলল, 'এই তুই ফের নেংটো হয়েছিস! তুই ভারি অসভ্য।' বলে খিল খিল করে হেসে উঠল, ফকিরচাঁদ পাঁচিলের গোড়ায় বসে রয়েছে। সে হাসতে পারছে না। থেকে থেকে কাশি উঠছে এবং চোখ ক্রমশ ঘোলা দেখাচ্ছিল। আকাশের মেঘ হাল্কা, হয়ত আর বৃষ্টি হবে না। ফের ট্রাম বাস চলতে শুরু করবে অথবা এই সব সারি সারি ট্রাম বাস উটের মত মুখ তুলে 'দীর্ঘ উ টি আছে ঝুলে' বলে সারাদিন মুখ থুবড়ে থেমে থাকবে। ফকিরচাঁদ শীত তাড়াবার জন্য কাতরভাবে শৈশবের 'অ' য় অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে, ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে—যা বৃষ্টি শালা কোন ইঁদুরের ছানাকে আর বেঁচে থাকতে হচ্ছে না।' সে দেয়ালে এ-সময় কি লেখার চেষ্টা করল কিন্তু বাতাসে আর্দ্রতা ঘন বলে কোন লেখা ফুটে উঠল না।

ফকিরচাঁদ রোদের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল। ফুটপাত থেকে জল নেমে যাচ্ছে। ট্রাম বাস ফের চলতে শুরু করেছে এবং দুপুরের দিকে আকাশ যথার্থই পরিষ্কার—মনে হচ্ছে বৃষ্টি আর হবে না, যেন শরৎকালীন

হাওয়া দিচ্ছে। বৃদ্ধ এ-সময় সুমিকে পাশে নিয়ে বসল। রোদ উঠবে ভেবে সে সুমিকে জীবনের কিছু সুখ দুঃখের গল্প শোনাল। ভিজে কাপড় শরীরে থেকে থেকে শুকিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় জল কমে গেছে—বৃদ্ধ এবার উঠে দাঁড়াল এবং এক মগ চা এনে পরস্পর ভাগ করে খেল। বৃষ্টি আর আসছে না, বৃদ্ধঅনেকদিন আগের কোন গ্রাম্য সঙ্গীত মিনমিনে গলায় গাইছে। সে তার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তির ভিতর থেকে একটা ভাঙা এনামেলের থালা বের করে রেস্তোরাঁ অথবা কোন হোটেলের উদবৃত্ত এবং উচ্ছিষ্ট অন্নের জন্য বের হয়ে গেল। জীবনটা এ-ভাবেই কেটে যাচ্ছে—জীবনটা রাজবাড়ির সদরে ঝুলানো এক হাত গণ্ডারের ছবির মত —মাথা সব সময় উঁচিয়েই আছে।

কিন্তু কিসে কি হল বলা গেল না। সমাজের সব ধূর্ত শেয়ালদের মত আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। ফের বৃষ্টি—বর্ষাকাল এসে গেল। বৃষ্টি ঘন নয় অথচ অবিরাম। ফকিরচাঁদের বসবাসের স্থানটুকু ভিজে গেছে। পাগল পাগলিনীকে আর এ-অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে না। ফকিরচাঁদ উচ্ছিষ্ট অন্ন খেতে খেতে হাঁ করে থাকল—কারণ আকাশের অবস্থা নিদারুণ, আজ সারাদিন বৃষ্টি হবে....উত্তাপের জন্য ওর ফের কান্না পাচ্ছিল।

সুমি পাঁচিলের পাশে ফকিরচাঁদকে টেনে তুলল। এই শেষ শুকনো স্থান। ওর ভিতরে ভিতরে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। তলপেট কুঁকড়ে যাচ্ছে এবং ভেঙে যাচ্ছে। সুমি নিজের কষ্টের কথা ভুলে গেল এবং যে-কোনভাবে ফকিরচাঁদের শরীরে উত্তাপ সঞ্চয় হোক এই চাইল। ফকিরচাঁদ শীতের কথা ভেবে মড়া কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে। ফকিরচাঁদ খেতে পারছে না—কত দীর্ঘদিন থেকে যেন বৃষ্টি আর থামবে না—শীতে শীতে বছর কেটে যাবে। ফকিরচাঁদ বলল, 'সুমি আমাকে নিয়ে অন্য কোথাও চল।'

'কোথায় যাব রে! আমার শরীর দিচ্ছে না রে!' তের বছরের সুমি তলপেটে দু পাশে দু হাত রেখে কথাগুলো বলল।

ফকিরচাঁদ পুনরাবৃত্তি করল, 'আমাকে কোথাও নিয়ে চল রে সুমি।'

সুমি এনামেলের থালা থেকে বাসি রুটি এবং ডাল খাচ্ছিল। ভিজে জবজবে কাপড়। ভিতর থেকে ওর-ও শীত উপরে উঠে আসছে। এবং মনে হচ্ছে জরায়ুর ভিতর যেন কেউ গাঁইতি মেরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। সুমি নিজের এই কষ্টের জন্য রুটি মুখে দিতে পারছে না এখন এবং ফকিরচাঁদের কথার জবাব দিতে পারছে না।

বাস ট্রাম যাবার সময় কাদা জল উঠে আসছে ফুটপাথে। ফুটপাথ কর্দমময়। ফকিরচাঁদের এখন উঠে দাঁড়াবার পর্যন্ত শক্তি নেই। সে ক্রমশ স্থবির হয়ে পড়ছে। এখন সর্বত্র যেন বরফের মত ঠাণ্ডা এবং কাকগুলো বিজলির তারে বসে বসে ভিজছে। থেকে থেকে ট্রাম বাস চলছে এবং ছাতা মাথায় যারা যাচ্ছিল তারা ছাতার জলে আরও ভয়াবহ করে তুলছে ফুটপাত—সুতরাং ফকিরচাঁদ কিছু বলতে পারছে না, ফকিরচাঁদ বৃদ্ধ, সুন্দর হস্তাক্ষর ছিল, পণ্ডিত ছিল ফকিরচাঁদ—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, তারপর ফকিরচাঁদ পুত্র এবং পরিবারের সকলকে হারিয়ে দীর্ঘসূত্রতার জন্য ফুটপাতের ফকিরচাঁদ হয়ে গেল। ফকিরচাঁদের সংগ্রহ করা শতছিন্ন গেঞ্জি এবং আবরণ এমন কর্দমময়। সে শীতে ফের কাঁপতে থাকল এবং ফের কথা বলতে গিয়ে দেখল দাঁতমুখ শক্ত, শরীর শক্ত এবং অসমর্থ। সে যেন কোনরকমে নিজের হাতটা সুমির দিকে বাড়িয়ে ধরল।

এখন দিন নিঃশেষের দিকে। সুমি একটু শুকনো আশ্রয়ের জন্য গোমাংসের দোকান অতিক্রম করে রাজাবাজারের পুল পর্যন্ত হেঁটে গেছে। সর্বত্র মানুষের ভিড় এবং এতটুকু আশ্রয় সুমির জন্য কোথাও পড়ে নেই। সকল ফুটপাথবাসী অথবা বাসিনীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। সকলেই মাথার উপর ভাঙা ছাদ পেলে খুশি আর সর্বত্র ওলাওঠার মত মড়কের সামিল পথ ঘাট। সুতরাং সুমি ফিরে এসে হতাশায় ফকিরচাঁদকে কিছু বলতে পারল না। সে ফকিরচাঁদের পাশে চুপচাপ বসে পড়ল। ঠাণ্ডা লাগার জন্য শীতে এখন সে কাঁপছে।

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির ছাঁট সর্বত্রগামী। বৃদ্ধের চুল দাড়ি ভিজে গেছে। রাস্তার আলো বৃদ্ধ ফরিকচাঁদের মুখে—দাড়িতে বিন্দু বিন্দু জল মুক্তোর অক্ষরের মত—যেন লেখা, আমার নাম ফকিরচাঁদ শর্মা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, নিবাস যশোহর—ফকিরচাঁদ উদাস চোখে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে এ-সব ভাবছিল। চোখ ঘোলা ঘোলা ওর, সুমি এই বৃষ্টিতে বসেই এনামেলের থালা থেকে ঠাণ্ডা অড়হড়ের ডাল এবং রুটি ফটিকচাঁদের মুখে দিতে গেল। সে মুখে খাবার তুলতে পারছে না। —ঠাণ্ডায় মুখ শক্ত। সে শুধু উত্তাপের জন্য হাত দুটো সুমির হাটুর নিচে মসৃণ ত্বকের ভিতর গুঁজে দিতে চাইল।

সুমি বলল, 'দাদু তুই ইতর হয়েছিস?' বলে হাতটা তুলে দিতেই দেখল, ফকিরচাঁদের চোখ যেন ঘোলা ঘোলা—ফকিরচাঁদ যেন মরে যাচ্ছে।

সে চিৎকার করে উঠল, 'দাদু! দাদু!'

ফকিরচাঁদ ঈষৎ চোখ মেলে ফের চোখ বুজতে চাইল।

সুমি তাড়াতাড়ি একটু আশ্রয়ের জন্য হোক অথবা ভীতির জন্য হোক উঠে পড়ল। বৃষ্টি মাথায় একটু আশ্রয়ের জন্য দোকানে দোকানে এবং ফুটপাথের সর্বত্র এমন কি গলি ঘুঁজির সন্ধানে সে ছুটে ছুটে বেড়াল। বৃষ্টি ক্রমশ বাড়ছে। ফুটপাথে ফের জল উঠতে আরম্ভ করেছে। আর অধিক রাতে সুমি যখন ফিরল, যখন ফের তলপেটে ঈশ্বর কামড়ে ধরছে, শরীরটা নুয়ে পড়ছিল, জলের জন্য ভিতরে ভিতরে ঈশ্বর মোচড় দিচ্ছে এবং ট্রাম বাস চলছে না, ইতস্তত দূরে দূরে কিছু ট্যাক্সি কচ্ছপের মত ভেসে আছে এবং হোটেল রেস্তোরাঁর দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কেউ বৃষ্টিতে ভিজে জেগে থাকবার জন্য বসে নেই—সুমির তখন ক্লিষ্ট চেহারা বড় করুণ দেখাচ্ছিল। সামনে অপরিচিত অন্ধকার, চার্চের সামনে হেমলক গাছ—লোহার রেলিং টপকে গেলে ছোট ঘর এবং সেখানে কাঠের কফিন মাচানের মত করে রাখা। হেমলক গাছের বড় বড় পাতার ভিতর জলের শব্দ আর সামনে সব কবরভূমি—চার্চের ভিতর কোন আলো জ্বলছে না...সুমি নিঃশব্দে লোহার রেলিং টপকে কফিনের ভিতর শুয়ে সন্তান প্রসবের কথা ভাবতেই ফকিরচাঁদের কথা মনে হল—আবার সেই পথে এবং জলের শব্দ, সুমি ফুটপাথের জল ভেঙ্গে ফকিরচাঁদকে আনার জন্য ধীরে ধীরে রাজবাড়ির সদর দরজায় ঝোলানো এক হাত গণ্ডারের ছবির নিচে দাঁড়াল। ওর অদ্ভুত এক কান্না উঠে আসছে ভিতর থেকে। জন্মের পর এই বৃদ্ধকে সে দেখেছে আর সেই মোষের মত পুরুষটা যাকে সে তার ভালবাসা দিতে চেয়েছিল, যে চুণ গোলা জল ফেলে ঘুঘু পাখিদের উড়িয়ে দিয়েছে...সদর দরজায় এক হাত গণ্ডারের ছবির নিচে দাঁড়িয়ে সুমি কাঁদতে থাকল। বৃষ্টির ঘন ফোঁটা, গাছ গাছালির অস্পষ্ট ছায়া অথবা সাপ বাঘের ডাকের মত ব্যাঙের ডাক আর নগরীর দুর্ভেদ্য স্বার্থপরতা সুমির দুঃখকে অসহনীয় করে তুলছে। সুমির শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এমন কি পাগলেরাও এই বৃষ্টিতে বের হচ্ছে না, পুলিশ কোথাও পাহারায় নেই। সুমি একা এত বড় শহরের ভিতর এখন একা এবং একমাত্র সন্তান যে মুখ বের করবার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তখনই সুমি দেখতে পাচ্ছে পাগল জলের ভিতর হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে 'দু ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর।' পিছনে পাগলিনী। আজ এই রাতে দুজনের হাতেই লাঠি। লাঠির মাথায় পাখির পালক উড়ছে।

সুমি ফকিরচাঁদের হাত ধরে কফিনের ভিতর ঢুকে প্রসব করার জন্য কাঠের দোকানগুলো অতিক্রম করে গেল। ফকিরচাঁদ দেখল ওদের কাপড় জামা জলে ভিজে সপ সপ করছে। শীত সেজন্য ভয়ঙ্কর। ওরা দুজনে প্রথম জামা কাপড় ছেড়ে ফেলল—এখন ফকিরচাঁদই সব করছে। সুমি অতীব দুঃখে এবং বেদনায় একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল। ওদের শরীরে কোন আবরণ ছিল না। মাচানের নিচে সুমি ঢুকে যেতে চাইল। কিন্তু কফিনের ভিতরে কে যেন ফিস ফিস করে কথা বলছে। '—কে! কে!' ফকিরচাঁদ চিৎকার করে যুবকের মত রুখে দাঁড়াল।

কফিনের ডালা খুলে মুখ বের করতেই বুঝল সেই পাগল, পাগলিনী। ওরা আশ্রয়ের জন্য এখানে এসে উঠেছে।

ফকিরচাঁদ বলল, 'তোরা সকলে মিলে সুমিকে ধর। সুমির বাচ্চা হবে।'

ফকিরচাঁদ এবং পাগল হেমলক গাছটার নিচে বসে থাকল। পাগলিনী মায়ের মত স্নেহ দিয়ে সুমিকে কোলে তুলে চুমু খেল একটা। তারপর কফিনের ভিতর সন্তানের জন্ম হলে পাগলিনী গ্রাম্য প্রথায় তিনবার উলু দিল। সেই শব্দের ঝংকারে মনে হচ্ছিল সমুদ্র কোথাও না কোথাও আপন পথে অগ্রসর হচ্ছে, মনে হচ্ছিল—এই সংসার হাতির অথবা গণ্ডারের ছবির ভিতর কখনও কখনও লুকিয়ে থাকে। শুধু কোন সৎ যুবকের সংগ্রাম প্রয়োজন। পাগল হেমলক গাছের নিচে শেষবারের মত চীৎকার করে উঠল—'কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়।' ফকিরচাঁদ ধূসর অন্ধকারের ভিতর সুন্দর হস্তাক্ষরে শিশুর নূতন নামকরণ করে অদৃশ্য এক জগতের উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

['দু ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর' এবং 'সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়' কবি বিমল চক্রবর্তীর কবিতা থেকে সংগৃহীত]

শেকড়

সে আজকাল টের পায় সূর্য তার আকাশে আর মধ্যগগনে নেই—হেলে পড়েছে। এই বয়সে উপদ্রব কমার কথা—কমছে না। বরং বাড়ছে। পোকা মাকড়ের উৎপাতে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। জীবনে বোধহয় এমন সব উৎপাত সব মানুষকেই কামড়ায়—অহরহ সে জ্বলছে। কোনো উৎপাত থাকবে না জীবনে তাই বা হয় কি করে! তবু তার মনে হয় সবাই তাকে পেয়ে বসেছে। সংসারের সব দুর্ভোগের দায় তার। জায়া থেকে জননী সবারই অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। সে কাউকে খুশি করতে পারে নি।

চিঠিটা পাবার পরই এমন সে ভাবছে।

অভিযোগ, তোমাকে আমি পেটে ধরি নি। সেই কবে পুজোর সময় বাড়ি ঘুরে গেলে, আর এ-মুখো হও নি। আমি বেঁচে আছি কি মরেছি তার খোঁজ খবর পর্যন্ত নাও না। আমি মরে গেলে তোমরা রক্ষা পাও বুঝি। ভগবান কেন যে আমাকে নেয় না।

আসলে আট-দশ মাস হয়ে গেল, কিছুতেই বাড়ি ঘুরে আসার সময় পাচ্ছে না সে। দু-পাঁচদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি ঘুরে এলে মা খুশি হবে সে জানে। বেশি ত দূর না। ট্রেনে পাঁচ ছ-ঘণ্টাও লাগে না। বাড়ি যেতে পারছে না বলেই ক্ষোভ। শীতের সময় ভেবেছিল যাবে। কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে নি। এত ঠাণ্ডায় কষ্ট পাবে বলেই ঝুনু রাজি হয় নি। তার ঠাণ্ডার ধাত আছে। অসুখ বিসুখ বাধিয়ে ফিরলে কে দেখবে!

সংসারে সে টের পায়, সবার সব কিছু হতে পারে, কেবল তাকে নীরোগ থাকতে হবে। স্বাস্থ্য অবশ্য তার অটুট। গত বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে সে কোনো বড় অসুখে ভুগেছে মনে করতে পারে না। তার একটাই অসুখ—ভাই বোন স্ত্রী-পুত্র সবাই ভাল থাকুক। সবাই সুখে থাকুক। কেউ সুখে নেই চিঠি পেলে সে অস্থির হয়ে ওঠে। তার এই দুর্বলতা সবাই টের পেয়ে গেছে। বড় পুত্রটিকে নিয়ে পুজোর পর থেকে বড় রকমের ঝামেলায় পড়ে গেছিল। তার ছোটাছুটির শেষ ছিল না। কোথায় হায়দরাবাদ, সেখানে অস্থায়ী বদলি। বড় পুত্রটি আজ দু-তিন বছর ধরেই একটা না একটা ঝামেলা সৃষ্টি করে চলেছে। বোকারোতে পোস্টিং। জুনিয়ার একজিকিউটিভ ট্রেনিং। ট্রেনিং শেষ হতে না হতেই মারাত্মক জণ্ডিস। তাকে বাড়ি নিয়ে আসা, চিকিৎসা এবং আরোগ্য লাভের পর ডাক্তারের পরামর্শ মতো বিয়ে। কোথায় থাকবে, কী খাবে, এই দুশ্চিন্তায় সে অস্থির ছিল। অনিয়ম অত্যাচার থেকে রিলাপস করলে ভোগান্তি।—বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিন। পাঠিয়ে দিয়েছিল—দু-পাঁচ মাসও পার হয়নি, বৌমা অন্তঃসত্বা। আর বাচ্চা হবার দু-তিন মাস বাদেই হায়দরাবাদে ছ মাসের জন্য অস্থায়ী বদলি।

অস্থায়ী বদলির ক্ষেত্রে স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। কিন্তু বড় পুত্র কেমন নিরুপায় তার। সে একা থাকতে ভয় পায়। অতিরিক্ত মাত্রায় ইনট্রোভার্ট। অপরিচিত জায়গায় সে নির্বান্ধব অবস্থায় থাকতে রাজি নয়, ফ্ল্যাট ভাড়া করে চিঠি, বৌমাকে দিয়ে যাও। চিঠি পেয়ে মাথা গরম—বন্ধু বান্ধবরা ঠিকই বলেছে, এত অল্পবয়সে বিয়ে দেওয়া তোমার ঠিক হয় নি। ম্যাচিওরিটি গ্রো করে নি। তা তেইশ-চব্বিশ বছরে কে আজকাল আর ছেলের বিয়ে দেয়!

কিন্তু তার যে গলায় কাঁটা। এমন স্বভাব, পুত্রটি নিজে কিছু করে নিতে শেখে নি। ট্রেনিং পিরিয়ডে মেসে ছিল। তারপর বাসা নিয়েছে। কাজের লোক পাঠাও। কাজের লোক গেল। তারপর ব্যাধি। অন্তত তার পুত্রটির ভালমন্দ দেখার কেউ থাকুক সে এটা চাইত। বিয়ে দিলে দুশ্চিন্তার হাত থেকে নিস্তার পাবে এটাও ছিল এক ধরনের স্বস্তি।

ছোটো। কী আর করা!

বৌমা নাতি আর সে প্লেনে সোজা হায়দরাবাদ। ঘণ্টা দুই লাগে ঠিক, তার আগে টিকিট কাটা থেকে, সংসার করতে অতি প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস, তালিকা মিলিয়ে নেওয়া—কতটা নেওরা যাবে, ওজনের প্রশ্ন আছে, নাতির কাঁথা বালিশ ফিডিং বোতল এবং ছোট স্টোভ, এ-ধরনের কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করে এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সিতে শ্রীনিবাসনগর কলোনিতে দোতলায় ফ্ল্যাটে উঠে অবাক। মাত্র একটা ক্যাম্প খাট আর ভি আই পি স্যুটকেস ছাড়া ঘরে কোনো আসবাব নেই। জল নেই। একদিন অন্তর জল, এমন বিপাকে মানুষকে পড়তে হয় সেই প্রথম সে টের পেল। পুত্রটির ধারণা, বাবা আছে।

তক্তপোষ বিছানার দরকার—বাবা আছেন।

রান্না-বান্নার ইউটেনসিল—বাবা আছেন।

তার মাথা গরম হয়ে গেছিল। দু-তিন মাসের শিশুকে নিয়ে যে এ-ভাবে থাকা যায় না, সে বোধটুকু পর্যন্ত পুত্রের নেই। ফ্ল্যাটে বেসিন, বাথরুম সব ঠিকঠাক। জল আসে না। জল আসে, ঝি আসে না—এটা যে দেখে নেওয়া দরকার অসংসারী পুত্রের মাথায় তাও কাজ করে নি। যেন বৌমা গেলেই তার কল থেকে জল গড় গড় করে পড়বে—তার সকালের টিফিন ঠিকঠাক হয়ে যাবে, অফিসে লাঞ্চ, রাতে ফিরে দেখবে খাওয়ার টেবিলে সব ঠিকঠাক আছে। এগুলোর জন্য যে বন্দোবস্ত রাখতে হয়, সেটা বোধহয় পুত্রের মাথাতেই ছিল না। তার ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু বৌমা খারাপভাবে ভেবে পুত্রটি কত অবিবেচক তাও প্রকাশ করতে পারে নি। গ্যাস থেকে আরম্ভ করে সবকিছুর বন্দোবস্ত করে ফিরে আসতে তার প্রায় দু হপ্তা লেগে গেছিল।

একবার শুধু বলেছিল, তুই কি রে! সামান্য বোধ বুদ্ধিটুকুও নেই। কিছু ঠিকঠাক না করে হুট করে লিখে দিলি বৌমাকে দিয়ে যাও।

তার জবাব শুনে সে থ।—আমি লিখলেই তুমি পাঠাবে কেন! অসুবিধা হবে যখন জানতে নিয়ে এলে কেন। ও পারবে কেন? তোমারই উচিত ছিল না নিয়ে আসা। পুত্রটি যেন বুঝিয়ে দিতে চাইল কাণ্ডজ্ঞানের অভাব কার বোঝো।

এরপর আর কী কথা বলা যায় তার মাথায় আসে নি। সে কোনো রকমে প্রায় নরকবাসের মতো কটা দিন কাটিয়ে দিয়েছিল। নিজের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য ইস্টকোস্ট ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে বসেছিল। নিজেকে নির্যাতন করার মধ্যেও কোনো ক্ষোভ লুকিয়ে থাকে, ফেরার সময় সেটা সে টের পেয়েছিল।

সে তার ক্ষোভ থেকেই সহসা কেন যে স্থির করে ফেলল, বাড়ি যাবেই। যত গরমই হোক, যত লু-এর হলকা চলুক সে যাবেই। বাড়ির নামে ঝুনু তটস্থ হয়ে থাকে।

পঁচিশ ত্রিশ বছরে ঝুনু তার স্বভাব পালটে দিয়েছে। শহরবাসের ফল। নিজের বাড়ি ঘর, দোতলা বাড়িতে তিনটে প্রাণী—সে ঝুনু আর ছোট ছেলে। রান্নার লোক, ঠিকে ঝি উচ্চবিত্ত পরিবারে যা যা থাকবার সবই আছে তার। স্ত্রীর কলেজ, তার অফিস, ছোট ছেলে সি-ই-এস-সি-র ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং, তবু ঝুনুর নাই-নাই বাতিক। সে বাড়ি যাবে বললেই ঝুনুর মুখ গোমড়া—ঠিক অসুখ বিসুখ বাধিয়ে ফিরবে, এই ভয় নিরন্তর। গাঁয়ের বাড়িতে আলো পাখা নেই। বাথরুমের অবন্দোবস্ত, জানালা ছোট, ঘরে হাওয়া ঢোকে না—মাটির ঘর—চারপাশে গাছপালা, ঝোপজঙ্গল, সাপের উৎপাত আছে—কিছু একটা হলে কে এসে পাশে দাঁড়াবে। বাড়ি যাব বললেই ঝুনুর তিক্ততা বেড়ে যায়।

এ-সব কারণে সে ইচ্ছে হলেই যেতে পারে না। গেলে আর ফিরে আসবে না এমনও আতঙ্ক থাকে ঝুনুর। সে কত বুঝিয়েছে—ওখানে আমি বড় হয়েছি, আমার অভ্যাস আছে, পাখা আলো না থাকলেও অসুবিধা হবে না। অবশ্য সে জানে অসুবিধা তার ঠিকই হয়। কিন্তু ভাই বোনদের মধ্যে কয়েকদিন কাটিয়ে আসতে পারলে আশ্চর্যরকমের মুক্তির স্বাদ পায়। তার যেন আয়ু বাড়ে। ঝুনু তার এই অমল আনন্দ থেকে যতদিন পারে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করে। শেষে সে মরিয়া হয়ে উঠলে, ঝুনুর সেই এক বস্তাপচা উপদেশ—জল ফুটিয়ে দিতে বলবে। বাসি খাবার খাবে না। রাতে টর্চ নিয়ে বের হবে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বয়স যত বাড়ছে, তত তার ক্ষোভ পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠেছে। মনে হয় সবাই অবিবেচক। মণিটা এত অমানুষ—চিঠিতে ভয় দেখিয়েছে, যা অবস্থা তাতে তোমার ভাইকে জনমজুর খাটতে হতে পারে। আসলে মাসোহারা সে যা দেয় তাতে সঙ্কুলান না হবারই কথা। মাও মাঝে মাঝে চিঠি দেবে, আর কটা টাকা বেশি দিস। বাজার দিনকে দিন গরম, এতে চলে কী করে! দারিদ্র্য কাকে বলে বাড়ি গেলে সে টের পায়। মা আলাদা। মণি আলাদা। বড়দা আলাদা। বড়দা রিটায়ার করে, পাশেই আলাদা বাড়ি করেছে। রিটায়ার করার পর পেনশন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড মিলে যা সঞ্চয় অভাব থাকার কথা না। দাদা বৌদি মেয়ে দুই ছেলে তার। তারও নাই নাই ভাব। পাছে মাকে উপুড় হস্ত করতে হয়, যতটা না অভাব তার চেয়ে বেশি ছদ্মবেশ। মাঝে মাঝে সে উত্তপ্ত হয়ে উঠলে না বলে পারে না, তুমি মাকে কিছু দিতে পার না! দিলে মা কত খুশি হয়!

—কোত্থেকে দি অময়। আমার ত ঘাড়ের উপর শমন। নামাতে পারছি না, রাতে অনিদ্রায় ভুগি, বল কী করে দিই।

মণি, তুই বিয়ে করে বসে থাকলি! বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে আমার ঘাড়ে চেপে বসলি। নিজে কিছু করার চেষ্টা কর। আমি আর কতদিন! কেবল মিলুর স্বচ্ছল সংসার। মিলুর ইস্কুলে চাকরি, তার বর শহরে অফিসে সরকারি চাকুরে, এক ছেলে—বাড়ি-ঘর নিজের। এরা তার এককালের কাছে পিঠে ছিল। এখন কেমন সবাই ভিন্ন গ্রহ তৈরি করে নিয়েছে। বাড়িতে গেলে এইসব পোকামাকড়ের উপদ্রবের মধ্যেও তার মনে হয় সে আবার তার কৈশোর যৌবনে ফিরে এসেছে।

মার খুব ইচ্ছে ছিল, বাড়িটা শহরে না করে দেশে করলে সবাই দেখত, কত লায়েক তার ছেলে—কিন্তু ঝুনুর এক কথা, আমি এত টানতে পারব না। থাকব এখানে, আর বাড়ি করবে দেশে। ইচ্ছে হয় কর, কিছু বলব না। সেখানে তুমি ভাইবোনেদের নিয়ে সুখে থাকো, আমার—কপালে যা আছে হবে।

কলকাতায় যার বাড়ি, সংসারে যার চারজন প্রাণী—এবং সবাই উপার্জনশীল, তার কাছে সবার প্রত্যাশা একটু বেশি পরিমাণে—অময় তা বোঝে। কিন্তু যে যার রোজগার মতো মর্যাদা বাড়িয়ে নেয়। ঝুনুকে বললে, এক কথা, কি আছে, বাড়ি করেছ, গ্যারেজের কোনো ব্যবস্থা রাখো নি। তোমার ক্ষমতায় না কুলায়, ছেলেরা তো আছে। গ্যারেজ না থাকায় বাড়িটা কেমন দাম হারিয়ে ফেলছে দিনকে দিন। বাড়িতে গ্যারেজের ব্যবস্থা না থাকায় কখনও অশান্তি হয় সে আগে জানত না।

তার এই প্রাণপাতের মূল্য কেউ দেয় না। সে এত কষ্ট করে বাড়িটা করেছে, অথচ এখন দেখছে খুঁতের অন্ত নেই। ঝুনুকে সে কিছুতেই খুশি করতে পারে না, গ্যারেজের বন্দোবস্ত নেই। বলে কথায় কথায় খোঁটা, যেমন মানুষ, তার তেমন বাড়ি। অথচ সস্তায় জমিটা পেয়ে যাবার পর অময় ভাবতেই পারে নি, কখনও সেখানে তার বাড়ি উঠবে। মানুষের ঘরবাড়ি এক বয়সে সে জীবনের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায় বাড়িটা করার সময় সে টের পেয়েছে।

অময় বলল, কালই বাড়ি যাচ্ছি। সে টাইম টেবিল দেখল। বারোটায় ট্রেন আছে একটা। নতুন চালু হয়েছে। সকাল সাড়ে আটটার ট্রেনে ভিড় হয়।

ঝুনু ও-ঘর থেকে বলল, তোমার কি মাথা খারাপ! এই গরমে কেউ বের হয়! এত দূরে কেউ যায়! এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই, চারপাশে আগুন জ্বলছে, তিনি বাড়ি যাবেন।

—আমার কিছু হবে না।

—তোমার হবে না, আমাদের হবে।

ছোট পুত্রটি বোঝে, লেগে গেল দু জনে। সে বলল, কটা দিন পরে গেলে কী হয় বুঝি না!

কটা দিন পরে গেলে মানে, বৃষ্টি বাদলা হলে এত গরম থাকবে না। একটানা কতকাল থেকে যেন আকাশ দিনের বেলা আগুন হয়ে গেছে। কালবৈশাখী পর্যন্ত টের পাওয়া গেল না। দুপুরে দরজা জানালা বন্ধ করে না দিলে গরমের হলকায় শরীর পুড়ে যায়। কেবল ঠাণ্ডাজল, তেষ্টা বাড়ে, দর দর করে ঘাম, লোডশেডিং হলে বাড়িতে প্রায় মড়াকান্না শুরু হয়—হেন ধুন্ধুমার যখন চলছে তিনি বাড়ি যাবেন!

অময় বলল, ওখানে কি মানুষজন থাকে না? ওখানে কি আমার মা বেঁচে নেই, ভাইবোনেরা বেঁচে নেই?

ঝুনু বলল, বেঁচে আছে। ওকে বেঁচে থাকা বলে না।

মাথায় দপ করে আগুনটা ছড়িয়ে পড়ে। আত্মপর মনে হয় ঝুনুকে। অময় আর ঝুনুকে কিছু না বলে অফিস বের হয়ে গেল।

পরদিন সকাল সকাল উঠে পড়ল অময়। ফোনে কথা বলল, দু-একজনের সঙ্গে। এখন এসে লাভ হবে না এমন জানাল। সে বাড়ি থাকছে না। দেশে যাচ্ছে। রান্নার মেয়েটাকে বলল, এগারটায় বের হবে।

ঝুনু সব শুনছে। কিছু বলছে না। দিন দিন কেমন জেদি একগুঁয়ে হয়ে উঠছে—এত জেদ ভাল না, ভালর জন্যই বলছি, অভ্যাস নেই, গরমে কিছু একটা হলে গাঁ-জায়গায় কে কী করবে! ঝুনু খুবই ক্ষেপে গেছে। তার কথার কোনো দাম থাকে না সংসারে। খুশি মত চলে। সময় অসময় বুঝবে না। মার চিঠি পেয়ে উতলা। মা জানে না, ছেলের কষ্ট হবে। কী অবুঝ মা! এমন মা সংসারে থাকে ঝুনুর কিছুতেই মাথায় আসে না। নিজের দিকটা ষোল আনা, নিজের জেদ ষোল আনা—কিছুতেই এখানে এসে থাকবেন না। তা আমার সংসারে ভাল লাগবে কেন! নিজের সংসার ফেলে এখানে থাকবেন কেন! কিছুতেই দু-পাঁচদিনের বেশি থাকতে চায় না। সে নিজেও চিঠি লিখেছিল, এত গরমে আপনার কষ্ট, গরমের সময়টা এখানে কাটিয়ে যান। চিঠির উত্তরই দেয় নি। যেমন মা, তেমন তার ছেলে, বেশি ভাল হবে কোত্থেকে!

ঝুনু না পেরে বলল, যাবেই ঠিক করেছ?

—দেখতেই পাচ্ছ।

ঝুনু বুঝতে পারছে, বাবুর গোঁ উঠেছে। তার সাধ্য কি, ধরে রাখে। সারাদিন প্যাচপ্যাচে গরমে তারও মাথা ঠিক নেই। তবু যখন যাবেন বাবু, যাক। মজা বুঝে আসুক। কপালে যা আছে হবে। সে এক বোতল বরফ ঠাণ্ডা ফোটানো জল দিল। রাস্তার টিফিন দিল। বার বার বলে দিল, রাস্তার কিছু খাবে না। যেন বাবুটি খুবই ছেলেমানুষ—একবার মার কথা মাথায় চেপে বসলে কেমন দিকভ্রান্ত হয়ে যায়। সংসারে মা-ই সব, ক্ষোভে অভিমানে সে যে জ্বলছে বুঝতে দিচ্ছে না।

—ছাতা নাও সঙ্গে।

—লাগবে না।

তবু অ্যাটাচিতে জোরজার করে ছাতা ঢুকিয়ে দিল। টর্চলাইট, জলের বোতল, রাস্তার টিফিন কোথায় রেখেছে বলে দিল। ট্যাক্সি এলে অময় উঠে বসল। ঝুনু গেটে দাঁড়িয়ে আছে। এক সময় ট্যাক্সিটা চোখের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলে ঝুনু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

এই ক্ষোভ কত মারাত্মক হতে পারে অময়ের মুখ দেখলে টের পাওয়া যায়।

অময় ভিতরে ভাল নেই। মাঝে মাঝে মনে হয়, সুখ সচ্ছলতা মানুষকে অমানুষ করে দেয়। তার বাবার চাষবাস জমিজমা, গৃহদেবতা, গরুবাছুর এই ছিল সম্বল। মাটির ঘরে সে জন্মেছে, বড় হয়েছে। পড়াশোনা করেছে, আবার জনমজুরদের সঙ্গে দরকারে জমিতে নিড়ি দিতে বসে গেছে। বাবার সঙ্গে থেকে চাষবাসের যে আলাদা একটা মাধুর্য আছে সে টের পেয়েছিল। দরকারে ভাই বোনেরা মিলে পাট কেটেছে, খালের জলে পাট জাব দিয়েছে পাট কেচেছে—চাষবাস থাকলে সংসার যেমনটা হয়ে থাকে আর কি! গরুর দুধ দোয়ানোর কাজটা সেই করত। কলেজ থেকে ফিরে অনেক দিন সে গরু নিয়ে জমির আলে আলে ঘাস খাইয়েছে। এর মধ্যেও আশ্চর্য মাদকতা আছে। কাঁচা ঘাস খাওয়ালে দুধ ঘন হয়, কাঁচা ঘাস খাওয়ালে দুধ বেশি দেয় এ-সব সে নিজের হাতে করে দেখেছে। প্রকৃতির মধ্যে গরুর দড়ি ধরে হেঁটে যাওয়া, সবুজ ঘাসের খোঁজে থাকা, অনেক কিছুর মধ্যে নিরন্তর এই আগ্রহের খবর ঝুনু জানেই না।

আসলে সে যে বাড়ি যায়, মার চিঠি পেলে স্থির থাকতে পারে না, রক্তে সেই স্বাদ সুপ্ত হয়ে আছে বলে। কেমন এক মুক্তির স্বাদ। বাবাকে দেখে বুঝেছিল, জড়িয়ে থাকা যেমন জীবনের লক্ষণ আবার প্রয়োজনে উপেক্ষা করার মধ্যেও আছে মুক্তির স্বাদ।

সে স্টেশনে গিয়ে দেখল, জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে। ওটা ছেড়ে দিলেই লালগোলা প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফরমে ঢুকবে।

গরমে অময় দর দর করে ঘামছিল। এত ভিড় যে পাখার নিচে গিয়েও দাঁড়াতে পারছে না। সে তার অ্যাটাচিটা একটা বেঞ্চিতে রেখে ঠাণ্ডা হাওয়া খাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে কেন জানি মনে হল—না ঠিক না। সেই সুখ তাকে আবার তাড়া করছে। এক দঙ্গল যুবতী ভিড়ের মধ্যে ঝুঁকে পাখাওয়ালার কাছে গিয়ে ঘিরে দাঁড়াল, সবাই একটা করে তালাপাতার জাপানি পাখা কিনে ফেলল, যেন স্টেজে উঠে এক্ষুনি তারা নাচ শুরু করবে—শরীরে সুবাস তাদের, দূর থেকেও এই সুবাস সে টের পাচ্ছে। তারপর যুবতীরা কে কোথায় নিমেষে হারিয়ে গেল। সে দেখল, মানুষের ছোটাছুটির শেষ নেই, ব্যস্ততার শেষ নেই। তার আজ কোনো ব্যস্ততা নেই। জলের বোতলটার কথা মনে হল, তেষ্টা পাচ্ছে, পাশে বেঞ্চে ছোট্ট শিশু নিয়ে বসে আছে চাষী বৌ। নাকে নথ। ঘোমটায় কপাল ঢাকা। মেয়েটা কাঁদছিল। ছোট্ট ফ্রক গায়। জল তেষ্টা পেতে পারে, লোকটা জলের ফ্লাস্ক দরদাম করছে, এই গরমে কাঁধে হরেক রকম প্লাস্টিকের জলের বোতল নিয়ে ঘুরছে ফেরিওয়ালা। ডাবল দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সব। গরিব মানুষের হিসাব সহজে মেলে না। জলের বোতল কিনতে তার সাহস হয় নি, গুচ্ছের টাকা দেবার ক্ষমতা নেই—অময়ের কী হল কে জানে, সে ব্যাগ থেকে জলের বোতলটা বের করে বলল, নিন।

লোকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল।—না না বাবু আপনার চলবে কী করে। কি গরম! গলা শুকিয়ে যাচ্ছে! অময় হাসল, চলবে। আমি একা মানুষ—কোথাও খেয়ে নেব। সে ইচ্ছে করে বোতলটা ছোট্ট শিশুর পাশে রেখে হাঁটা দিল। জলের কল থেকে জল খেল। যেমন সে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে এই লাইনে, কতবার সে টাকার অভাবে টিকিট না কেটেই গেছে—আর তখন লুকোচুরি খেলা। একবার মনে আছে, কলকাতায় ইন্টারভিউ দিতে এসে ফেরার পয়সা ছিল না। কাশিমবাজার স্টেশনে নেমে রাতের অন্ধকারে ধরা পড়ে গেল। নীল বাতি নিয়ে পয়েন্টসম্যান দাঁড়িয়েছিল শেষ মাথায়। ধরা পড়ার ভয়ে গেট দিয়ে ঢোকে নি, কোনোরকমে লাইন পার হয়ে আমবাগানে ঢুকে গেলেই আর পায় কে! আর কোত্থেকে ভূতের মতো পয়েন্টসম্যান ফুস করে উঠে দাঁড়াল। সে পালাতে গেলে তার কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ চেপে ধরেছিল। সে ব্যাগ ফেলেই ছুটেছিল—আঠার উনিশ বয়সে বোধহয় মানুষ বেশি দুঃসাহসী হয়, ব্যাগ ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। সামনের বন- জঙ্গল পার হয়ে মিলের রাস্তায় পড়ে নিশ্চিন্তি।

এমন একটা খেলা শুরু করলে কেমন হয়! এই বয়সে খেলাটা জমলে মন্দ হয় না। সে তার সেই আগেকার জীবনে ফিরে যেতে চায় বলেই ত, বছরে এক দু-বার তার বাড়ি না গেলে মেজাজ ঠিক থাকে না।

জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস ছেড়ে গেলেই প্ল্যাটফরম ফাঁকা হয়ে গেল। লালগোলা প্যাসেঞ্জার ঢুকছে। ভিড় নেই বললেই হয়। ভিড় থাকলেও সে ছোটাছুটি করত কিনা জানে না। দাঁড়িয়ে কতবার কতটা রাস্তা ট্রেনে গেছে! রানাঘাটে কিছুটা খালি হয়। কৃষ্ণনগর গেলে আরও খালি—বসার জায়গার অভাব হয় না। কিন্তু আজ দেখছে, বেশি খালি কামরা। সে একদিকের একজনের আলাদা সিটে জানালার কাছে বসে গেল। ট্রেনটা প্ল্যাটফরম ছেড়ে যেতেই বুঝল, গরম বাতাস ঝাপটা মারছে। যেন লু বইছে। ঘর-বাড়ি ইলেকট্রিকের তার ইস্পাতের মতো চকচক করছে। কাক শালিখের ওড়াউড়ি গরমের ত্রাস থেকে। তার কেমন মজা লাগছিল। সে কেমন তার নিজের কাছে ফিরে যেতে পারছে। অফিসে এ-সময়টায় সে তার এয়ারকণ্ডিসান ঘরে বসে থাকে। এখন সে বসে আছে নিরন্তর এক দাবদাহ সঙ্গে নিয়ে। দমদমে গাড়িটা থামবে। ভিড় বাড়ছে। ব্যারাকপুর এলে, আরও। দু একজন দাঁড়িয়ে আছে। একজন ষণ্ডামার্কা লোক তার দিকে এগিয়ে এসে বলল, সরে বসুন।

সে মাঠ দেখছে। এরাই সেই সব লোক, যারা তার গোত্রের। এদের সুবিধা-ভোগী লোক বলা হয়। সুযোগ পেলেই অন্যের সুখ কেড়ে নেয়। নিজের সুখ তৈরি করে।

—কী বলছি শুনতে পাচ্ছেন!

সে শুনতে পেল না।

—সরে বসতে বলছি। দু জন হয়ে যায়।

—হয় না। একজন বসতে পারে। অময় না তাকিয়েই বলল। অময় কঠিন মুখে যুবকটিকে দেখল। তার হাতের কব্জি শক্ত। লোমশ বুক। চোখে জ্যৈষ্ঠ মাসের খরতাপ। টের পেয়েই যুবকটি কাকে যেন ডাকতে গেল। কতটা হুজ্জোতি হতে পারে অময়ের কেন জানি আজ দেখার আগ্রহ। আর তখনই দেখল, একজন বুড়ো মতো মানুষ ওদিকটায় দাঁড়িয়ে আছে। সে ডাকল, শুনুন। কাছে এলে বলল, দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন না। বলে সে সরে বসে বুড়ো মানুষটিকে জায়গা করে দিল। পাঁচ সাতজন জড়ো করে সেই যুবক এসে দেখল, লোকটা রোদের মধ্যে গরম বাতাসের হলকায় পুড়ছে। পাশে একজন বুড়ো মানুষকে বসিয়ে রেখেছে। নিতান্ত হত দরিদ্র, গালে বাসি দাড়ি। গায়ে প্যাচপ্যাচে ঘামের গন্ধ। যুবক দাঁত শক্ত করে বলল, একজনের সিট বলছিলেন।

অময় তাকাল না।

অময় জানে, এরা ট্রেনের নিত্যযাত্রী। এরা গাড়িটাকে পর্যন্ত নিজের বাপের মনে করে। শুয়োরের বাচ্চা সব।

—শুনতে পাচ্ছেন?

—না।

অময় মাঠ দেখছে।

—এখন দু জনের সিট হল কী করে?

অময় জবাব দিল না। বুড়ো লোকটিকে সে বলল কোথায় যাবেন!

—রেজিনগর নামব। ওখান থেকে দু ক্রোশ পথ।

—এই রোদে হেঁটে যেতে পারবেন?

যুবকটি এবার তার সাঙ্গপাঙ্গদের বলল, কি রে কী বুঝছিস! ধরব নাকি!

অময় ভ্রূক্ষেপ করল না। গম্ভীর গলায় বলল, ট্রেনের জানালায় আজকাল রড দেয়া থাকে দেখছি।

যুবকটি রুমাল দিয়ে ঘাড় গলা মুছে পা ফাঁক করে দাঁড়াল।—মশায়ের কোথায় যাওয়া হবে।

অময় বলল, এতটা রাস্তা রোদে হেঁটে যাবেন, কষ্ট হবে। ছাতাটা নিন। সে ছাতাটা বের করার সময় কালো একটা কি বের করে প্যান্টের ভাঁজে লুকিয়ে রাখল।

যুবক চমকে গেল। পুলিশের লোক! পুলিশের বড়কর্তা হতে পারে। বেশি রঙ সহ্য নাও করতে পারে। সে গা ঢাকা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। অময় হাসল। বুড়ো লোকটি বলল, না না ছাতা আমার লাগবে না। আমার অভ্যাস আছে। মাথায় রোদ লাগে না।

অময় বলল, আপনি না নিলে, জানালা দিয়ে ফেলে দেব। দেখবেন। বলে সত্যি সে ছাতাটা তুলে ফেলতে গেলে কেমন অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল বুড়োমানুষটি। ভাবছে তার মাথা খারাপ নয় ত। কিন্তু আচরণে কোথাও বুড়োমানুষটি তা টের পায় নি। বলল, ছাতা ফেলে দেবেন কেন?

তারপরেই মনে হল অময়ের, নাটক হয়ে যাচ্ছে, আশপাশের যাত্রীরা তাকে দেখছে। সে এটা চায় না।

সে একসময় ভাবল, থাক ছাতাটা। বাড়ি গিয়ে মণিকে দেবে। টিফিন বের করে সে খেল না। থাক, বাড়ি ফিরে মণির ছেলে মেয়েদের খেতে দেবে। সে চিনাবাদাম কিনে খেল। শোনপাপড়ি খেল। কলের জল থেকে জল খেল। ঘামে জামা-প্যান্ট ভিজে গেছে! ভাল লাগছে—এটাই সে চাইছে। বাড়ি গিয়ে পৌঁছাল সাড়ে পাঁচটায়। মা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে। প্রচণ্ড গরমে সে হেঁটে এসেছে স্টেশন থেকে। রিক্সা পর্যন্ত নেয় নি। মা বলল, তোর কি মাথা খারাপ! এই রোদে হেঁটে এলি! অসুখ বিসুখ হলে কে দেখবে বাবা!

অময় বলতে পারত, অনেকদিন পর মা আমি আবার আমার মধ্যে ফিরে আসতে পেরেছি। ফিরে আসার এই মজা যে বোঝে সে বোঝে।

সে মাকে গড় করার সময় বলল, কোনো কষ্ট হয় নি। অনেকদিন পর নিজের সুখ কাকে বলে টের পেলাম মা। তুমি কেমন আছ! আর সবাই?

মণি তখন তার গরুটাকে মাঠের মধ্যে রোদে ঘাস খাওয়াচ্ছে। দাদাকে দেখেই সে ছুটে আসছে। সবাই। এই বাড়ির গাছপালা বনজঙ্গল সব তার শৈশব কৈশোর এবং যৌবনের কথা। সে এখানে এলেই মুক্তির স্বাদ পায়। মা গাছের নিচে মাদুর বিছিয়ে দিলে সে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল, বলল, আঃ কি আরাম!

ঝোড়ো হাওয়ায় পাতা উড়ে গেল। পাখিরা ডালে এসে বসল। পরিচিত মানুষজন বলল, কে অময়? সদরে কোনো কাজ ছিল? গাড়িতে না ট্রেনে?

সে বলল, ট্রেনে কাকা। সেই ট্রেনে—জলের বোতল নেই, ছাতা নেই, টিকিট নেই। সেই ট্রেনে আমি আবার আজ ফিরে আসতে পেরেছি। সে আর যা বলতে পারত, আমার জীবনের প্রথম এবং শেষ ট্রেন ঐ একটাই। অন্য ট্রেনে চেপে বসলে বড় অস্বস্তি।

ভুখা মানুষের কোনো পাপ নাই

সাধুচরণের সুদিনের মুখে টেপি যদি খাণ্ডবদাহনে যোগ দেয় তবে সে যে নাচার! পরান কর্তা যা সামলাতে পারবে, কেশব কর্তা যা সামলাতে পারবে তার পক্ষে সেটা যে বড় ধুনদুমার কাণ্ড। দুটো পেটে দিতে পারা যার একমাত্র দায় আর রাতে ধর্মপত্নীর পাছার কাপড় সরিয়ে হাত দেবার মধ্যে জীবনের সর্ব সুখ সার করে যে পড়ে আছে তারে কেন ঝামেলায় ফেলা। লপ্তের কাজ থেকে তাকে যে বাদ দেওয়া হল সেটাও এক ষড়যন্ত্র কি না কে জানে!—রাজি হও সাধু। রাজি হলেই হয়ে যাবে।

রাজি হইটা কি করে! টেপি আপনার বাড়ি পড়ে থাকলে, আমার চলে কি করে। জিগাই টেপিরে, কি কয় শুনি!

কয়ে দেখ। রাজি কি না।

একদিন গিয়ে সাধুচরণ বলেও এসেছিল, রাজি না। তিন বাড়ির কাজ করে আপনার বাড়ি এক ফাঁকে কাজ সামলে সুমলে দিতে পারবে বলেছে! তার বেশি পারবে না। দিনভর এক ভাতারি, কম্ম লয় তার।

কেশবের সঙ্গে টেপির লীলার কথা মনে কর কেউ জানে না! এসব হবে না। সমাজে বাস করতে হলে, এসব চলবে না এখানে। টেপিরে কয়ে দিও। পঞ্চায়েতে নালিশ এয়েছে। পরান কর্তা বলতে এসে রুখে উঠেছিল।

নালিশ! কে করল নালিশ! সাধুরও মাথা কম গরম না তখন।

তা বলব কেন সাধু। জেনে রাখ আর চেপে চুপে রাখা যাবে না।

বলেন না, কে নালিশ দিল! কার গতরে জ্বালা ধরাল টেপি।

কিন্তু পরান কর্তা বলতে সাহস পায় নি।

যার নামই বলুক তার যে রক্ষা থাকবে না, পরান সেটা ভালই বোঝে। কেশব তার বাড়িতে গিয়েই হামলা শুরু করে দিতে পারে। কোন শুয়োরের বাচ্চার কাজ টেপি কি করে না করে—তোর এত মাথা ব্যথা কেন। খেতে দিস, পরতে দিস টেপিরে কলঙ্কে জড়ালে, কার পাছায় কত গু আছে টেনে বের করব। কেশব সব জানে। বোঝে, বলে না। যখন বলে, দরজা ধরে টান মারে।

সেই সাধুচরণ এখন জনাইর আশায় আছে—ফিরে এসে কি খবর দেয়। এসেই টেপিকে কেশব কর্তা ঘরে দেখতে পায়নি, টেপিকে যে পরান টোপ দিয়েছে ত শুনে গুম মেরে গেছিল। পরানের সঙ্গে একটা জায়গায় কেশব কর্তার বড় খামতি কেশবের পয়সা, বানের জলের মত। কেশব দাঙ্গাবাজ মানুষ, কিছু রাখতে শেখেনি। টাকা হাতে এলেই ফুর্তি ফার্তা করে দু-দিনের মধ্যে উড়িয়ে দেওয়া চাই। আর রাখবেটা কোথায়! বাড়ি ঢুকতে পারে না। জননী মুখ দর্শন করবে না। দাঙ্গাবাজ, খুন রাহাজানির আসামী হলে যা হয়। দাদারা কেশব গেলেই মুখ ভার করে থাকে। দিদিরা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যায়। দিনকে দিন বড় একা হয়ে যাচ্ছেন কর্তা। এখানটাতেই কর্তার জন্য সাধুচরণের টান ধরে যায়।

আর পরান অন্য মানুষ। কেবল রাখতে শিখেছে। সেই কবে থেকে। লক্ষ্মীকে হেলা ফেলা করতে নাই সে জানে। বিশ বাইশ বছর আগে মিলের বদলি তাঁতি এখন পঞ্চায়েত প্রধান। পার্টি করলে কত সুবিধা। মিলে একবার তেনার শুধু মুখখান দেখিয়ে এলেই চলে। প্রভাবশালী মানুষকে কে না ভয় পায়। মিলের চাবিকাঠি এখন তার হাতে। ইচ্ছে করলেই দরজা বন্ধ করে দিতে পারে, খুলে দিতে পারে। চতুর মানুষ। রাস্তাঘাট মেরামত থেকে খাল ডোবা খনন, শ্যালো বসানোতে কত টাকা! সাধুচরণের মতো কত হা-অন্ন মানুষ আছে —যারা টিপ ছাপে পরান কর্তার তফিল ভরে দিয়ে আসতে রাজি।

দে ছাপ দে। এইখানে। ভালো করে দে। ধর চার টাকা। চারটাকাই দাম দিলাম। কথা বাড়াস না।

কথা বাড়ানো যায় না। বাড়ালে মরণ। মাস্টার রোলে আর পরদিন নাম পাওয়া যাবে না। সারাদিন কোদাল কুপিয়ে চার চারটা টাকা এক কেজি গম তাও হাতছাড়া। নালিশ দেবার লোক নাই। পার্টি ফাণ্ড আছে। কে সামলায়। পরান কর্তার এক কথা।

সাধুচরণ বোঝে সংসারে চতুর লোকেরাই এখন পার্টি করে। একখান ছত্র হল গে এই পার্টি। ছায়া দেবে, আখের দেবে, পাকা দালান, কোঠা করে দেবে ভটভটিয়া দেবে। পরান কর্তার ভটভটিয়া চড়ে একবার শহরে গিয়েছিল। শাঁ শাঁ করে ঠাণ্ডা হাওয়ায় চুল উড়িয়ে দিচ্ছে।—ভালো করে ধর সাধু। পড়ে যাস না।

আসলে ভালো করে ধরাই হল দুনিয়ার সেরা কাজ। যে যত ধরতে পারে, তার আখের তত খোলতাই। কেশব এখন কোথায় আছে কে জানে। অন্ধকারে সাইকেল নিয়ে চৌধুরি মামার বাড়ি যাবার রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে নেই ত! বড় ডর লাগে। যদি ক্ষেপে গিয়ে টেপির গলা টিপে ধরে—বল মাগি পরানের বাড়িতে তর ময়ফেল কেন! বারে বারে বারণ করেছি না—ও একটা পাষণ্ড আছে, তরে দিয়ে কি কু-কর্ম করাবে তুই জানিস! হেন কাজ নাই পারে না। আমি যে একখান ষণ্ড, তারও চক্ষু লজ্জা আছে। পরানের তাও নাই। থাকলে গরিব গুরবোর পয়সা মেরে পাকা বাড়ি হাঁকাতে পারে। খুনী। আস্ত খুনী। আমি আর কি—ওটা এক ধর্মের ষণ্ড। খাবে মুড়াবে, ল্যাদাবে, তবু সবাই পূজা করবে। তুই তার বাড়ি মারাতে গেলি কেন, বল, বল মাগি। কি সুমধুর কাব্য ঝুলে ওখানটাতে বল!

সাধুচরণ ভাবল তা সুমধুর কাব্যই বটে—দু-খান রাজভোগ। পরানের বাড়িতে না গেলে ও দুটো আনত কি করে। একবার ইচ্ছা হয়েছিল সে নিজেও গিয়ে বাড়ির কোনা খামচায় বসে থাকে। অথবা কলাপাতা কেটে এক কোনায় বসে পড়ে—কিন্তু ল্যাটা হল টেপি, বাপের ইজ্জত সে না বুঝলেও ঠাকুরদার ইজ্জত কত বোঝে। তার ছেলে পাত পেতে বসে আছে দেখলে ক্ষেপে যেতে পারে টেপি। সে ভয়েই সে-দিকটায় মাড়াতে আর সাহস হয় নি। ব্যাপারে বাড়ির শুধু গান মাইকে বাজবে—বড় লোকের বেটিলো, লম্বা লম্বা চুল...

সাধুচরণ একটাই প্রশ্ন করেছিল, চার টাকা কর্তা। অবশ্য কর্তা সামনে থাকে না। তার লোক থাকে। তার সাকরেদ এখন আকছার জুটে যাচ্ছে। মধু কৈবর্তর ছাওয়ালডা তার এখন এক নম্বর সাকরেদ। লম্বা উঁচু দশাসই জোয়ান। মিলের এক নম্বর তাঁতি। তার বাপ পান বিক্রি করত বাজারে। বাপের নসিব দেখে বুঝেছিল, ওতে হবার লয়। পান বেচে খায় কান্ত মুদি, মুদি হতে হয়, অমন একখান মুদি যার কপালে জমিদারি লেখা থাকে। দিন কাল পাল্টে গেছে—কৈবর্তর ছাওয়াল টের করতে পেরেই পরান কর্তার ল্যাংবোট হয়ে গেল। তার পক্ষ হয়ে লড়ছে।

এই লড়ালড়িটা শেষ পর্যন্ত তার নসিব নিয়ে শুরু হবে বুঝতে পারে নি সাধুচরণ। প্রশ্ন করার ছক কোথায় পেলে সাধু! এত করে লোকটা, দিন নাই রাত নাই, চান খাওয়া নাই, ভটভটিয়া নিয়ে ছোটাছুটি—দেখছ না রাস্তাঘাট, কয়লার ঘ্যাঁস ফেলে কি কইরে দিয়েছেন। বর্ষায় আর কাদা ভাঙতে হয় না, পরান দাদা না থাকলে এত সব হত কোথা থেকে। টাকা নিয়ে প্রশ্ন করছ! বেইমান! বেইমান আর কাকে বলে!

সাধু কাচুমাচু গলায় বলেছিল, কথা ছেল ছ টাকা।

কার কথা?

লোকজনে কয়।

লোকজনের কথা ছাড়ান দাও। দিনকাল ভালো না। দেবে কোত্থেকে সরকার। বাড়ন্ত সব। যা পাচ্ছ নিয়ে নাও, পরে তাও জুটবে না।

যে আজ্ঞে। দেন তবে।

দিয়েছিল চারটাকা, এক কেজি গম। লপ্তে লপ্তে পেয়ে আসছিল কাজ। তখনও পরান কর্তার মর্জি ঠিক ছেল—গোল পাকাল তার বড় কন্যে টেপি। টেপি রাজি হচ্ছে না। সারাদিন সেই বা একটা বাড়িতে আটকা

পড়ে থাকে কি করে। কাজ কামের সুখ্যাতি আছে টেপির। উঠতি বয়স। আগুন হয়ে আছে। খাটাখাটনিতে তার দম আটকে যায় না। পরান কর্তার কন্যেরা বড় হয়ে গেছে। গিন্নিমা এক হাতে পেরে ওঠে না। শরীরও দুবলা হয়ে গেছে। নিত্য অসুখ। টেপির মতো যদি একখান পুষ্ট গাভী থাকে তবে বাড়ির শোভা বাড়ে। কিন্তু কন্যে রাজি না হলে করেটা কি! আজ বাড়িতে ভোজ আছে বলে, লোভে পড়ে গেছে। ভোজ ত রোজ থাকে না। কর্তার যে টেপিকে রোজ দরকার। কন্যা মাথা পাতছে না। লিষ্টিতে নাম না দেখে ফিরে এয়ে বুঝেছে—গোলযোগটা কোথায়! এদিকে কন্যের পীরিতের মানুষ কেশব কর্তাও হাজির। তার হয়েছে মরণ। খিদে তিষ্টা পর্যন্ত সে ভুলে গেছে।— ও জনাইরে বাপ তোর কি ফিরতে ইচ্ছে হয় না। খাণ্ডব দাহনের আর কত বাকি বলে যা! কেশব কর্তা টেপির খোঁজে বাইর হইছে।

সহসা মনে হল কেশবের, অন্ধকারে তাকে কেউ অনুসরণ করছে। সে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। সতর্ক থাকতে হয়। নিশাচর সে। অনেক দূর থেকেও টের পায় কোনো শ্বাপদ এগিয়ে আসছে কিনা তার দিকে। তার চোখ নীল না লাল। তার জিভ লক লক করছে কি না। সে গন্ধ শুঁকে সব টের পায়। ঘাড়ের উপর কেউ যেন মারাত্মক কিছু সব সময় তুলে ধরে আছে। পুলিশ দারোগার ভয় তার নেই। যদিও মাঝে মাঝে আত্মগোপন করতে হয়, সেটা ঝড়ের মুখে পড়ে না যাওয়ার জন্য। দ্বারকা দাসের আড়তের মামলাটায় তাকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা পরানের কাজ। পরান চক্রবর্তী বুঝে ফেলেছে, কেশবকে এখন সরিয়ে দেওয়া দরকার। কারণ এই একটা কাঁটা ঝুলে আছে। এমন কি যা লোক, তাকে পেটি মেরে উড়িয়েও দিতে পারে।

তার শত্রুপক্ষ প্রবল। কেশব অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখল। সামনে সেই বাড়িটা। চৌধুরী মামার বাড়ি। এখানে এসে থাকত নবীন বলে একটা লোক। তার বৌ মেয়েরা আছে এখনও। নবীন নেই। আসানসোল থেকে পার্টি এসে খবর দিয়েছিল, লোকটা খোচর। লোকটার অপকীর্তির কথা বলেছিল। লোকটার জন্য দলের তিন তিনজন ঘাটের মুখে থুবড়ে পড়ল। কেশবের কাছে এসেছিল, বিহিত করতে। সে বলেছিল, আমি সব ছেড়ে দিয়েছি। আমাকে দিয়ে হবে না।

হবে না বললেই কে শোনে! তার উপর চাপ বাড়ছিল।

সে সোজা কথা বলে দিয়েছিল, হবে না। হবে না এইজন্য যে সে এই জায়গাটায় মাঝে মাঝে এসে আত্মগোপন করে থাকে। টেপি নামে একটা মেয়ে তখন তার ভাত জল দেয়। এমন একটা আশ্রয় সে ভাঙতে চায় না।

তবু লোকটা খুন হল। সে না করলেও যাদের করার কথা তারা করে গেল। এই মামলাতেও তাকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা লোকের উপর এত মামলা থাকলে সে যায় কোথায়! পনের বিশটা মামলা ঝুলে আছে। সেদিন সে ধোলাই খেয়েছে খাগড়ার ঘাটে। খুনই করে ফেলত, চেনা লোক বের হয়ে পড়ায় গাড়িতে তুলে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে। হাসপাতালেও সে বেঁচে উঠত না। টেপির রাত দিন সেবা শুশ্রূষা তাকে ফের নিরাময় করে তুলেছে। সেই থেকে টেপির প্রতি তার কেমন একটা অধিকার জন্মে গেছে যেন। এতটা পথ শহর থেকে সাইকেল মেরে এসে বাড়িতে না দেখলে মাথা গরম হয়ে যায়।

টেপির জন্য সে ঘোরাঘুরি করে ঠিক, কিন্তু টেপি যা পছন্দ করে সে তার বাইরে পারতপক্ষে যেতে চায় না। এক নম্বর টেপিকে সে সিনেমা দেখার জন্য পয়সা দেয়। সপ্তাহে একদিন টেপি সিনেমায় যাবেই। এটা সে করত না। তারকের মার শোষণপ্রণালী তাকে টেপির জন্য সিনেমার পয়সা বরাদ্দ করতে বাধ্য করেছে। এক কড়াই সেদ্দ কাপড় ধুয়ে দেবার বিনিময়ে টেপিকে তারকের মা সিনেমায় নিয়ে যাবে এমন কড়ারের কথা শুনতেই সে বলেছিল, দেখো বৌদি, মেয়েটা বোকা আছে। এতগুলান কাপড় নিয়ে সে যাবে মাঠের পুকুরে। ধোবে, শুকাবে। খেতে দেবে না।

তারকের মা বলেছিল, ঠাকুরপো তুমিও যেমন। দানধ্যান করে বেড়াও—তোমার কি! দাদাত তোমার মাস তোলা পাঠায়, চলে কি করে। তোমার দাদা কি মানুষ না অপদেবতা। তার বৌ হয়ে এর চেয়ে বেশি দিই কি

করে। আর ওতেই রাজি হয়ে যাবে। সিনেমার নেশা, নেশা যার আছে সে বোঝে।

এতো একটা সকাল লেগে যাবে সব কাপড় কাচতে।

তখনও টেপির সঙ্গে তার তেমন জানাজানি হয় নি। গোয়ালজানের সেনবাবুকে খুন করার দায়ে তার উপর শমন ঝুলছে। তার সব ডেরার খবর পুলিশের জানা হয়ে গেছিল। কাজেই নতুন ডেরার খোঁজে তারকের মার কাছে এসে ওঠা। স্বাধীন রমণী। এক ছেলে দুই মেয়ে নিয়ে থাকে। জাঠতুতো দাদার স্ত্রী। দাদা কনট্রাকটারের কাছে কাজ করে। বাইরে বাইরে থাকে। জেঠিমাকে তিষ্ঠোতে দেয় নি। ঘরছাড়া করেছে। জেঠি থাকে ছোট কাকার বাড়ি। দাদাকে সেখানে আলাদা মাসোহারা পাঠাতে হয়। আর এমন একখান চোপা তারকের মার যে, কেউ শাসন করতে সাহসই পায় না। সে এখানে এসে উঠেছিল এসব বুঝে শুনেই। জলের মতো টাকা খরচ করে, মাংস, পলান্ন একেবারে পাখা গজিয়ে গেলে যা হয়। তারকের মা খরচের বহর দেখে, মজে গিয়েছিল। তখন টেপির স্তন বেশ বড় হয়ে উঠছে। সে এসে তারকের মার কাজে সাহায্য করতে লেগে গেল। চোখাচোখি হয়। ধার আছে চোখে। সেই মামলা থেকে আর এক মামলা, আর সেই থেকে ফাঁক পেলেই নতুন ডেরায় এসে ওঠা। তারকের মা তাকে একখান ঘর ছেড়ে দেয়। তার সাঙ্গপাঙ্গরা দু-একবার ঘুরে গেছে। কিন্তু টেপিকে যেদিন থেকে সিনেমার জন্য পয়সা দিতে শুরু করল, সেদিন থেকেই একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে গেল ভোগের।

প্রথম দিনের কথাবার্তা এমন, এই তোর নাম কি?

যান ঠাকুর! বলেই মুখ ঝামটা দিয়ে টেপি সরে গেছিল।

বা সুন্দর পাছা। ফ্রক গায়। চোখে কাজল লতা। কপালে টিপ। সবই গাছপালা শস্য ক্ষেতের মতো সবুজ হয়ে আছে। সে ডেকে বলেছিল এই শোন না। তুই কার মেয়ে?

বাবার নাম সাধুচরণ মণ্ডল।

কোথায় থাকিস?

টিকটিকি পাড়া।

তোর বাবা কি করে?

মুনিষ খাটে। আপনাগ দেশের লোক আমরা।

এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারবি।

হুঁ পারব।

খুব ঠাণ্ডা চাই। কল থেকে নিয়ে আয়।

তারকের মার কল নাই। কল আছে ধন জেঠির বাড়িতে। ছোট কাকার বাড়িতে। তারকের মার সঙ্গে দুটো বাড়ির ঝগড়া। ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে হলে দীনবন্ধুর বাড়ির পাশের কলটায় যেতে হবে। টেপি দৌড়ে গিয়েছিল, জল এনে দিয়ে আবার ঘরের ও-পাশে চলে গিয়ে তারকের মাকে বলেছিল, আমি যাই বৌদি।

চা হচ্ছে। এক কাপ খাবি না।

চায়ের নাম শুনে যেতে পারে না। তারকের মা এই ফাঁকে কিছু কাজ করিয়েও রাখল।—যা ত এক কলসি জল নিয়ে আয়। টেপি জল আনতে গেল।—যা ত গরুটা মাঠে আছে। নিয়ে আয়।

টেপি গরু নিয়ে এল। জল দেখাল। বলেছিল, বৌদি ঘরে তুলে দেব। না গাছে বেঁধে রাখব।

বাইরে বেঁধে রাখ। তারক এসে তুলবে।

এক কাপ চায়ের বিনিময়ে টেপি কত কাজই না দ্রুত সেরে ফেলল। ঘর ঝাঁট দিল। আলনা গুছিয়ে দিল। টেপির হাতটান নেই। তবে খাদ্যবস্তু সামনে থাকলে নাকি রাখা যায় না। টেপির সম্পর্কে এই ধরনের একটা বড় কলঙ্কের কথা প্রথম সেদিন কেশব শুনতে পায়। তা লোভে পড়ে যেতে পারে খাদ্যবস্তুর। কারণ যে এক কাপ চা খাবে বলে এত কাজ করে দিতে পারে, সে ফাঁক পেলে খাদ্যবস্তু হাপিজ করবে বেশি কি। দু নম্বর এই চা খাওয়ার জন্য কেশব একটা টাকা বরাদ্দ করে ফেলল।

গরিব মানুষের যা হয়, কাঙালপনা খুব। কেশব জানে সে দেখতে ভারি সুপুরুষ। গায়ের রঙ ঈষৎ হরিদ্রাভ। এই হরিদ্রাভ কথাটা সে তার ঠিকুজি থেকে পেয়েছে। সেখানে জাতকের বর্ণনায় এসব কথা লেখা আছে। চুল ঘন। দশাসই লম্বা চেহারা। মুখে সব সময় তার এক ধরনের ক্রোধ ঝুলে থাকে। ফলে তাকে নাকি খুব রাগী দেখায়। এটা সেও বোঝে। সংসারে কোথাও টান বোধ করে না। বাড়ি সে ঢুকতে পায় না। কারণ দাদারা তার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। সে তো নিজের জন্য কিছু করেনি। একটাই খুন তাকে করতে হয়েছে।

কেউ যেন হাত তুলে ডাকে তখন...কে...শ...ব।

দাদারে।

দাদারে বলে ডাকলে সে কেমন এখনও ছেলে-মানুষ হয়ে যায়।

সেজদা আর সে পিঠপিঠি। বাবার মুদির দোকান খাগড়ার বাজারে। চার পাঁচজন লোক রেখে কাজ। সকাল হলেই মা তাকে বিছানা থেকে তুলে দিত। সে যেত সেজদার সঙ্গে বাবার দোকানে। নতুন বাজার পার হয়ে যেত। মহাকালী পাঠশালা পার হয়ে যেত। দোকানে গেলে বাবা বাজারের টাকা দিতেন। দু-ভাই বাজার করে ফিরত। লিচুর দিনে লিচু, আমের দিনে আম আসত ব্যাগ ভর্তি। দুপুরে গঙ্গায় সাঁতার কাটতে যেত। ভরা বর্ষায় গঙ্গা পার হয়ে যেত। চারপাশে মানুষজন, সবই কত প্রিয় ছিল তার। কতদিন শহর থেকে রিক্স করে বাবার সঙ্গে জ্যাঠাদের দেখতে এয়েছে। গাছে গাছে নানারকম ফল ধরে থাকে। এটা নেয়, ওটা পেড়ে নেয়—চঞ্চল প্রকৃতির সে। কেউ কখনও কিছু দেবে না বলে নি। চারপাশে যখন যেভাবে হাত বাড়িয়েছে পেয়ে গেছে। বড় টান ছিল বংশের প্রতি। জ্যেঠা-জেঠিমাদের প্রতি। সে আরও বড় হয়ে স্কুল পালাতে শিখল। তার পড়াশোনা একদম ভালো লাগত না। মা তাকে পড়াতে বসার জন্য দোতলায় সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে রাখত। কিন্তু বাইরে যে তাকে কে টানে! দিদিরা মনোযোগ দিয়ে পড়ছে, বড়দা কলেজে যায়—তাকে নিয়ে মার ভারি ভাবনা—কি যে হবে! কেশব এসব ভাবতে ভাবতে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাসল। এখন সেই মা তাকে দেখেও যেন দেখে না। কতবার যে সে মাকে দেখবে বলে, নতুন বাজারের দিকে সাইকেল চালিয়ে যায়—মা যদি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকে—এত কাছে থেকেও সে কতকাল যেন তার মাকে দেখে না। বড় দূরের হয়ে গেছে সে।

ওর বুক বেয়ে দীর্ঘশ্বাস ওঠে।

তারকপুরের মাঠ পার হয়ে রাস্তাটা এখানে বাঁক খেয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে সব পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু এই অঞ্চলে ঘর বাড়ি বানিয়েছে। এই পথ ধরেই টেপি ফিরবে। এখান থেকে পরান চক্রবর্তীর বাড়ির সব দেখা যায়। টুনি আলো জ্বলছে, গাছে, দেওয়ালে দরজায়। যেন একখান ইন্দ্রপুরী। টেপিকে রাস্তায় ধরবে বলে অপেক্ষা করছে। সে একটা তালগাছের পাশে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। সাইকেলখানা জঙ্গলের মধ্যে ঢোকানো। যেই যাক রাস্তা ধরে তাকে দেখতে পাবে না। টেপি পরানের বাড়িতে সারাদিন ধরে কি করছে! কেমন সংশয় তার! এই সংশয় থেকেই সে যত কুকর্ম করে ফেলে।

আর এ সময়েই মনে হল, আবার কেউ তাকে দূর থেকে দেখছে। সে তখন চুপচাপ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ঝোপ থেকে যেন উঠে গলা বাড়িয়ে কেউ তাকে দেখে আবার ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তার মুখটা এমনিতেই গম্ভীর হয়ে আছে। ভেতরটা জ্বলছে, তার উপর কেউ যদি অনুসরণ করে তবে ভয়ের। ভাগ নিয়ে তার সঙ্গে এখন আর কারো বিবাদ নেই। কোনো বচসা হয় নি। বলতে গেলে সে লাইন ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু মুশকিল, সে ছেড়ে দিলেই লোকে তাকে ছাড়বে কেন! কেউ তাকে বিশ্বাস করে কোনো কাজ দেয় না। যার যত ঠ্যালা তাকে সামলাতে হয়। কাজ উদ্ধার হলে যৎকিঞ্চিৎ তার ইনাম। তার মাস্তানি স্বভাবটার জন্যই যেন তার এখন যত জ্বালা। একবার কেউ কাতর গলায় এসে বললে, না-ও করতে পারে না। জমির সীমানা নিয়ে গণ্ডগোল, চাঁদা আদায় নিয়ে গণ্ডগোল—সর্বত্র তার ডাক পড়ে। সেও অবাক হয়েছে, গেলেই সব কিছু জলের মতো সোজা সরল হয়ে যায়। তার কথাবার্তা নাকি খুব ট্যারা। সে নাকি

কখনও সহজ ভাবে কথা বলতে পারে না। চোখ ভাটার মতো ঘোরে এবং রক্তবর্ণ। পরান চক্রবর্তী মারদাঙ্গায় তাকে দু-বার কাজে লাগিয়েছে। সে পরানের কাজটাজ উদ্ধার করে দেয়। খয়রতির টাকার হিসাব ঠিক রাখতে পারেনি। সরকারি লোক এসে ধরে ফেলেছে। পরানের দরকার পড়েছিল তাকে। হুমকি দিয়ে সে সই আদায় করে দিয়েছিল। পরান তাকে খাল কাটার ছোট একটা কন্ট্রাকটের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সে ওখানে কারো পয়সা মারে নি। তার হিসেবের লাভের চেয়ে এক পয়সাও বাড়তি টাকা সে নেয় নি। কারণ তার মনে হয়েছে, সৎভাবে কাজ করলে সে আরও কাজ পাবে। কিন্তু পায় নি। পরান তাকে ঘোরাচ্ছে।

সহসা পাশের ঝোপ জঙ্গল নড়ে উঠল সে চিৎকার করে উঠল, কে কে? কে ওখানটায়। ট্যাঁক থেকে সাঁ করে কিছু একটা বের করে চেপে ধরল!

জনাই বলল, আমি জনাই কেশবদাদা। ভয় লাগছিল, আপনি না আর কেউ!

টেপির ছোটভাই জনাইটাও যে এখানে জঙ্গলে দেখছি ওঁৎ পেতে আছে।

তুই কী করতে?

বাপ বুলল, আপনি কোনদিকে গেছেন দেখতে।

টেপি ফিরেছে।

হ্যাঁ।

যা। কখন ফিরল, আমি তো দাঁড়িয়ে আছি সেই কখন থেকে।

জনাই ভাবল, মিছে কথা হয়ে যেতে পারে। কেশব দাদার চণ্ড রাগ মাথায় উঠে গেলে, মতিস্থির রাখতে পারে না। সে বলল, ফিরে যাবার কথা। আমাকে একটা মিষ্টি দেছিল, নিয়ে গেছি। আবার এনে দেবে বলে বসে আছি। কিন্তু, আসছে না।

কেশব বলল, আমি জানি ফিরে যায় নি। তুই যা তো। একবার খবর দিয়ে আয় তোর দিদিকে, আমি দাঁড়িয়ে আছি। শিগগির আসতে বল।

জনাইর এখন আর ভয়ডর নেই। একটা লোককে অন্ধকারে খুঁজে বেড়াতে গেলে একেবারে দৌড়ে তার কাছে যাওয়া যায় না। দেখতে হয় সেই লোকটা না অন্য কেউ। রাতে কত রকমের জিন-পরী হেঁটে বেড়ায়। ঝোপ জঙ্গলে উঁকি দিয়ে থাকে। সে অনেকক্ষণ থেকে একটি ছায়ার মতো কিছু দেখেও সহসা কাছে যেতে সাহস পায় নি। কে কে বলে চিৎকার না করলে সে বুঝতেই পারত না কেশবদাদা দিদির জন্য অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। সে ভেবেছিল ঝুমিদের বাড়ি গেছে—সেখানে সে খোঁজ করতে গিয়ে ধমক খেয়ে ফিরেছে। ঝুমির মা বলেছে, আমাদের বাড়ি আসবে কেন। আসে নি। জনাইও বোঝে কেশবদাদা যার বাড়িতে যায় তারই দুর্নাম ছড়ায়। কেউই চায় না কেশবদাদা কারো বাড়িতে ঢুকুক। তার খোঁজে কারো বাড়ি গেলে রাগ করতেই পারে। তারপর সে দিদির আশায় জঙ্গলে ওঁৎ পেতে বসে থেকেছে। কখন দিদি আবার অন্ধকারে ঢুকে ফিস ফিস গলায় ডাকবে—ও জনাই, জনাইরে! এই নে। পালা।

সে বলল, দেখে আসব বলছেন!

তাই তো বললাম।

সে দৌড় লাগাল।

রাস্তাটা সামনে টাল খেয়ে নিচে নেমে গেছে। তারপর পরান চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে বেলগাছটার কাছে গিয়ে রাস্তাটা উঁচু হয়েছে। জনাই কিছুটা যেতেই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেশব সাইকেলটা বের করে হাঁটা দিল। জনাই ফেরার সময় এ রাস্তাতেই ফিরবে। কিছুটা এগিয়ে থাকার জন্য যেন হাঁটা। কখন থেকে পরান চক্রবর্তীর বাড়িতে উঠে গেছে টেপি কে জানে। ভালো খাবারের লোভ থাকলে মেয়েটার বড় সেখানে ঘুর ঘুর করার স্বভাব। এই লোভে ফেলে কত লোক যে টেপিকে কত রকমের কাজ করিয়ে নেয়। খাটতেও পারে দস্যির মতো। মা মাসি ডেকে সবাইকে সহজে আপনও করে নিতে পারে। টেপির অনেক সদগুণ শুধু খাবারের লোভে নষ্ট হয়ে যায়। পেট ভরে খেতে পেলে, ওর এতটা বোধহয় লোভ থাকত না। টেপির জন্য

সে কেমন বড় আবেগ বোধ করে। এটাও তার নেই। তার সেজদা খুন হওয়ার পর এসব বোধ একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছিল। টেপির সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের পর আবার তার কেন জানি ভালোভাবে বাঁচার একটি স্পৃহা ধীরে ধীরে ভেতরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

আর তখনই দেখল, অন্ধকারে জনাই ছুটে আসছে। হাঁপাচ্ছে। প্যান্টটা হড় হড় করে কোমর থেকে নেমে যাচ্ছিল, সেটা এক হাতে ধরে চিৎকার করে উঠল, দিদিরে আটকে রেখেছে পরান কর্তা।

মাথা গরম মানুষের যা হয়, কেশব দু-লাফে এগিয়ে যাবার আগে বলল, আটকে রেখেছে কেন।

জানি না। বলছে মিষ্টির হাঁড়ি চুরি করেছে দিদি। না দিলে আসতে দেবে না। শাসাচ্ছে, বল কোথায় রাখলি। পুলিশে খবর দেবে বলছে।

শালা। মুখ থেকে তার এমন কুবাক্য বের হতেই সে বুঝল, মাথা তার ঠিক নেই। সাইকেলটা জনাইকে দিয়ে বলল, ধর। দেখছি শুয়োরের বাচ্চা, হারামি কি করে আটকে রাখে।

তখনই মাইকে সেই গানটা ঘুরে ফিরে বাজছে—বড় লোকের বিটিলো, লম্বা লম্বা চুল, অ্যামনে মাথায় বিনধে দেব লাল গেঁদা ফুল।

কেশব বেল গাছটার নিচে গিয়ে এক-বার দম নিল। তারপর ব্যাপারে বাড়িতে ঢুকে হাঁকড়াল, পরানদা আছ!

কে!

আমি শালা যম আছি। তোর দাদাকে ডাক।

পরান জানালা দিয়ে দেখল মূর্তিমান শয়তানের মতো হ্যাজাকের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে কেশব।

সে গলা খাঁকারি দিয়ে বের হয়ে এল। চারপাশে সাঙ্গপাঙ্গরা। বলল, আয় ভাই। তুই! এখানে! তোর কথা সকালে মনে হয়েছে। তোকে বলতে পারি নি। কোথায় থাকিস! ছেলের অন্নপ্রাশন। দুটো খেয়ে যাবি।

মুখ গোমড়া। থাম, শালা শুয়োরের বাচ্চা বললেও লোকটার মাথা গরম হয় না। সে বলল, টেপিকে আটকে রেখেছ কেন। ও কী করেছে?

আর বলিস না ভাই। ভাঁড়ার থেকে সব চুরি। মিষ্টির হাঁড়ি নেই। সব হাতের কাজ। তোরা নিজের লোক হয়ে যদি এমন করিস!

ছেড়ে দাও। ও নিয়েছে কি করে জানলে?

কে নিতে আসবে বল? গোনাগুনতি সব। এত রাতে পাব কোথায়?

আগে ছেড়ে দাও বলছি।

না ছাড়লে কি করবি? পরান দেখল তার সাঙ্গপাঙ্গরা ঠিকই আছে।

কেশব বলল, কেন মিছিমিছি হুজ্জোতি করছ দাদা। ছেড়ে দাও। লাইন ছেড়ে দিয়েছি। নয়ত, বলে সে দাঁড়াল না। কোনদিকে আছে খুঁজতে বাড়ির ভেতর ঢুকতে চাইলে—ওর কলার চেপে ধরল কেউ।

কেশব মাছি তাড়াবার মতো হাত ছাড়িয়ে দিতে গেল। বুঝল, তাকে বেশ শক্ত করে ধরে রেখেছে। ছাড়াতে পারছে না। সে চিৎকার করে উঠল, কি হচ্ছে এটা।

পরানও চায় না, ব্যাপারে বাড়িতে মারদাঙ্গা হোক। সে বলল, এই ছেড়ে দে। শোন ভাই, তুই দুটো খেয়ে যাবি।

কেশব শুধু বলল, কোথায় টেপি!

ছেড়ে দিচ্ছি। তবে এটা তোর ভালো কাজ হচ্ছে না।

শুয়োরের বাচ্চা, ভালোমন্দ তুই বুঝিস! যা বলছি কর। আসলে কেশব জানে এটাই তার শেষ অস্ত্র। দাবড়ানির কাছে সবাই জুজু।

কিন্তু এটা কি হচ্ছে! পেছন থেকে কিছু লোক তাকে জাপ্টে ধরছে কেন! তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে কেন। সে চারপাশ তাকিয়ে দু-হাত তুলে সহসা ক্ষেপা মোষের মতো তেড়ে গেল। আর কখন সে নিজেও

জানে না, শক্ত মতো জিনিসটা কার পেটে সে ঢুকিয়ে ছুটছে। শেষবারের মতো সে তাকাল—হল্লা চিৎকার, মানুষজন সব ছুটে আসছে পেছনে। অন্ধকারে সেই সাইকেলটা নিয়ে জনাই দাঁড়িয়ে। শুধু বলল, পালাচ্ছি। তোর দিদিকে বলিস বেঁচে থাকতে। আমি আবার ঠিক আসব।

সেই ফাঁকে টেপিও পালিয়েছে। অন্ধকার জঙ্গল থেকে হাঁড়িটা নিতে ভোলে নি। যখন পরান চক্রবর্তীকে নিয়ে সাঙ্গপাঙ্গরা হাসপাতাল যাচ্ছে, তখন টেপি, সাধুচরণ, জনাই, তার মা, জঙ্গলে বসে অন্ধকারে গবাগব রসগোল্লা সাঁটাচ্ছিল। মুখের মধ্যে একটার পর একটা—বিষম খেল সাধুচরণ—টেপি বাপের মাথায় ফুঁ দিয়ে বলল, রাক্ষসের মতো খাচ্ছিস। বিষম লেগে মরবি যে বাপ।

সেই বিষম খাবার মুখেও সাধুচরণের চৈতন্য ঠিক আছে—জলদি সাবাড় কর। হাড়িটা খালের জলে ফেলে দে। চুরি চামারির কোনো চিহ্ন রাখতে নেই। বাবুজনেরা কায়দাটা ভালো জানে।

বৌ বলল, মরণ! হাঁড়িটা কত কাজে আসবে!

সাধু হাত চাটছিল। জনাই হাত ঢুকিয়ে রস তুলে নুয়ে খাচ্ছে। টেপির সারাদিন খাটাখাটনি গেছে। কাজের বাড়ির জল, বাটনা, সকাল থেকে সন্ধে কোমর ধরে আছে। সেও শেষবেলায় খেয়ে পেল্লায় উদগার তুলল একটা। সারাদিন ভুখা থাকার পর এই আহার পরম তৃপ্তির। মাথা ঠাণ্ডা। ফিস ফিস গলায় জঙ্গলের মধ্যে কথাবার্তা, পরান কর্তা শেষ।

জনাই ছেলেমানুষ। তার পাপবোধ প্রখর। সে শুধু বলল, বাপ পাপ হবে না?

সাধুচরণ কেমন স্থবির গলায় বলল, ভুখা মানুষের কোনো পাপ নাই হে ভগবান।

আততায়ী

আজও টাকাটা নিয়ে ফেরত আসতে হল। এক টাকার একটা নোট তার মাথার মধ্যে এভাবে আগুন ধরিয়ে দেবে দু-দিন আগেও টের পায় নি। যেন নোটটা যতক্ষণ মানিব্যাগে থাকবে ততক্ষণই তাকে বিচলিত করবে। উত্তপ্ত রাখবে এবং অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাতে হবে। সামান্য একটা এক টাকার নোট এভাবে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেবে সে ভাবতেই পারে নি। আজকাল এক টাকার দামই বা কী! কিচ্ছু না। কিন্তু টাকার নোটটা যেন তার সঙ্গে বাজি লড়ছে। নোটটা এবং সে।

আসলে জীবনে একজন সব সময় প্রতিপক্ষ এসে তার সামনে দাঁড়ায়। প্রতিপক্ষটি প্রথমে খাটো থাকে—ক্রমে সে হাত পা বিস্তার করতে থাকে এবং একদিন এই প্রতিপক্ষই জীবনে চরম শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। দু-দিন ধরে এই নোটটা তার প্রতিপক্ষ, এটাকে বাজারে চালাতেই হবে।

সকালে বাজার করতে গিয়ে হাফ পাউণ্ড পাঁউরুটি কেনার সময় ব্যাগ থেকে খুঁজে নোটটা বের করে দিয়েছিল। আর তক্ষুণি দোকানির কাতর গলা, না স্যার চলবে না। কিছু নেই।

নেই মানে!

মাঝখানটা একেবারে সাদা। ন্যাতা হয়ে গেছে। কে দিল?

কে দেবে। বাসের কনডাক্টর। এক টাকার নোট পাওয়াই যায় না! নেবে না কেন? এক টাকার নোট অচল হয় না। আমি তো ঘরে বসে ছাপিনি! নেবে না কেন?

না বাবু, বদলে দিন।

দেব না। নিতে হবে। এক টাকার নোট অচল হয় না।

আপনি পাঁউরুটি ফেরত দিন। অচল কি না জানি না। আমি নিতে পারব না।

মাথা তার গরম হয়ে যাচ্ছিল। সেও দোকানির মতোই বলেছিল, ভাই কনডাক্টর নোটটা পাল্টে দাও। ছেঁড়া।

কিছু নেই।

কী হাসি!

কী বলছেন দাদা, কিছু নেই! না থাকলেও চলে। ছাপ থাকলেই চলে। বাজারে এক টাকার নোট পাওয়াই যায় না, আপনার লাক ভাল।

লাক ভাল বলছ!

হ্যাঁ, তাই বলছি। নিতে হয় নিন, না হয় চেঞ্জ দিন। কোথাকার লোক আপনি, বাসে ট্রামে চড়েন না।

বাসে ট্রামে চড়ি কি না তোমাকে কৈফিয়ত দেব না। চলবে না। পাল্টে দাও। আমার কাছে চেঞ্জ নেই।

ধূস নিতে হয় নিন, না হয় নেমে যান।

এক কথায় দু-কথায় বচসা শুরু হতেই বাসের লোকজন মজা পেয়ে গেছিল। একজন বলল, কী হল দাদা! এক টাকার নোট আজকাল অচল হয় না জানেন। দু পয়সা, পাঁচ পয়সা উঠেই গেল। আপনি দেখছি আজব লোক মশাই।

বাস বাদুড় ঝোলা হয়ে ছুটছে। তার সামনে দুজন যুবতী ফিক ফিক করে হাসছে। তার মনে হয়েছিল, সে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে সামান্য এক টাকার একটা নোট নিয়ে। এত কথা বলা উচিত হয় নি। অনেকে সিট থেকে উঁকি দিয়ে তাকে দেখেছে। এমন বিপাকে যেন সে জীবনেও পড়ে নি। সত্যি তো এক টাকার নোটের বড় ক্রাইসিস। কীই বা দাম! নোটটা নিয়ে আর সে কোনো কথা বলে নি। জানালা দিয়ে

বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। আজকাল মানুষ সামান্য বিষয়ে কত মজা পায়! সে সব বাস-যাত্রীদের মজার খোরাক হয়ে গেল। তাকে নিয়ে দু-একজন বেশ ঠাট্টা রসিকতাও চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ সে বুঝতে পারছে, কনডাক্টরের পক্ষ নিয়েছে সবাই!

তার এ-ভাবে মাথা গরম হবার কারণ বাড়ি গেলে আবার এক ধকল যাবে। ছবি বলবে, কে আবার অচল টাকা গছিয়ে দিল তোমাকে! যেমন মানুষ তুমি—ঘরে দুটো পাঁচ টাকার নোট, একটা দশ টাকার নোট, গোটা তিনেক দু টাকার নোট অচল হয়ে পড়ে আছে। ছবির এক কথা—দেখে নেবে না! তুমি কী! যে যা দেয় নিয়ে নাও! লোক ঠিক চিনেছে।

বাড়ি ফিরে নোটটা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছে। বরং বলা যায়, নোটটা ছবির চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে রেখেছে। দু-দিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যদি চলে যায়। কিন্তু চলে যাচ্ছে না। সে তবে ঠিকই ধরেছিল, চলবে না। নোট অচল।

কিন্তু বাসের সবাই বলেছে, এক টাকার নোট অচল কবে হল আবার! চেনা গেলেই হল—হ্যাঁ এক টাকার নোট। এই তো সরকারের টিপ ছাপ আছে বোঝা যায়। বোঝা গেলেই হল।

এই যে বাবু।

হ্যাঁ, আমাকে ডাকছ?

চলে যাচ্ছে যে।

কী করব! দাঁড়িয়ে থাকব।

নোটটা চলবে না। বদলে দিন।

দুটো মর্তমান কলা কিনে নোটটা দিয়েই হাঁটা দিয়েছিল সে।

আর টাকা নেই। আমি তো বানাই নি।

না থাকে কাল দেবেন। এটা নিয়ে যান।

রেখে দাও। পরে পাল্টে দেব।

না বাবু। কালই দেবেন। নিয়ে যান।

রাখলে দোষের কী। ছোঁয়াচে নাকি।

তা বাবু বলতে পারেন।

সে অগত্যা নোট ফিরিয়ে নিয়েছে। কাছে টাকা থাকতেও দেয় নি। দিলে যেন প্রমাণ হবে ঠগ, জোচ্চোর। অচল টাকা চালিয়ে বেড়াবার স্বভাব।

তারও মাথা গরম হয়ে যায়। যেন পারলে সেই বাস কনডাক্টরের মাথার চুল ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, বেটা তুমি সাধু। আর আমি শালা চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।

ঘরে বাইরে সব জায়গায়।

বাজার থেকে ফিরেই সে গুম হয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। ছেলেরা স্কুলে যাবে। বাস এসে গেছে। ছবি রান্নাঘরে ওদের টিফিন হাতে নিয়ে ছেলে দু-জনকে বাসে তুলে দিতে যাচ্ছে। সে দেখেও দেখল না। মাথার মধ্যে বুড়বুড়ি উঠছে, লোকটাকে ধরতে হবে। টাকাটা নিয়ে সে এত হেনস্থা হবে অনুমানই করতে পারেনি। একটা এক টাকার নোট যেন পকেটে থেকে মজা লুটছে। তোমার মজা বের করছি, দাঁড়াও।

ছবি ফিরে এসে বলল, কী ব্যাপার? এত সকালে কোথায় বের হবে!

কাজ আছে।

কী কাজ বলবে তো। কিছুই রান্না হয় নি।

যা হয়েছে দাও।

সে বেশি কথা বলতে পারছে না। যেন সবাইকে তার চেনা হয়ে গেছে। বাজার করতে গেলে সে ঠকে, বাসে মিনিবাসে সে ঠকে, অফিসে পদোন্নতি নেই, স্বভাব দোষে—সর্বত্র সে অচল। ঘরেও। বাজার করে

দিয়ে রেজকি ফেরত দিলেই ছবির এক কথা, এটা নিলে! চলবে!
আরে এখন সব চলে। রাখ তো, ভ্যাজর ভ্যাজর করবে না।
তার অফিস বিকেল বেলায়। কাগজের অফিসে কাজ করলে যা হয়! এত সকালে বের হবে শুনে ছবি চমকে গেছে। রান্নাঘরে তার মেজাজ চড়া!—এ কী লোকরে বাবা, আগে থেকে কিছু বলবে না। এখন কী দিই!
বলছি না যা হয়েছে তাই দাও।
শুধু ভাত হয়েছে।
ওতেই হবে। ফ্রিজে কিছু নেই!
না।
ডিম ভেজে দাও। একটু মাখন দাও। ওতেই হয়ে যাবে।
কোথায় যাচ্ছ বলবে তো!
বলছি না কাজ আছে।
সেটা কী রাজসূয় যজ্ঞ!
তাই বলতে পার।
কথা বাড়ালে খাণ্ডবদাহন শুরু হয়ে যাবে। সে আর কথা বাড়াল না। চুপচাপ খেয়ে বের হয়ে গেল।
রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই পাশ থেকে একজন চেনা লোক বলল, দাদা এত সকালে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?
একটু কাজ আছে।
কত নম্বর বাস? দুশ এগার?
দরজায় দেখল, না সে লোকটা নেই।
আবার দু'শ এগার।
এটাতেও নেই।
বেলা বাড়ে সেই লোকটাকে সে কিছুতেই সনাক্ত করতে পারে না।
লোকটা কী উধাও হয়ে গেল!
ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে ফিরে এসে সে শুয়ে পড়ল। সেদিন আর অফিস বের হল না। মাথায় পেরেক ফুটিয়ে লোকটি উধাও হয়েছে। শুয়োরের বাচ্চা তুমি কত বড় ঠগ আমি দেখব। চেঞ্জ দিতে পারে দিন, না হলে নেমে যান!
পরদিন সকালে ফের এক কথা।
বের হচ্ছি।
এত সকালে!
কাজ আছে বলছি না।
কী কাজ!
রাজসূয় যজ্ঞ শুরু হয়েছে। বুঝলে!
ছবি বলল, সারা জীবনই তো রাজসূয় যজ্ঞ করলে, এ আবার কী নতুন যজ্ঞি শুরু হল তোমার!
ছবি খোঁটা দিয়ে কথা না বলতে পারলে আরাম পায় না। এতদিনে ছবি বুঝে গেছে, সত্যি অচল মাল নিয়ে তাকে কাজ করতে হচ্ছে। দুনিয়ার লোক মুখিয়ে আছে, লোকটাকে ঠকাবার জন্য। বাজারে, কাজের জায়গায়, বন্ধু-বান্ধব সবাই যেন জেনে ফেলেছে , তার কাছে এলে ফিরে যাবে না। সে ধার দিয়ে ঠকেছে, সে বিশ্বাস করে ঠকেছে, জমি কেনার সময় দালালি বাবদ অনেক টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে, বাড়ি করার সময় ঠিকাদার মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ ভাল রকমের টুপি পরিয়ে দিয়ে গেছে। দরজা সেগুনের দেবার কথা, দিয়েছে গাম্বার কাঠের। একটু বাতাস উঠলেই খড়খড় করে নড়ে ওঠে। কোনো দরজা বৃষ্টি হলে ফুলে ফেঁপে

যায়, লাগাতে গেলে হাতি জুতে টানাটানি নাকি করতে হয়। সব অভিযোগই ছবির। রান্নাঘরের দেয়ালের দুটো টাইলস খসে পড়েছে। তা পড়বে না, যেমন মানুষ! কথায় যে চিঁড়ে ভেজে তাকে দেখে নাকি ছবি সেটা সত্যি টের পেয়েছে।

এবারে আর ভিজতে দেবে না।

কী দাদা দাঁড়িয়ে আছেন! এত সকালে।

দাঁড়িয়ে আছি তো তোর কীরে ব্যাটা! সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকব। আমার খুশি। সে এমন ভাবল।

কী পেলেন?

কাকে?

সেই লোকটাকে!

তুমি জান কী করে?

না যে-ভাবে ক'দিন থেকে রোজ দাঁড়িয়ে থাকছেন!

সে কী পাগল হয়ে যাচ্ছে! তাকে দেখেই কী টের পায়, একজন ঠগ জোচ্চোরকে সে খুঁজতে বের হয়েছে। চোখে মুখে কী তার কোনো আততায়ীর মুখ ভেসে উঠছে।

সে বলল, এমনি দাঁড়িয়ে আছি।

বাস স্টপে এসে এমনি সারা সকাল কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না! মাথায় কোনো গণ্ডগোল সত্যিই কী দেখা দিয়েছে! আমি দাঁড়িয়ে থাকি, খুশি! তোর কীরে শুয়োরের বাচ্চা! অবশ্য সে প্রকাশ করল না। মাথা তেতে আছে। সবার সঙ্গে সে দুর্ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। লোকটাকে সনাক্ত করতে না পারলে সে কী সত্যি পাগল হয়ে যাবে!

আবার দু'শ এগার।

না নেই।

তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

দুটো দরজায় যারা ঘন্টি বাজায় দেখে। তাদের কারো মুখ মেলে না।

এবারে ভাবল না, এ-ভাবে হবে না। সে উঠেই পড়ল। বাস স্ট্যাণ্ডে গিয়ে খোঁজ করল। নেই। সে আবার একটা বাসে উঠে পড়ল। কিছু দূরে গিয়ে নেমে পড়ল। না নেই।

আসলে সে যেন সবার মুখেই সেই একজনের মুখ দেখতে পায়। কে যে আসল ধুরন্ধর তা টের পায় না। ধরতে পারলেই মুখে ঘুঁসি মেরে বলত, নে শুয়োরের বাচ্চা, তোর টাকা রাখ। আমার টাকা ফেরত দে।

একদিন এ-ভাবে সারাদিন এই করে সে যখন বুঝল, আসল আততায়ীকে ধরা যাবে না, যায় না, তখন একটা গাছের নিচে এসে বসে পড়ল। পার্স থেকে নোটটা বের করে দেখল! হাজার অপমানের কথা মনে পড়তে থাকল। টাকাটা আবার দেখল। উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে কী ভাবল কে জানে, সে নোটটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। সঠিক আততায়ীকে খুঁজে বের করা জীবনে কঠিন। বাতাসে নোটের কুচি উড়ে যেতেই সে একেবারে হাল্কা হয়ে গেল! কী আরাম। বাড়ি ফিরে সে আবার অনেকদিন পর ঘুমাল। সকালে উঠে দেখল, গাছপালা পাখি, ঘরবাড়ি মানুষজন সব আবার তার কাছে সুন্দর হয়ে গেছে।

এক লণ্ঠনওয়ালার গল্প

সেদিন আমার সহকর্মী এসেই বললেন, কী আপনার সেই পাখিরা কোথায়?

আমার বাড়িতে তার পাখি দেখতেই আসা। কারণ সহকর্মী এবং বন্ধু মানুষটি প্রায়ই আক্ষেপ করতেন, বোঝলেন, ছেলেবেলা কত রকমের পাখি দেখেছি। আজকাল আর বুঝি তারা নেই। বসন্ত বউড়ি পাখি দেখেছেন? আমাদের বাগানে তারা উড়ে বেড়াত।

পাখি নিয়ে যখন তার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়, তখন আমি সবে এ-অঞ্চলে বাড়ি করছি। ফাঁকা জায়গা। গাছপালা বা জঙ্গল সবই আছে। ফাঁকা মাঠ আছে। পুকুর বাগান সব। বাড়ি করার সময় যে-সব পাখি ছিল, ক'বছর পরে তাদের আর দেখা গেল না। তবু পাশের জঙ্গলে এক জোড়া ডাহুক পাখি থাকত বলে, রাতে তাদের কলরব শুনতে পেতাম। ক'দিন থেকে তাদেরও আর সাড়া পাওয়া যায় না।

বন্ধুটি এলেন ঠিক, তবে তখন পাখিরা আর নেই, বনজঙ্গল নেই, মাঠ নেই, গাছপালা নেই—কেবল ইটের জঙ্গল বাদে এখন আর কিছু চোখে পড়ে না।

পাখি নিয়ে অফিসে কথা উঠলেই, সহকর্মীটির এক কথা, ঠিক চলে যাব একদিন। একরাত থাকব আপনার বাড়িতে।

কথাবার্তা শুনলে মনে হবে—আমি যেন কোনো সুদূর রেল স্টেশন পার হয়ে এক নির্জন জায়গার বাসিন্দা। আমার বাড়ি তার বাড়ি থেকে বাসে ঘণ্টাখানেকও লাগে না। কলকাতা শহর বাড়ছে। আগে দক্ষিণে বাড়ত, এখন সল্টলেক ধরে উত্তরের দিকটাতে বাড়ছে। দশ বার বছরের মধ্যে ফাঁকা ধানের মাঠ সব ঘরবাড়িতে ভরে গেছে। আসব আসব করে তাঁর এতদিন আসা হয়নি। কবি মানুষ হলে যা হয়। শেষে যখন হাজির তখন তাঁকে আমার আর কাক শালিক বাদে কোনো পাখি দেখাবার উপায় নেই। তাঁকে বললাম, ওরা সব চলে গেছে।

কবিবন্ধুটির প্রশ্ন, কোথায় যায় বলেন তো!

আমরা দোতলার বালকনিতে বসেছিলাম। বললাম, কোথায় যায় বলতে পারব না, নিশ্চয়ই যেখানে বনজঙ্গল আছে তারা সেখানেই যায়।

কবিবন্ধুটির আবার প্রশ্ন, বনজঙ্গল কী আর থাকবে। যেভাবে মানুষ বাড়ছে! এভাবেই বন্ধুটির কথা বলার অভ্যাস। একটু ফাঁকা জায়গা বনজঙ্গল পাখি প্রজাপতি দেখলে তার আনন্দ হবারই কথা। শোভাবাজারের দিকে অত্যন্ত এক সরু গলির অন্ধকারের একতলা বাসা থেকে বের হলেই তাঁর বোধহয় পাখি প্রজাপতি দেখার শখ হয়। অবশেষে সেই দেখতেই আসা। আমরা মুখোমুখি বসে। বললাম, এই যে পাশের ডোবাটা দেখছেন, এখানে এই ক'দিন আগেও একজোড়া ডাহুক পাখি দেখেছি। আপনি আগে এলে দেখতে পেতেন। ক'দিন থেকে দেখছি তারাও নেই।

বন্ধুটি বললেন, যখন দেখা হল না, তখন পাখি নিয়েই গল্প হোক। আপনি কী কী পাখি দেখেছেন?

বুঝতে পারছি আমরা আজ বেশ মুডে আছি। ছুটির দিন। রাতে থাকবেন বন্ধুটি। খাবেন। সারা বিকেল, সন্ধ্যে এমনকি গভীর রাত পর্যন্ত চুটিয়ে আড্ডা মারা যাবে। সংসারী মানুষের পক্ষে এগুলো খুব দরকার। হাঁপিয়ে উঠতে হয় না বুঝি। সময় করে তাই কবিবন্ধুটি আজ আমার এখানে চলে এসেছেন। একটাই শর্ত, পাখি ছাড়া আমরা আর অন্য কোনো গল্প করব না।

বন্ধুটি বললেন, আমি লায়ার পাখির নাম শুনেছি। দেখিনি।

আমি একজন পাখিবিশেষজ্ঞ বলে তিনি মনে করেন। আমার লেখাতে তিনি অনেক পাখির নাম জেনেছেন। বোধহয় লায়ার পাখিরও। এককালে জাহাজে কাজ করতাম বলে পৃথিবীটা ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। বললাম, ও পাখি অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যায়। জিলঙে দেখেছি।

তাঁর স্বাভাবিক প্রশ্ন, জিলঙ কোথায়?

বললাম মেলবোর্ণ থেকে শ' দুই মাইল পশ্চিমে। খুবই ছোট বন্দর। ওখান থেকে গম রপ্তানি হয়। আমরা গম নিতেই গেছিলাম। লায়ার পাখি আকারে বেশ বড়। চওড়া পালক। পাখা মেলে দিলে লায়ারের মতো দেখতে লাগে।

—লায়ারটা কী?

—ওটা একটা বিলেতি বাদ্যযন্ত্রের নাম। গায়ের রঙ মেটে। গলার দিকটা লাল। লেজের দিকটা সাপের ফণার মতো। খুব লাজুক পাখি। দেখতে বড় মায়া হয়। ঘাসের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকার স্বভাব।

এভাবে আরও অনেক পাখির কথা উঠল। সদা সোহাগী, শা' বুলবুলি, নীল কটকটিয়া, ভীমরাজ, ওরিওল, রেন, বেনেবৌ, ভাট শালিখ, গাংশালিখ, মুনিয়া, দোয়েল, বুলবুলি, ছাতার পাখি, টিয়া, হাড়িচাঁচা কত আর বলব।

স্ত্রী চা ডালমুট রেখে গেল। দু'জন সোফায় গা এলিয়ে বসে। পাখির কথা উঠতেই আমরা দু'জনেই আমাদের শৈশবকালে চলে গেলাম। দু'জনেরই শৈশব ওপার বাংলায় কেটেছে। জন্মেছি, বড় হয়েছি সেখানে। দেশভাগ না হলে আমাদের দু'জনের দেখা হবারই কথা ছিল না। দেশের নস্টালজিয়ায় পেয়ে বসেছে দু'জনকেই।

বন্ধুটির আফশোষ, বললেন, ইস্টিকুটুম পাখি এখানে এসে দেখেছেন?

বললাম, বাড়িঘর করার সময় এ-অঞ্চলে অনেক পাখি ছিল। ইস্টিকুটুম আমার ছাদের কার্নিশেই একবার উড়ে এসে বসেছিল। ছেলেরা এসে বলল, বাবা দেখ এসে, দুটো সুন্দর পাখি আমাদের ছাদে এসে উড়ে বসেছে। উপরে উঠে দেখলাম। বললাম, এরা হল ইস্টিকুটুম। দেশের বাড়িতে এরা ডাকলেই মা জেঠিমারা বলতেন, কুটুম আসবে। বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে বললাম, জানেন, সত্যি দু একদিনের মধ্যে কুটুম চলে আসত বাড়িতে। একবার তিনুকাকা এলেন, ঠাকুমা বললেন, ইস্টিকুটুম ডেকে গেছে বাড়িতে, তুই আসবি জানতাম।

বন্ধুটির প্রশ্ন, পাখিদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কতটা?

আমি বললাম অনেক। ধরুন, আমার বাড়িটা যদি আরও বড় হত, গাছপালা লাগাতে পারতাম, তবে কিছু পাখি এসে থাকতে চাইত। আমার বাবা জানেন, দেশ থেকে এসে বিঘে পাঁচেকের মতো জমি কিনে কোনোরকমে থাকবার মতো টালির ঘর করলেন। ঠাকুরঘর বানালেন। রান্নাঘর। কাঠা চারেকের মধ্যে সব। বাকি জায়গাটায় কত রকমের যে ফলের গাছ লাগালেন! আবাদ করার জন্য কোনো জমি রাখলেন না। মা গজগজ করত, গাছ তোমাকে খাওয়াবে।

বাবা হাসতেন।

মা আরও রেগে যেত। বলত, জমি চাষ-আবাদ করলে সংসারের অভাব মিটত।

বাবা হয়তো স্নান করে ফিরছেন কালীর পুকুর থেকে—দেখি বাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। একঝাঁক পাখি উড়ে আসছে। বাবা বলতেন, কেন আসছে জানো? ওরা বুঝেছে। এই গাছপালায় তাদের আমি বসার জায়গা করে দিয়েছি। বাসা বানাবার জায়গা করে দিয়েছি। ফল-পাকুড় হবে, তোমরা খাবে, ওরা খাবে না—সে হয়!

চায়ে চুমুক দিয়ে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। বন্ধুটি বললেন, কী ভাবছেন?

—ভাবছি গাছপালা, পাখপাখালি না থাকলে বাড়ির সৌন্দর্য বাড়ে না। কত রকমের পাখি এসে উড়ে বসত। বাবা বলতেন, চেন!

আমরা জানি, বাবা পাখিদের নাম বলবেন। বাবাই আমাকে কোনটা কী পাখি, তার স্বভাব চরিত্র, কোথায় বাসা বানায়, কটা করে কি ডিম পাড়ে সব বলতেন। আমরা ভাইবোনেরা ভারি কৌতূহল নিয়ে শুনতাম। ফল-পাকুড়ের সময় পাখির উপদ্রব বেড়ে যেত। মা গজগজ করত। দ্যাখ গাছে টিয়ার ঝাঁক বসেছে। সব কামরাঙ্গা সাফ করে দিচ্ছে।

বাবা ইশারায় আমাদের বারণ করতেন। তখন মা নিজেই কোটা নিয়ে ছুটত। পাখিদের তাড়াত। বাবা হাসতেন।

মা রেগে গিয়ে বলত, হাসছ কেন?

—হাসছি এমনি।

—তুমি এমনি হাসার মানুষ! কেন হাসলে বল!

বাবা ঠাকুরঘরে হয়তো যাচ্ছেন। গৃহদেবতার পূজার সময় হয়ে গেছে। ঘরে ঢোকার আগে বলতেন, ওরা জানে বাড়ির মালিক তাদের পছন্দ করে। তুমি যখন দিবানিদ্রা যাবে ওরা তখন আসবে। আমি বলে দিয়েছি, সময় বুঝে আয়। যখন তখন এলে চলে! দেখছিস না বাড়ির মাঠান রাগ করে!

কবিবন্ধুটি বিস্ময়ে বললেন, ওরা আসত।

—ঠিক আসত। মা দিবানিদ্রা গেলেই ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসত। বাবা বলতেন, পাখি প্রজাপতি গরু বাছুর অর্থাৎ তিনি প্রাণীকুলের কথাই বলতে চাইতেন—না থাকলে মানায় না। জানেন, যদি টাকা থাকত, আর দু-চার কাঠা জমি রাখতে পারতাম—বাবার মতো আমার বাড়িতেও গাছপালা লাগিয়ে দিতাম। গাছপালা লাগানোর মধ্যেও বড় একটা আনন্দ আছে। বাড়িতে গাছপালা না থাকলে, পাখি প্রজাপতি উড়ে না এলে বাড়ির জন্য মায়াও বাড়ে না।

বন্ধুটি কী ভেবে ডাকলেন, বৌঠান আর এক রাউণ্ড চা। আমরা এখানে জমে গেছি। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন, তাহলে কি আমাদের দেশবাড়ির জন্য যে নস্টালজিয়া, তা এই গাছপালা, পাখি প্রজাপতির জন্য?

বললাম, তার বিস্ময় সে প্রকৃতির মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে। এঁদো গলিতে যে জন্মায়, বড় হয় তার কিছুই থাকে না। শহরের ঘরবাড়ির জন্য মানুষের এ-কারণে টান কম।

কবি বন্ধুটি বললেন, আমাদের কিন্তু আজ কথা ছিল পাখি ছাড়া অন্য কোনো কথা হবে না। পাখি দেখাবেন বলে এনেছেন। দেখছি জায়গাটা যা হয়ে গেছে, তাতে কাক শকুনের উপদ্রব বাড়তে পারে। আসল পাখি সব উধাও।

স্ত্রী চা রেখে গেল। একটা সিগারেট ধরালাম। ছুটির দিন, প্রসন্ন মেজাজ। বন্ধুটির কথায় রাগ করা গেল না। আসলে সেই কবে বলেছিলাম, যখন সবে বাড়িঘর বানাতে শুরু করি তখন। বন্ধুটি প্রায়ই বলতেন, জায়গাটা কেমন? গাছপালা মাঠ আছে? বিশাল আকাশ দেখতে পান? নির্জন নিরিবিলি? পাখি প্রজাপতি আসে?

আমি বলেছিলাম, আসে।

—তা হলে তো একদিন বেড়াতে যেতে হয়।

—আসুন না।

বললাম, আসব আসব করে দশটা বছর পার করে দিলেন। কলকাতার আশেপাশে কোনো ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকবে না। একটু ফাঁকা জায়গায় থাকব বলে, এখানে বাড়িটা করি। দেখছেন তো জায়গাটা কী হয়ে গেল! ঐ যে সামনের ঘরবাড়ি দেখছেন; সেখানে সব ধানের জমি ছিল। ঐ যে ও-পাশের রাস্তা দেখছেন, সেখানে গেলে এক বুড়ো লণ্ঠনওয়ালাকে দেখা যেত। সে দূর দূর গাঁয়ে যেত সকালে, ফিরত সন্ধ্যা হলে। লণ্ঠনবাতি নিজে বানাত। গাঁয়ে গাঁয়ে বিক্রি করত। আমার সঙ্গে লোকটির খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল। বলেছিল, হজুর, আপনি এমন পাণ্ডববর্জিত এলাকায় বাড়ি করলেন!

ওকে বলেছিলাম, একদম হুজুর হুজুর নয়। তুমি আমার সঙ্গী। এ জায়গা ছেড়ে তোমার কোথাও যেতে ইচ্ছে হয়?

—না মরে গেলেও যেতে পারব না।

—কেন না!

—সে বলতে পারব না। গাছপালা পাখি এই ফসলের মাঠ নিয়ে বেঁচে আছি বাবু। কোথাও ভালো লাগবে না। আমার সঙ্গে তার বিচিত্র সব গল্প হত। সে কোথায় লণ্ঠনবাতি বিক্রি করতে যায়, রাস্তায় যেতে যেতে কার দাওয়ায় বসে, কোথায় একটা ছোট্ট মশলাবাতির দোকান আছে, সেখানে বিড়ি পর্যন্ত পাওয়া যায়—এ-সব খবরই দিত। এই যে পাশের খাল দেখছেন, সারা বর্ষাকাল ধরে খড়ের নৌকা যেতে দেখেছি। এ-সব দেখাব বলেই আসতে বলেছিলাম।

বন্ধুটি বললেন, দুর্ভাগ্য। আপনার পাখি প্রজাপতি দেখা হল না। খড়ের নৌকাও দেখা হল না। সেই লণ্ঠনওয়ালার কাছে চলুন না। সন্ধ্যেটি বেশ কাটবে।

—সে তো আর এখানে নেই। জমিটুকু বেচে দিয়ে আরও ভেতরে চলে গেছে। সে নাকি অনেক দূরে। ভালোই আছে সেখানে। বাসে যাওয়া যায়। বাস থেকে নেমে মাইলখানেক হাঁটতে হয়। জমির খুব ভালো দাম পেয়ে গেল, আমায় এসে বলল, বুঝলেন, থাকা যাবে না। আপনি এসেই জায়গাটায় বারটা বাজালেন।

অবাক আমি! সে বলল, তাই। আপনার দেখাদেখি সব ভদ্দরলোকেরা আসতে শুরু করে দিলেন। জমির দর বেড়ে গেল। এতটাকা একসঙ্গে জীবনেও দেখি নি বাবু।

বন্ধুটি বললেন, আসলে আমরা তাকে উৎখাত করেছি।

—তাই বলতে পারেন।

—সে যাকগে।

আমি বললাম, না যাকগে নয়। শুধু তাকে উৎখাত করি নি, তার স্বপ্নের পৃথিবী থেকে বনবাসে পাঠিয়েছি।

বন্ধুটি হেসে বললেন, সে সেখানেও নিজের মতো স্বপ্নের পৃথিবী বানিয়ে নেবে। ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।

—সে হয়? সে রোজ গাঁয়ে গাঁয়ে গেছে, সে সারাজীবন তার নিজের মানুষের সঙ্গে বড় হয়েছে, গাছপালা মাঠ সবই তার অস্তিত্ব, সে টাকার বিনিময়ে সব হারিয়ে চলে গেছে। একজন লণ্ঠনওয়ালা এখন হয়তো কোথাও একটা চা-বিড়ির দোকান করেছে। কিন্তু বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া, গাঁয়ের কোনো সুন্দরী বৌয়ের ডাক, এই লণ্ঠনওয়ালা তোমার কুপির দাম কত গো, একটা দিয়ে যাও না! বৌটির সঙ্গে কুপির দর নিয়ে কষাকষি, একটু বসে জিরিয়ে নেওয়া, কিংবা সংসারের দুটো সুখ দুঃখের কথা, এসব সে আর পাবে কোথায়? তার বাড়িতে ছিল দুটো নারকেল গাছ, একটা আমগাছ, লেবু করমচা, সবই সে লাগিয়েছিল। এরা তার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে। সে তাদের ভুলবে কী করে! টাকার লোভে একজন লণ্ঠনওয়ালা সব বেচে দিয়ে চলে গেল।

ঠিক এসময় বন্ধুটি স্মরণ করিয়ে দিলেন, আমাদের কিন্তু আজ শুধু পাখির গল্প। লণ্ঠনওয়ালার জন্য দুঃখ করলে পাখিরা সব উড়ে যাবে।

আমি হাসলাম।

আসলে বাড়িটা করার সময় এই নির্জন মাঠে এতসব বিচিত্র পাখি দেখেছি যে, অফিসে গিয়ে সবার কাছে গল্প না করে পারি নি। কারণ গাঁয়ে জন্মালে মানুষের বোধহয় এই হয়। শহর মানুষের অনেক মমতা নষ্ট করে দেয়। প্রকৃতির উদার আকাশ, বিশাল ধানের মাঠ, দিগন্তে কোনো বড় লাইটপোস্টের ছবি, এবং নীল সমুদ্রের মতো রাশি রাশি মেঘ যখন আমার বাড়ির মাথার উপর দিয়ে ভেসে যেত তখন আমার শৈশব এসে জানালায় উঁকি মারত। আমি স্থির থাকতে পারতাম না অফিসে জায়গাটা নিয়ে খুব গল্প করতাম।

বন্ধুটি বলল, কোনো কোনো জাতের পাখি খুব হিংস্র হয় শুনেছি। এদের জন্য তো মায়া হবার কথা না।

বললাম, হিংস্র বলছেন কেন! বাঁচার তাগিদে সব। তবে একটা পাখির গল্প বলি শুনুন। আজকালকার ছেলে মেয়েরা মাইলখানেক রাস্তা হাঁটতে হলেই গেল। বাসস্ট্রাইক হলে, মাথায় হাত। চার-পাঁচ মাইল হেঁটে গেলেই বাড়ি, অথচ মুখ দেখলে মনে হবে কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে। বাড়ি ফেরা বুঝি হবে না।

আর আমরা রোজ চার মাইল রাস্তা হেঁটে স্কুল করেছি। গাঁয়ের পনের ষোলজন ছাত্র একসঙ্গে বের হতাম। ফিরতাম একসঙ্গে। সারাটা রাস্তা আমাদের কাছে কতরকমের কৌতূহল নিয়ে জেগে থাকত। গ্রীষ্মের প্রখর রোদে হাঁটছি—পথে কারো আমবাগান, লিচুবাগান, পেয়ারার গাছ, কুলের গাছ, কোথায় কী গাছ সব আমাদের জানা, কোথায় কোন গাছে কখন কী ফল হবে সব জানা। কেউ-ফল, গোলাপ জাম, ঢেউয়া কতরকমের গাছই ছিল আমাদের জীবনের সঙ্গী। চুরি করতাম, ছুটতাম, ক্ষেত থেকে ক্ষিরাই চুরি করে খেতাম। গ্রাম মাঠ বিল পার হয়ে এক আশ্চর্য তীর্থযাত্রা ছিল প্রতিদিন।

বন্ধুটি আজ যেন আমার নস্টালজিয়াকে আক্রমণ করতেই এসেছেন। তিনি বললেন, এতে পাখির গল্প কোথায়?

—দাঁড়ান বলছি। বলে উঠে বাথরুমের দিকে গেলাম। আসলে সাঁজ লেগে আসছে। রাতে বন্ধুটি খাবে। ঘরে কী আছে না আছে খবর রাখি না। একবার অন্তত জানা দরকার, রাতে কী হচ্ছে। স্ত্রীকে নীচে সিঁড়ির মুখে পেয়ে গেলাম। বললাম, গৌরাঙ্গবাবু কিন্তু আজ রাতটা এখানে কাটাবেন। রাতে খাবেন।

স্ত্রীর এক কথা, তোমাকে ভাবতে হবে না।

বাড়িতে বাজার, কেনাকাটা স্ত্রীই করেন। এমনকি রান্নাবান্নাও করা হয়ে আছে বোধহয়। শুধু গ্যাস জ্বেলে গরম করে নেওয়া। কাজেই ফের উঠে এসে বললাম, জামাকাপড় ছাড়ুন। পাখির গল্পটা না হয় রাতে খেতে বসে শুনবেন।

বন্ধুটির এক কথা, খাওয়ার সময় কোনো হিংস্র পাখির গল্প বললে, গল্পটা জমতে পারে, খাওয়াটা জমবে না।

আমি জানি গৌরাঙ্গবাবু ভোজনরসিক। খেতে ভালোবাসেন। কোনো এক কবি সম্মেলনে গিয়ে তিনি কুড়িটা ডিমই খেয়েছিলেন, সে সব গল্প কানে এসেছে। এক ফাঁকে স্ত্রীকে বললাম, ইনিই সেই কুড়িটা ডিম।

ইনিই সেই কুড়িটা ডিম শুনে স্ত্রী কেমন সামান্য ঘাবড়ে গেল। তারপর কী ভাবল কে জানে, বলল, কুড়িটার জায়গায় ত্রিশটা—এর বেশি তো লাগবে না। আমি আনিয়ে রাখছি।

—তুমি কী রাতে!

—সব আছে। তোমার তো মনে থাকে না। সেদিন সকালে বললে না, রোব্বারে আমার এক সহকর্মী আসতে পারেন। খেতে পারেন। খেতে খুব ভালোবাসেন।

—ভুলেই গেছি।

আমি উপরে উঠে এলাম। গৌরাঙ্গবাবু বালকনিতে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই বললেন, চলুন ছাদে যাওয়া যাক। আমরা ছাদে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। অনেক দূরের ঘর বাড়ি চোখে পড়ছে। কিন্তু গাছপালা কম। বলতে গেলে সামনের দিকটায় একসময় বনভূমি ছিল। এখন আর তার চিহ্ন নেই। বাড়ির পেছনটায় কয়েকটা গাছ লাগিয়েছি। গাছগুলো বড় হচ্ছে, সবই ফুলের, শেফালি, কামিনী এবং স্থলপদ্মের গাছ।

গৌরাঙ্গবাবু ঝুঁকে দেখলেন। বললেন, এগুলি বুঝি আপনার সান্ত্বনা?

বললাম, বলতে পারেন।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন, চলুন ঐ গাছগুলোর নিচে গিয়ে বসি।

নিচে নেমে এলাম। বেশ ঘন অন্ধকার। বললাম, আলো জ্বেলে দি। ঘাসের উপর চেয়ার পেতে দিয়ে গেল কাজের লোকটা। প্রায় অন্ধকারে বসে গৌরাঙ্গবাবু বললেন, এখানে মনে হয় আপনার হিংস্র পাখির গল্পটা জমবে।

বললাম, দেখুন পাখিটা অতিকায়।

—কী পাখি?

—কী পাখি প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলাম। তারপর কী ভেবে যে বললাম, সাপটা আরও অতিকায়।

—তার মানে। পাখি সাপ!

—আসলে আমাদের সমাজ জীবনে শুধু এই পাখি এবং সাপের খেলা চলছে।

—বুঝলাম না।

—আমি কাউকে দোষ দিই না। নিজেকে শুধরে নিলাম।

গৌরাঙ্গবাবু খুবই অধৈর্য হয়ে পড়ছেন—সোজাসুজি বলুন না।

—তখন চৈত্র মাস। স্কুল থেকে ফিরছি। জমি উরাট। গ্রাম থেকে নামলেই ফসলের মাঠ, পরে গোপের বাগ বলে একটা গাঁ। গাঁ ছাড়ালেই বিশাল বিলেন জায়গা। ওটা পার হয়ে গেলে খংশারদির পুল। পুল পার হয়ে গেলে পোদ্দারদের প্রাসাদের মতো বাড়ি বাগান, তারপর গঞ্জের মতো জায়গায় আমাদের স্কুল। এতটা রাস্তা আমাদের যেতে হাঁটতে হয়। যাবার পথে, ফেরার পথে কখনও মনে হয়নি স্কুলটা আমাদের খুব দূর।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন, পাখি গেল কোথায়?

বললাম, এবারেই আসবে। বললাম না, চৈত্র মাস। সারা মাঠে চাষ-আবাদ নেই, মাঠ খালি।

সব জমিতে ক্ষিরাইর চাষ। ক্ষিরাই, বাঙ্গি, তরমুজ ফলে আছে। জানেন তো, তরমুজের নিচে খড় দিতে হয়। উপরেও দিতে হয়। যাতে চোখ না লাগে সেজন্য খড় দিয়ে তরমুজ ঢেকেও রাখা হয়। কিন্তু আমাদের চোখকে ফাঁকি দেয় কে! একটা আস্ত বড় তরমুজ চুরি করে গাছতলায় বসে খেয়ে, তার ছালবাকল আবার সেখানেই রেখে আসার মধ্যে, আমাদের একটা মজা ছিল। মজা করতে গিয়েই তাড়াটা খেয়েছিলাম।

—কে তাড়া করল? জমির মালিক?

—ধুস! একটা শাদা খরিস।

—খরিস!

—সে না দেখলে তার বিশাল ফণা কত বড় হতে পারে বিশ্বাস করতে পারবেন না। হাত দুই দূরে ফণা তুলে আমার মুখের সামনে দুলছে। আমি চোখ খুলে আছি। সারা অঙ্গ অবশ। দূরে পালাচ্ছে সবাই। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। যেন বলছে, কী, আর চুরি করবে!

গৌরাঙ্গবাবু বললেন, যান মশাই, ও সময় এসব কথা মনে হয়! মস্তিষ্কের ঘিলু তো গলে যাবার কথা!

—জানি না, এটাই আমার মনে হয়েছিল, বাস্তু সাপটাপ নাকি এমন করে! শুধু বিড় বিড় করে বলছি, দোহাই আস্তিক মুনি। জানি একটু নড়লেই আমার মাথায় ছোবল বসাবে। নড়ছি না আর তখনই কী না....

—কী তখন?

—দেখলাম কোত্থেকে একটা বিশাল পাখি উড়ে এল! একটা বাজপাখি। এসেই গলার কাছে সাপ্টে ধরতেই আমি ছুটে পালাব ভাবলাম। কিন্তু এ কি! সাপটা বিশাল লেজ দিয়ে পাখিটার পা পাখা সব জড়িয়ে ধরেছে। খণ্ডযুদ্ধ। আমার সব বন্ধুদের ডাকছি। দেখছি কেউ নেই। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছি বাজপাখির হিংস্র চোখ জ্বলছে। সাপের হিংস্র চোখ জ্বলছে। পাখিটা কিছুতেই গলার কাছে লেজ আনতে দিচ্ছে না। গলা বাঁকিয়ে ফণার মাথায় ঠুকরে সাপের মগজ থেকে ঘিলু তুলে নিতেই বিশাল সেই দানব এলিয়ে পড়ল। এবারে পাখিটার শরীর থেকে সব প্যাঁচ খুলে গেল। পাখিটা সাপটাকে নিয়ে অনায়াসে উড়ে যাচ্ছে। এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি জীবনে দেখি নি। এমন ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য জীবনে অনুভব করি নি। বিশাল আকাশের নিচে অবলীলায় উড়ে যাচ্ছে।

গল্পটা শোনার পর গৌরাঙ্গবাবু বললেন, আদিমকাল থেকেই এটা চলছে। সবলেরা বেঁচে থাকে। দুর্বলেরা চলে যায়।

আমি শুধু বললাম, এ-জন্য লণ্ঠনওয়ালার খোঁজে আর আমি যাইনি। সে যখন বাড়ি জমি বিক্রি করে দেখা করতে এসেছিল, আমি তার সঙ্গে দেখাও করি নি। কারণ সব নষ্টের মূলে আমি। ওর উৎখাত হওয়ার মূলে

আমি। আমার স্ত্রীকে বলে গেছিল একসঙ্গে এত টাকা নাকি সে জীবনেও দেখে নি।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন, আপনি না এলেও তাকে উৎখাত হতে হত। পৃথিবীতে সবসময় একজন আর একজনকে তাড়া করছে।